ভাস্কর্য ও মূর্তি এক না ভিন্ন ইসলাম কী বলে?

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه. أما بعد:

কোনো ধরনের ভূমিকা ছাড়াই মূল প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছি-

বোঝার সুবিধার্থে গোটা আলোচনাকে মৌলিক দুটি শিরোনামে ভাগ করে নেওয়া যায় :

১. মূর্তি ও ভাস্কর্য বিষয়ে শরীয়তের ফায়সালা।

২. ভাস্কর্য সমর্থনকারীদের যুক্তি ও তার অসারতা।

এক. মূর্তি ও ভাস্কর্য বিষয়ে শরীয়তের ফায়সালা

প্রাণীর আকৃতি গড়া এবং এর মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার দুটোই শরীয়তে নিষিদ্ধ ও হারাম। এ প্রসঙ্গে যে হাদীসগুলো এসেছে তা অকাট্য ও মুতাওয়াতির। ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য ও ইজমা রয়েছে। এটা মুমিনদের ঐকমত্যপূর্ণ পথ। আর কুরআন মাজীদে মুমিনদের ঐকমত্যপূর্ণ পথ পরিহার করাকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বলা হয়েছে। (সূরা নিসা (৪) : ১৫)

প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণের অবৈধতা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান। এতে পূজার শর্ত নেই। এই অবৈধতার কারণ হল আল্লাহর সৃষ্টিগুণের সঙ্গে সাদৃশ্য গ্রহণ, যা বিভিন্ন হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

আমরা আল্লাহর বান্দা। আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যেই আমাদেরকে অবস্থান করতে হবে। আল্লাহ তাআলা প্রাণীর আকৃতি দানকে একমাত্র তাঁরই অধিকার সাব্যস্ত করেছেন। কেননা আকৃতির মধ্যে শুধু তিনিই প্রাণ দান করতে পারেন। যার পক্ষে প্রাণ দান সম্ভব নয়, তাকে আল্লাহ আকৃতি নির্মাণেরও অনুমতি দেন না। একে তিনি তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করার সমার্থক বলে মনে করেন।

---

* আমীনুত তা'লীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

তবে মানুষের স্বভাবে অঙ্কন ও নির্মাণের যে প্রেরণা রয়েছে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জড়বস্তু বা প্রাণহীন বস্তুর চিত্র-প্রতিকৃতি প্রস্তুতের অনুমতি দিয়েছেন।

প্রাণীর চিত্র ও ভাস্কর্য সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার কথা যেসব হাদীসে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষিত হয়েছে তার কয়েকটি এবার লক্ষ করুন-

১. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

> لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ.
>
> ফিরিশতারা ওই ঘরে প্রবেশ করেন না, যেখানে 'তামাছীল' (ভাস্কর্য) বা ছবি রয়েছে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১১২

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন-

> سَمِعْتُ مُحمدًا صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يقُولُ: مَنْ صَورَ صُورَةً فِي الدنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الروحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.
>
> আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কেউ দুনিয়াতে কোনো চিত্র-প্রতিকৃতি তৈরি করবে তাকে কিয়ামতের দিন বাধ্য করা হবে, যেন সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে, অথচ সে তা করতে সক্ষম হবে না। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১১০

৩. আয়েশা রা. বলেন-

> قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَما رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ هَتَكَهُ وَقَالَ: أَشَد الناسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ، قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.
>
> রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর থেকে ফিরলেন। আমি কক্ষের দ্বারে একটি পর্দা ঝুলিয়েছিলাম, যাতে 'তামাছীল' (ছবি) অঙ্কিত ছিল। তিনি তা খুলে ফেললেন এবং বললেন, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন আযাব দেওয়া হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। উম্মুল মুমিনীন বলেন, তখন আমরা তা কেটে ফেললাম এবং একটি বা দুইটি বালিশ বানালাম। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১০৭

৪. আলী রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন বললেন-

أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلا يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلا كَسَرَهُ، وَلا قَبْرًا إِلا سَوَّاهُ، وَلا صُورَةً إِلا لَطَخَهَا؟

তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে মদীনায় যাবে এবং যেখানেই কোনো মূর্তি পাবে তা ভেঙ্গে ফেলবে, যেখানেই কোনো সমাধি-সৌধ পাবে তা ভূমিস্মাৎ করে দেবে এবং যেখানেই কোনো চিত্র পাবে তা মুছে দিবে?

আলী রা. এই দায়িত্ব পালন করলেন। ফিরে আসার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمدٍ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم.

যে কেউ পুনরায় ওইসব বস্তু তৈরি করবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নাযিলকৃত দীনকে অস্বীকারকারী। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৫৭

৫. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার সময় তাঁর জনৈকা স্ত্রী একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। গির্জাটির নাম ছিল মারিয়া। উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা ইতিপূর্বে হাবাশায় গিয়েছিলেন। তাঁরা গির্জাটির কারুকাজ ও তাতে বিদ্যমান প্রতিকৃতিসমূহের কথা আলোচনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয্যা থেকে মাথা তুলে বললেন-

أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرجلُ الصالحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُم صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصورَةَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.

তাদের কোনো পুণ্যবান লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর ইবাদতখানা নির্মাণ করত এবং তাতে প্রতিকৃতি স্থাপন করত। এরা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫২৮

এই হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ পূর্বের শরীয়তেও হারাম ছিল। তা না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করতেন না।

বাইবেলে (বিকৃতির পরও) এখনও পর্যন্ত প্রাণীর চিত্র প্রতিকৃতি তৈরির অবৈধতা বিদ্যমান রয়েছে। বলা হয়েছে-

'Do not make for yourselves images of anything in heaven or on earth or in the water under the earth.' (HOLY BIBLE (Good news Bible) p. 80, The Bible society of India)

দুই. ভাস্কর্য সমর্থনকারীদের যুক্তি ও তার অসরতা

'উলামা' পরিচয়ে কিছু লোক দাবি করেছেন, ভাস্কর্য আর মূর্তি এক নয়। তারা এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য তুলে ধরে বলেছেন-

"ভাস্কর্য হচ্ছে একটা শিল্প, যা নগরের সৌন্দর্য বর্ধন করে। আর মূর্তি বানানো হয় ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে, উপাসনা করার জন্য।"

এটা হল ঐ 'ভদ্রলোক'দের বিকৃতিমাত্র।

পূজার মূর্তি আর ভাস্কর্যের মাঝে পার্থক্য করে যারা প্রাণীর প্রতিকৃতি বিষয়ে ইসলামের দেওয়া অকাট্য বিধানে ফাঁক বের করতে চান তাদের জানা থাকা উচিত-

ইসলামে প্রাণীর প্রতিকৃতির অবৈধতা একটি স্বতন্ত্র বিধান। পূজার উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক প্রাণীর মূর্তি তৈরি করাই অবৈধ। প্রাণীর প্রতিকৃতি হওয়াই অবৈধতার কারণ। এজন্য ভাস্কর্যের বিধানগত দিক বুঝতে মূর্তি ও ভাস্কর্যের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা অপরিহার্য নয়। বাইতুল্লাহ্ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পূজার মূর্তি সরিয়েছেন তেমনি স্তম্ভ ও দেয়ালে অঙ্কিত চিত্রগুলোও মুছে দিয়েছেন এবং তিনি মূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলার নির্দেশ এ বলে দেননি যে, এগুলোর পূজা করা হয়; বরং তিনি বলেছেন-

قَاتَلَ اللهُ قَوْمًا يُصَوِّرُونَ مَا لَا يَخْلُقُونَ.

আল্লাহ ওই গোষ্ঠীকে ধ্বংস করুন, যারা এমন প্রতিকৃতি নির্মাণ করে, যা তারা সৃষ্টি করে না। -শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৫৯০৩

আরো বলেছেন-

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ.

ফিরিশতাগণ ওই গৃহে প্রবেশ করেন না, যাতে রয়েছে ছবি। -শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৫৮৯৬

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর কক্ষে ঝোলানো পর্দা তিনি খুলে দেওয়ার সময় এই চিত্রগুলো পূজার সামগ্রী কি সামগ্রী না- এই প্রসঙ্গ আনেননি; বরং বলেছেন-

أَشَدّ الناسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ.

> কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাবে ওইসব লোক পতিত হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১০৭

আরো বলেছেন-

إِن أَصْحَابَ هَذِهِ الصوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

> এই প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে, তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা ‘সৃষ্টি’ করেছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার কর। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫১৮১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১০৭

মোটকথা, মূর্তি এজন্যই অবৈধ যে, তা প্রাণীর প্রতিকৃতি। ওই মূর্তির পূজা করা না হলেও এবং পূজিত কোনো কিছুর মূর্তি না হলেও তা অবৈধ।

তাছাড়া উলামায়ে কেরাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, পূজার মূর্তি দুই কারণে নিষিদ্ধ : ১. প্রাণীর প্রতিকৃতি। ২. পূজা। আর সাধারণ ভাস্কর্য প্রাণীর প্রতিকৃতি হওয়ার কারণে অবৈধ।

পূজা শুধু মূর্তিরই হয়নি, বিভিন্ন বস্তুরও হয়েছে। সেগুলোর ভাস্কর্য তৈরি করাও নিষিদ্ধ ও হারাম। এটা পূজার কারণে। যদিও তা প্রাণীর প্রতিকৃতি নয়।

তদ্রূপ ছবি বা মূর্তির পিছনে কখনো শুধু সৌন্দর্যই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এটা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ প্রাণীর প্রতিকৃতি। আবার কখনো স্মরণ ও সম্মানের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। এটা যেমন প্রাণীর প্রতিকৃতি হওয়ার কারণে হারাম তেমনি এ কারণেও যে, এভাবে কোনো প্রতিকৃতির সম্মান দেখানো এক ধরনের ইবাদত বলেই গণ্য।

ইসলামের আদর্শ ও চেতনার সঙ্গে মূর্তি ও ভাস্কর্যের বিরোধ কোথায়- এটা স্পষ্ট করতে গিয়ে আরবের প্রখ্যাত আলেম ড. ইউসুফ কারযাভী বলেছেন :

> “ইসলামে প্রাণীর প্রতিকৃতি নিষিদ্ধ হওয়ার অন্যতম তাৎপর্য হল, মুসলমানের চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসকে শিরকের কলুষ থেকে পবিত্র রাখা। তাওহীদের বিষয়ে ইসলাম অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এটা অত্যন্ত যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত। কেননা, অতীত জাতিসমূহে মূর্তির পথেই শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।”

উপরের লাইনগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, প্রাণীর প্রতিকৃতি হওয়াই ভাস্কর্যের নির্মাণ অবৈধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। পূজনীয় হওয়া শর্ত নয়। অতএব মূর্তি থেকে ভাস্কর্যকে আলাদা করার যে চেষ্টা ঐ সব ‘ভদ্রলোক’ করেছেন তা অর্থহীন।

কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা

ভাস্কর্য সমর্থনকারী ‘ভদ্রলোক’দের মধ্যে আরেকটি শ্রেণী আছে, যারা বলছেন, “মূর্তি বা ভাস্কর্য মানেই শিরকের উপকরণ নয়...। বুখারী শরীফের হাদীস : ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়্যাত (নিয়তের উপর কাজ নির্ভরশীল)। সুতরাং যেটি যে উদ্দেশ্যে বানানো হয় সেটিকে সেভাবে বিবেচনা করতে হবে...।”

এই ‘ভদ্রলোকেরা’ মূলত আগেরওয়ালাদের মতো মূর্তি ও ভাস্কর্যের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টির পথে না হেঁটে এসব নির্মাণের উদ্দেশ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার কথা বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, উদ্দেশ্য যাই হোক, প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ সর্বাবস্থায় হারাম। সে হিসেবে তাদের বিষয়ে আলাদা কিছু বলার ছিল না। তবে এরা তাদের বক্তব্য প্রমাণ করতে গিয়ে একটি আয়াত এবং একটি হাদীসের শরণ নিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আল্লাহর কালাম এবং তাঁর রাসূলের বাণীর মর্যাদা তারা রক্ষা করতে পারেননি।

তাদের প্রমাণ উপস্থাপনের তরীকাটা দেখুন এবং লা-হাওলা পাঠ করে তাদের বক্তব্য লক্ষ করুন-

> “বুখারি শরিফের শুরুতেই রয়েছে, বিখ্যাত হাদিস, ‘ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়্যাত (নিয়তের উপর কাজ নির্ভরশীল)।’ মূর্তি বা ভাস্কর্য মানেই শিরকের উপকরণ নয়। যেটি যে উদ্দেশ্যে বানানো হয়, সেটিকে সেভাবে বিবেচনা করতে হবে। হযরত মা আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) রাসুল (সা.) এর প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। তার কয়েকটি পুতুল ছিল বলে হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি তার বান্ধবীদের সঙ্গে এসব পুতুল নিয়ে খেলা করতেন। কই, মহানবী (সা.) তো তাকে শিরক বলে এসব পুতুল নিয়ে খেলতে বারণ করেননি। আবার এসব পুতুল শিরকের উপকরণ এমন কথাও কখনও বলেননি। রাসুল (সা.)-এর বাসগৃহে পুতুলের অবস্থান স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে, পুতুল বা ভাস্কর্য মাত্রই শিরকের উপকরণ

নয়। কট্টর ওয়াহাবিপন্থী হুযূররাও এটি জানেন, প্রাণীর ভাস্কর্য মানেই শিরক নয়। সৌদি আরবের জেদ্দার মূল কেন্দ্রে 'দি ফিস্ট' নামে একটি ভাস্কর্য আছে, এটি একটি মুষ্টিবদ্ধ হাতের ভাস্কর্য। আরও আছে ঘোড়ার ও মাছের ভাস্কর্য; একইভাবে মুসলিম অধ্যুষিত সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইরান, ইন্দোনেশিয়া ও মিশরে রয়েছে ঘোড়া ও অন্যান্য জীবের ভাস্কর্য। সুতরাং বলা যায়, ভাস্কর্য জীবের হোক বা জীব দেহের কোনও অংশের হোক, তা যদি শিরক বা পূজার উদ্দেশ্যে নির্মিত না হয়, তবে এতে দোষের কিছু নেই।"

তারা আরো বলেছেন-

"...পবিত্র কুরআনের সূরা সাবার ১৩ নম্বর আয়াতে ভাস্কর্য নির্মাণের উল্লেখ করে বলা হয়েছে– 'উহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্যসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করিতো। আমি বলিয়াছিলাম, হে দাউদ-পরিবার, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করিতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ'।"

পাঠক! মুতাওয়াতির ও অকাট্য হাদীসের আলোকে আপনি একটু আগেই জেনেছেন, প্রাণীর প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য বিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান। এখন আপনিই বলুন, এদের এই উদ্ভট কথাবার্তার কী হাশর!

শুধু নিয়ত ভালো হওয়াই যথেষ্ট?

এখানে আমরা তাদেরকে প্রথম যে কথাটি জিজ্ঞেস করতে চাই তা হল, নিয়ত বা উদ্দেশ্য দিয়ে কাজের পরিণাম বিচারের এই শরঈ নীতি কখন এবং কোথায় প্রযোজ্য হবে- এর কোনো সীমারেখা আছে কি নেই? কেউ মদ পান করতে থাকবে আর বলবে- 'আমি এটা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাচ্ছি, একে নেশাজাত দ্রব্য ভেবে নয়' তার এ কথা কি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য হবে? বা কেউ কারো সম্পদ চুরি করল- এ নিয়তে যে, 'সে তো যাকাত দেয় না; আমি এটা নিয়ে গরীব-মিসকীনকে দিয়ে দিব।' এই সৎ নিয়তের কারণে কি তার চুরি বৈধ হয়ে যাবে? যদি তা না হয় তাহলে প্রাণীর প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য নির্মাণকে শরীয়ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পর একথার কী অর্থ- 'যেটিকে যে উদ্দেশ্যে বানানো হয়, সেটিকে সেভাবে বিবেচনা করতে হবে'? শরীয়ত বলছে, সাধারণ ভাস্কর্য প্রাণীর প্রতিকৃতি হওয়ার কারণেই অবৈধ। এতে পূজার শর্ত নেই। আর

এরা বলছেন, 'ভাস্কর্য জীবের হোক বা জীব দেহের কোনও অংশের হোক, তা যদি শিরক বা পূজার উদ্দেশ্যে নির্মিত না হয়, তবে এতে দোষের কিছু নেই।'

কোনটি মানবেন- শরীয়ত নাকি এদের মতামত?

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর পুতুলখেলা এবং এদের ভাস্কর্যপ্রেম

রইল তাদের একথা যে, "হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে ঘোড়ার ছোট মূর্তি রাখা ছিল (সূত্র : বুখারি শরিফ-কিতাবুল আদাব)। কই, রসূল (সা.) তাকে তো নিষেধ করেননি।"

এই বিকৃতির উত্তর হল-

হাদীসটি আলোচ্য বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক। এটা এসেছে মেয়েদের খেলনা সম্পর্কে। এখান থেকে মূর্তি ও ভাস্কর্যের বৈধতা আহরণের প্রয়াস কি অপরিণত চিন্তার প্রমাণ বহন করে না?

চিন্তাশীল মানুষ আলোচ্য বিষয়ের বিধান উম্মুল মুমিনীন-এর ওই হাদীস থেকে আহরণ করবেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর থেকে ফিরলেন। আমি দরজায় একটি ঝালরবিশিষ্ট পর্দা ঝুলিয়েছিলাম, যাতে পাখাওয়ালা ঘোড়ার ছবি অঙ্কিত ছিল। তিনি তা খুলে ফেলার আদেশ দিলেন। আমি তা খুলে ফেললাম। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১০৭

আম্মাজান যখন ছোট ছিলেন তখন পাখাওয়ালা ঘোড়ার পুতুল ছিল তার খেলার সামগ্রী। এর উপর নবীজী আপত্তি করেননি, কিন্তু যখন তিনি বড় হলেন এবং ঘোড়ার ছবিযুক্ত পর্দা ব্যবহার করলেন তখন নবীজী অসন্তুষ্ট হলেন। এমনকি তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং তা খুলে ফেলার আদেশ দিয়েছেন এবং তাকে সতর্ক করেছেন। এ সম্পর্কিত কিছু হাদীস ইতিপূর্বেও আমরা দেখেছি।

সুলাইমান আলাইহিস সালামের ধর্মেও প্রাণীর চিত্র তৈরি করা নিষিদ্ধ ছিল

তারা বলেছেন, "ভাস্কর্য জীবের হোক বা জীবদেহের কোনো অংশের হোক তা যদি শিরক বা পূজার উদ্দেশ্যে নির্মিত না হয় তবে এতে দোষের কিছু নেই।" তারা সূরা সাবা (৩৪)-এর আয়াত ১৩ দিয়ে কুরআন থেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন এই ভাস্কর্য নির্মাণের বৈধতা। এ থেকে বৈধতা তো প্রমাণিত হয়ই না, উল্টো তা এদের জ্ঞানদৈন্য ও হঠকারিতাকেই প্রকটিত করে তোলে।

আয়াতের তরজমাটিও তারা ঠিকভাবে করতে পারেননি। শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানীকৃত তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের বাংলা সংস্করণে এর কী তরজমা করা হয়েছে দেখুন :

> "সুলায়মান যা চাইত, তারা তার জন্য তা বানিয়ে দিত- উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি, হাউজের মত বড় বড় পাত্র এবং ভূমিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ..."।

আয়াতে উল্লিখিত تماثيل 'তামাছীল' বা ছবি শব্দের কী উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট করে টীকায় লিখেছেন :

> 'প্রকাশ থাকে যে, এসব ছবি হত প্রাণহীন বস্তুর, যেমন গাছ-পালা, ইমারত ইত্যাদি। কেননা তাওরাত দ্বারা জানা যায়, হযরত সুলাইমান আ.-এর শরীয়তেও প্রাণীর ছবি আঁকা জায়েয ছিল না।'

দেখুন, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন (উর্দু, ইংরেজি বা বাংলা, যে কোনো সংস্করণ), সূরা সাবা (৩৪)-এর আয়াত ১৩-এর অধীন টীকা।

ভদ্রলোকদের উচিত ছিল, আয়াতের তরজমা করার আগে এবং একে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের আগে নির্ভরযোগ্য দু'একটি তাফসীর ও কুরআনুল কারীমের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ দেখে নেওয়া। তাতে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানতাবশত তারা কুরআনের আয়াতের যে অর্থ বিকৃতি করেছেন তা থেকে হয়ত বেঁচে যেতেন।

তাদের বিভ্রান্তির শুরু এ আয়াতে ব্যবহৃত আরবী تماثيل 'তামাছীল' শব্দ নিয়ে। এর অর্থ তারা ধরেছেন, ভাস্কর্য এবং কেবলই প্রাণীর এমন ভাস্কর্য, যার পূজা করা হয় না।

কুরআনের তাফসীর তো বটেই, স্বয়ং কুরআনও তাদের এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে না।

কয়েক কারণে :

এক. আয়াতে উল্লিখিত تماثيل 'তামাছীল' শব্দের অর্থ মুফাসসিরগণ লিখেছেন- الصور অর্থাৎ সাধারণ ছবি।

দেখুন : তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ইবনে কাসীর (মৃত্যু : ৭৭৪), ৩/৮৪১, দারুল ফিকর থেকে প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ।

আল্লামা ইবনে হাইয়ান আন্দালুসী (মৃত্যু : ৭৪৫ হি.) তার তাফসীর আলবাহরুল মুহীত-এ জোর দিয়ে লিখেছেন-

> التَّمَاثِيلُ: الصُّوَرُ، وَكَانَتْ لِغَيْرِ الْحَيَوَانِ.

> অর্থাৎ এসব 'তামাছীল' ছিল প্রাণহীন বস্তুর ছবি।

দেখুন, আলবাহরুল মুহীত ৭/৩৫৩, দারু ইহইয়াইত তুরাছ, প্রথম সংস্করণ।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী রাহ. (মৃত্যু : ৬০৬ হি.) তাঁর তাফসীরে কাবীরে লিখেছেন-

> وَالتَّمَاثِيلُ مَا يَكُونُ فِيهَا (الْمَحاريب) مِنَ النُّقُوشِ.

> অর্থাৎ এই 'তামাছীল' ছিল, প্রাসাদে অঙ্কিত বিভিন্ন নকশা ও কারুকার্য।

দেখুন, আততাফসীরুল কাবীর ২৫/১৯৮, দারু ইহইয়াইত তুরাছ, চতুর্থ সংস্করণ।

আরো দেখুন, জামিউল বায়ান আন তাবীলি আয়িল কুরআন, মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আততবারী (মৃত্যু ৩১০ হি.) ১৯/২৩১, দারু আলামিল কুতুব, প্রথম সংস্করণ এবং তাফসীরু ফী যিলালিল কুরআন, সায়্যেদ কুতুব শহীদ (মৃত্যু ১৩৮৬ হি.=১৯৬৬ ঈ.) ৫/২৮৯৯, দারুশ শুরূক।

দুই. পূর্ববর্তী ধর্মসমূহে যে প্রাণীর চিত্র তৈরি করা হারাম ছিল, একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকেও সুস্পষ্ট। এ নিবন্ধেই ইতিপূর্বে আপনারা পাঠ করেছেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

> أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرجُلُ الصالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُم صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصورَةَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.

> তাদের কোনো পুণ্যবান লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর ইবাদতখানা নির্মাণ করত এবং তাতে প্রতিকৃতি স্থাপন করত। এরা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫২৮

এই হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করা পূর্বের শরীয়তেও হারাম ছিল। তা না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে একাজের কারণে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করতেন না।

তিন. এমনকি বর্তমান বাইবেলেও পরিষ্কারভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে প্রাণীর কোনো ছবি, ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি নির্মাণ। পড়ুন-

> 'Do not make for yourselves images of anything in heaven or on earth or in the water under the earth.'

(HOLY BIBLE (Good news Bible) p. 80, The Bible society of India)

চার. তারা যে বলেছেন, تماثيل 'তামাছীল' অর্থ প্রাণীর ভাস্কর্য এবং একমাত্র ঐ ভাস্কর্য যার উপাসনা করা হয় না এ কথাটিও কুরআন-বিরোধী। কুরাআনে কারীমে সূরা আম্বিয়া (২১)-এর ৫২ নং আয়াতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বক্তব্য উদ্ধৃত করে ইরশাদ হয়েছে-

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَ قَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ.

(স্মরণ কর ঐ সময়কে, যখন সে তার পিতা ও আপন সম্প্রদায়কে বলল, এই ভাস্কর্যগুলো কী, তোমরা যার উপাসনা করছ!)

এ আয়াতেও تماثيل 'তামাছীল' (ভাস্কর্য) শব্দ রয়েছে। এখান থেকে জানা যাচ্ছে যে, হযরত ইবরাহীম আ.-এর সম্প্রদায় তামাছীল (ভাস্কর্য)-এর পূজা করছিল এবং তিনি তাদেরকে এজন্য ভৎর্সনা করেছিলেন। অতএব তারা যে বলতে চাচ্ছেন, 'তামাছীল' মানে প্রাণীর এমন ভাস্কর্য, যার পূজা করা হয় না- একথা টিকল না।

পাঁচ. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে রয়েছে-

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ.

ফিরিশতারা ওই ঘরে প্রবেশ করেন না, যেখানে 'তামাছীল' (ভাস্কর্য) বা ছবি রয়েছে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১১২

এখানেও تماثيل 'তামাছীল' শব্দ রয়েছে। এখানে তো নবীজী এ ভাগ করেননি যে, তা পূজার উপকরণ কি উপকরণ নয়!?

তাদের বিভ্রান্তির গোড়ার কথা

আসলে পূজার উপকরণ আর পূজার উপকরণ নয়- এই দুই ভাগে ভাস্কর্যকে ভাগ করতে গিয়েই তারা বিপত্তিতে পড়েছেন এবং বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তারা যদি এক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশিত ভাগটি মনে রাখতেন, তাহলে সহজেই সব সমস্যা উতরে যেতে পারতেন।

হাদীসের ভাষা থেকে পরিষ্কার যে, প্রাণীর ছবি মাত্রই তা নিষিদ্ধ। সেটা কাগজে, কাপড়ে, মাটিতে বা দেয়ালে অঙ্কিত হোক কিংবা কাঠ, পাথর বা ইট-বালু-সিমেন্ট বা এজাতীয় অন্য পদার্থ দিয়ে স্বতন্ত্র দেহ-কাঠামো গড়ে হোক। প্রাণীর ছবি ও প্রতিকৃতি হওয়ায় সর্বাবস্থায় তা হারাম। সেটা পূজার উপকরণ

হোক বা না হোক। পূজা-অর্চনা যোগ হলে তাতে নিষিদ্ধ হবার বাড়তি কারণ পাওয়া গেল। বিধায় তা চরমভাবে ঘৃণিত। আর পূজার সামগ্রী না হলে শুধু এক কারণে নিষিদ্ধ; সেটা হল প্রাণীর ছবি বা ভাস্কর্য হওয়া।

অন্যদিকে ছবি যদি প্রাণহীন জড়বস্তুর বা উদ্ভিদ ও প্রাকৃতিক অন্যান্য জিনিসের হয় তাহলে তার অঙ্কনে দোষের কিছু নেই। সে ছবি কাগজে, কাপড়ে, মাটিতে বা দেয়ালে আঁকা হোক কিংবা কাঠ, পাথর, লোহা বা এজাতীয় পদার্থ দিয়ে স্বতন্ত্র কাঠামো তৈরি করে হোক। তবে যদি এই প্রাণহীন চিত্র ও বস্তুও পূজার উপকরণ হিসেবে তৈরি করা হয় তাহলে সেটাও নিষিদ্ধ। সেটা ছবি বা প্রতিকৃতি হওয়ার কারণে নয়; বরং পূজার কারণে।

এই শরঈ মানদণ্ডে বিচার করলে কোনো সংশয় বা বিভ্রান্তি থাকে না। বন্ধুগণ গোটা বিষয়টা কেন এইভাবে ভেবে দেখছেন না সেটাই বিস্ময়।

দলীল হল শরীয়ত, কোনো দেশ নয়

তারা আরেকটি কথা বলেছেন- সৌদি আরব ও মিশরসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে ভাস্কর্যের উপস্থিতি প্রসঙ্গে। এর উত্তর এই যে, শরীয়তের বিষয়ে শরীয়তের দলীল দিয়ে কথা বলতে হবে। কোন্ দেশ কী করেছে সেটা ধর্তব্য নয়।

পাঠক! আমাদের এ যাবৎকার আলোচনায় মূর্তি, ভাস্কর্য ও প্রতিকৃতি বিষয়ে ইসলামের বিধানটি আশা করছি আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন নিয়ত ও উদ্দেশ্যে যারা এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে- তাদের যুক্তির আসারতাও প্রমাণিত হয়েছে। আসুন, আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকি। আল্লাহ্ই তাওফীকদাতা।

মাসিক আলকাউসার, রবিউল আখির ১৪৪২। ডিসেম্বর ২০২০

দুনিয়ার প্রতি মহব্বতের স্বরূপ

মুফতী ইবরাহীম হাসান*

মহান রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীকে তৈরি করেছেন খুবই ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে। ক্ষণস্থায়ী এই আবাসস্থলে অবস্থানের জন্যে সৃষ্টি করেছেন মানুষ, নানা প্রকার প্রাণী, উদ্ভিদ, বৃক্ষরাজি ও বস্তুসামগ্রী। এই সকল কিছুর মধ্যে মানুষকে দান করেছেন বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষ হলো রাব্বুল আলামীনের নিকট আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টিজগতের সেরা।

মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতে অগণন নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এসকল নিয়ামতের প্রতি মানুষের রয়েছে স্বভাবজাত ভালোবাসা। পার্থিব জগতের নিয়ামতের প্রতি মানুষের মনে এই ভালোবাসা আল্লাহ তা'আলাই তৈরি করে দিয়েছেন। কুরআনে কারীমে সূরা আলে ইমরানের ১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ.

অর্থ : নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ তা'আলার নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এখান থেকে পার্থিব জগতের অন্যান্য নিয়ামতের প্রতি মানুষের স্বভাবজাত ভালোবাসার বিষয়টিও ফুটে ওঠে।

তবে পার্থিব জগত সম্পর্কে ভিন্ন রকম বর্ণনাও আছে। সুনানে তিরমিযীর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

* সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
প্রধান মুফতী, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
খতীব, বাইতুল মুয়াজ্জম জামে মসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি এ পৃথিবীর মূল্য আল্লাহর কাছে একটি মাছির ডানার সমপরিমাণও হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেখান থেকে একজন কাফেরকে এক চুমুক পানিও পান করাতেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, পুরো পৃথিবীই যেখানে আল্লাহর কাছে মাছির পাখার চেয়েও মূল্যহীন সেখানে এর নিয়ামতসমূহের প্রতি মানুষের মনে কেনো এই ভালোবাসা তৈরি করে দেওয়া হলো? পার্থিব জগতের মূল্যহীন বিষয়াবলীকে কেনো মানুষের সামনে লোভনীয় করে তোলা হলো? কুরআন-হাদীসের বক্তব্য ও উলামায়ে কেরামের মতামত থেকে এর তিনটি উদ্দেশ্য বের হয়ে আসে।

এক. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দিয়ে অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও এই পৃথিবীকে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছেন। পৃথিবীকে সাজিয়ে তুলতে হলে বৃক্ষরোপণ, ফল-ফসল উৎপাদন, গৃহ বিনির্মাণ ইত্যাদির প্রয়োজন রয়েছে। সেজন্যেই তিনি এখানকার বস্তুসামগ্রীর প্রতি মানুষকে আগ্রহী করে তুলেছেন। যেনো মানুষ আগ্রহী হয়ে এসবের প্রতি মনোযোগী হয়। মানুষের মনে এসবের প্রতি স্বভাবজাত আগ্রহ না থাকলে তারা এসব সৃজনশীল কাজ করতো না। ফলে তখন আর ফুল-ফল, বৃক্ষরাজি এবং বিভিন্ন প্রকার স্থাপত্যশৈলিতে এই পৃথিবী সুশোভিত হয়ে উঠতো না।

দুই. আল্লাহ তা'আলা সব ধরনের স্থায়ী নিয়ামত তৈরি করেছেন জান্নাতে। তবে সেসব নিয়ামতের আংশিক নমুনা পৃথিবীতেও তৈরি করেছেন এবং সেগুলোর প্রতি মানুষের ভালোবাসা তৈরি করেছেন। উদ্দেশ্য, দুনিয়ার এসব নিয়ামত দেখে যেনো মানুষ আখেরাতের নিয়ামত সম্পর্কে খুব সামান্য হলেও ধারণা লাভ করতে পারে এবং আখেরাতের নিয়ামত লাভে আগ্রহী হয়।

উদাহরণস্বরূপ, দুনিয়াতে একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ামত হলো গাছ। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য গাছ একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। কুরআনে কারীমেও আল্লাহ তা'আলা আখেরাতের নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন বৃক্ষরাজির কথা। পৃথিবীর গাছ দেখে ও এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মানুষ যখন আখেরাতের গাছের কথা শুনবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা আখেরাতের গাছের প্রতিও আগ্রহী হবে এবং সেটাকে অর্জন করতে প্রয়াসী হবে।

গাছের পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের নিয়ামত হিসেবে বর্ণনা করেছেন সুশোভিত উদ্যানের কথা, ঝর্ণা-নহরের কথা ও ডাগর চোখের হুরের কথা।

পৃথিবীতে যদি মানুষ এসকল জিনিস প্রত্যক্ষ না করতো অথবা প্রত্যক্ষ করলেও এসবের প্রতি মহব্বত না থাকতো, তাহলে আখেরাতে একই ধরনের নিয়ামতের কথা শুনে তার মনে কোনো ভাবান্তর হতো না এবং এগুলোর প্রতি আগ্রহও বোধ হতো না। অথচ আখেরাতের নিয়ামতের প্রতি আগ্রহ বোধ হওয়া এবং সেজন্যে পৃথিবীতে সৎকর্ম করা মানুষের জন্য জরুরী। আল্লাহ তা'আলা বান্দার এ প্রয়োজনকে পূর্ণ করার জন্যেই পার্থিব জগতের নিয়ামতের প্রতি কিছুটা ভালোবাসা তৈরি করে দিয়েছেন।

তিন. পার্থিব জগতের নিয়ামতের প্রতি আমাদের মনে মহব্বত তৈরির বড় একটা উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে আমাদের পরীক্ষা নেওয়া। আল্লাহ তা'আলা দেখতে চান যে, আমরা দুনিয়াবী নিয়ামত পেয়ে এর মধ্যেই আকণ্ঠ ডুবে যাই, নাকি এসব নিয়ামতরাজি ভোগ করার মাঝেও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ রাখি। এই পরীক্ষাটা নেওয়ার জন্যেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে দুনিয়ার ভোগসামগ্রীকে লোভনীয় করে তুলেছেন।

মহব্বতের সীমা

উপর্যুক্ত তিনটি উদ্দেশ্য থেকে বোঝা গেলো, মৌলিকভাবে এই পৃথিবী এবং এর সকল ভোগসামগ্রী আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন। শুধু কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এর নিয়ামতসমূহকে আমাদের কাছে লোভনীয় করে তোলা হয়েছে। যদি আমরা প্রথম উদ্দেশ্যটির দিকে তাকাই, তাহলে দেখবো– যেহেতু পৃথিবীকে সাজিয়ে তোলার জন্যেই আমাদের মনে এই মহব্বত তৈরি করা হয়েছে, আর পৃথিবীটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং এই মহব্বতটাও হতে হবে ক্ষণস্থায়ী। এমন যেনো না হয়, এই ক্ষণস্থায়ী মহব্বতের কারণে আমরা চিরস্থায়ী আখেরাতের নিয়ামত থেকেই বঞ্চিত হয়ে গেলাম।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সবসময় সাহাবায়ে কেরামকে এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যখনই দুনিয়াবী কোনো আলোচনা সামনে এসেছে, তখনই এর বিপরীতে আখেরাতের নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। হযরত ফাতিমা রাযি. একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলেন ঘরের কাজের জন্যে একজন খাদেম চাইতে। নবীজী আলী রাযি. -এর ঘরে গিয়ে তাঁকে বললেন,

> ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا أربعا وثلاثين، وتسبحا ثلاثا وثلاثين، وتحمدا ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم
>
> অর্থ : তোমরা যা কামনা করেছ, তারচে' উত্তম বিষয় আমি কি তোমাদের শিখিয়ে দিব না? যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে তখন চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ,

> তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করলে তোমার জন্যে সেটা খাদেম থেকেও উত্তম হবে। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৭০৫)

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. একবার একটি চারা রোপন করছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন,

> কী রোপন করছো আবূ হুরাইরা? তিনি বললেন, আমার জন্য একটি গাছের চারা রোপন করছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,
>
> ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة
>
> অর্থ : আমি কি তোমাকে এরচে' উত্তম গাছের চারার সংবাদ দিব না? আবূ হুরাইরা বললেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজী বললেন, 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার (পাঠ করলে) প্রত্যেকটি তোমার জন্য জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হাদীস ৩৮০৭)

দুনিয়ার মহব্বতের সীমা-পরিসীমার ব্যাপারে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি। আমরা জানি, নৌকা চলাচলের জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয় একটি বিষয়। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো, পানি নৌকার বাইরে থাকতে হবে। ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না। দুনিয়ার মহব্বতটাও এমনি। পৃথিবীতে চলতে গেলে এর মহব্বত লাগবে। কিন্তু সেটা আমাদের দিলে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রবেশ করলে সেটা হবে নদীর পানি নৌকার ভেতরে চলে আসার মতো। যার অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে ধ্বংস।

শেষকথা

সংক্ষিপ্ত এ আলোচনা থেকে বোঝা গেলো– পার্থিব জগতের নিয়ামত ও বস্তুসামগ্রীর প্রতি আমাদের মহব্বত আল্লাহপ্রদত্ত স্বভাবজাত একটি বিষয়। এই মহব্বত আমাদের মধ্যে থাকতেই পারে। এগুলোকে প্রয়োজন মাফিক ব্যবহারও করতে হতে পারে। তবে শর্ত হলো, এই মহব্বত এবং ব্যবহার হতে হবে নির্দিষ্ট একটি সীমার ভেতরে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্তের সাথে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে– এই মহব্বতকে অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। আখেরাতের মহব্বতের উপর এটাকে কিছুতেই প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। এসব নিয়ামত ভোগ করতে হবে শুধুই প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম হিসেবে। এসব শর্ত মানতে পারলেই দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দিকের মহব্বতের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব।

পরিপূর্ণ দীনের চার উৎস

আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী*

গত ১১ নভেম্বর ২০১৯, সোমবার মুহাম্মাদপুরস্থ বসিলা গার্ডেন সিটি মসজিদ সংলগ্ন মাঠে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার উদ্যোগে বার্ষিক ওয়াজ ও দু'আর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে দীনে ইসলামের পরিপূর্ণতা ও এর গ্রহণযোগ্য চারটি উৎস সম্পর্কে বয়ান পেশ করেন মুনাযিরে যামান, আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী দা.বা.। বয়ানটির গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় আগ্রহী পাঠকের জন্যে তা এখানে পত্রস্থ করা হয়েছে। রেকর্ড থেকে বয়ানটির শ্রুতিলিখন তৈরি করেছেন মা'হাদের ইফতা বিভাগের ছাত্র মৌলবী সুহাইল আহমাদ ও মৌলবী আবূ তালহা মাসউদ। -সম্পাদক

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, হযরত উলামায়ে কেরাম, সম্মানিত সুধী, সমাজের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সর্বস্তরের ভায়েরা ও পর্দানশীন মা বোনেরা!

আমি পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতের সামান্য অংশ আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি। এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

এর অর্থ হলো, আজকে আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। এই আয়াতের মধ্যে তিনটি কথা ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ।

প্রথমটি হলো, আল্লাহ আজকে বলতে কোন দিনকে বুঝালেন?

দ্বিতীয়টি হলো, দীন বলতে কী বুঝালেন?

তৃতীয়টি হলো, পরিপূর্ণ বলতে কী বুঝালেন?

কুরআনের কোনো কথা যদি ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ হয় আর সেই কথাকে ব্যাখ্যা করে বলা হয় তাহলে তাকে তাফসীর বলে। কুরআনের ব্যাখ্যা যার যেভাবে মনে চায় সেভাবে করলে হয় না। মনমতো ব্যাখ্যা করাকে 'মনগড়া ব্যাখ্যা' বলে।

এজন্য কুরানের সহীহ ব্যাখ্যা কোথায় পাওয়া যায় সেটা খুঁজতে হবে।

---

* মুহতামিম, মাদরাসা-ই নূরে মাদীনা, হবিগঞ্জ, সিলেট

সঠিক ব্যাখ্যার উৎস

কুরআনের সহীহ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ছয়টি উৎস থেকে।

১. তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন।

২. তাফসীরুল কুরআন বিল আহাদীসিন নাবাবিয়্যাহ।

৩. তাফসীরুল কুরআন বি আহাদীসিস সাহাবাহ।

৪. তাফসীরুল কুরআন বি আকওয়ালিত তাবিঈন।

৫. তাফসীরুল কুরআন বি ইজতিহাদিল মুজতাহিদীন।

৬. তাফসীরুল কুরআন বিল কাওয়াইদিল আরাবিয়্যাহ।

কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যার **প্রথম** উৎস স্বয়ং কুরআন।

দ্বিতীয় উৎস রাসূলের হাদীস।

তৃতীয় উৎস সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা/বক্তব্য।

চতুর্থ উৎস তাবেঈগণের বিবরণ।

পঞ্চম উৎস মাযহাবের ইমামগণের বিশ্লেষণ।

ষষ্ঠ উৎস আরবী ব্যাকরণ।

এই ছয়টি উৎস ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা করলে সেটা হবে মনগড়া ব্যাখ্যা।

সুতরাং আজকের আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতে হলেও আমাদেরকে এ ছয়টি উৎস থেকেই সাহায্য নিতে হবে। তাহলেই সে ব্যাখ্যা সঠিক হবে।

আয়াতের প্রথমাংশের ব্যাখ্যা

আয়াতটি আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছিলেন বিদায় হজকে কেন্দ্র করে। দশম হিজরী সনের যিলহজ মাসের ৯ তারিখ শুক্রবার। আরাফার ময়দানে যখন লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন তখন সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে মহা মূল্যবান ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণকে বিদায়ী ভাষণ বলে। সেই ভাষণকে কেন্দ্র করেই আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেছিলেন। অতএব বোঝা গেলো আজকে বলতে আরাফার দিনকে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা

দীন আরবী, ফার্সী, উর্দূ ও বাংলা– চার ভাষায় ব্যবহার হয়। কুরআনের ভাষায় দীনকে আল্লাহ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। এজন্য দীন শব্দের অর্থ অনেকের কাছে অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতা দূরীকরণে আমি কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

আল্লাহ কুরআনে সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহার তৃতীয় আয়াতে দীন শব্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

অর্থ : কর্মফল দিবসের মালিক।

এই আয়াতে আল্লাহ দীনকে কর্মফল অর্থে ব্যবহার করেছেন। কর্মফল দিবস মানে কিয়ামত দিবস।

সূরা বাকারার ২৫৬নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ

অর্থ : ধর্মের বেলায় বল প্রয়োগ চলবে না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সমস্ত ধর্মাবলম্বীরা আপন আপন ধর্মে স্বাধীন। তাহলে কি আল্লাহর কাছে সমস্ত ধর্ম গ্রহণযোগ্য? গ্রহণযোগ্য না হলে আল্লাহ স্বাধীনতা দিলেন কেন? আর পালন করার যখন স্বাধীনতা দিলেন তখন গ্রহণযোগ্য হবে না কেনো?

এই প্রশ্নের জবাব না জানার কারণে বর্তমান যামানার বড় বড় শিক্ষিত পণ্ডিতও বিভ্রান্তির শিকার। বর্তমান যামানার অনেক পণ্ডিত বলেন, আমাদেরকে যেমন ইসলাম পালনে আদেশ দিয়েছেন, ঠিক তেমনি অন্যদেরকেও অন্য ধর্ম পালনের আদেশ দিয়েছেন। কাজেই ইসলাম ধর্ম যেমন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য তদ্রূপ অন্যান্য ধর্মও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। এ ধরনের ভুলের শিকার যারা হয়েছেন তারা কান পেতে আল্লাহর আরেকটি আয়াত শুনুন,

وَمَن يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থ : ইসলাম ছাড়া ভিন্ন ধর্ম যারা পালন করবেন কখনো তাদের ধর্ম গ্রহণ করা হবে না। (সূরা আলে ইমরান; আয়াত ৮৫)

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্টভাবে বলেছেন, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। এখনতো প্রশ্নটা আরোও কঠিন হয়ে গেল। এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, আপন আপন ধর্মে স্বাধীন। আরেক আয়াতে বলেন, ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রশ্নের জবাবটা আসলেই কঠিন। সহজে বুঝার জন্য আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা যখন পরীক্ষার হলে যায় তখন কি সব ছাত্র সঠিক উত্তর লিখতে পারে? নিশ্চয় নয়। বরং কিছু ছাত্র ভুল উত্তরও লেখে। যারা ভুল লেখে তাদেরকে কি বাধা দেওয়া হয়? নাকি পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়? এখানেও তো প্রশ্ন আসতে পারে– ভুল লেখা যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে লেখার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিলো কেন? আর স্বাধীনতা দিলে সে উত্তর গ্রহণযোগ্য হবে না কেন? উভয় প্রশ্নের জবাব একই। উত্তরটি হচ্ছে– নিয়ম রক্ষার জন্য এমনটি করা হয়।

ঠিক তেমনি অন্যান্য ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছেন নিয়ম রক্ষার জন্যে। পরীক্ষার হলে কোনো ছাত্র যদি ইচ্ছামতো ভুল লেখে তাহলে যেমন সে ঘোড়ার ডিম ছাড়া আর কিছুই পাবে না; ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়াতে কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পালন করে তাহলে পরকালে সে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এই কথাটি পণ্ডিতদের ভালোভাবে স্মরণ রাখা দরকার।

দীন শব্দের আরো কিছু ব্যবহার

প্রাসঙ্গিক প্রশ্নোত্তরের পর আমরা আবার আগের আলোচনায় ফিরে আসি। সূরা শূরার ১৩নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اَقِيْمُوا الدِّيْنَ

এখানে দীনকে ইসলামের বিশুদ্ধ আকিদা বিশ্বাস বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকে ইসলামের নামে ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস উপস্থাপন করে। সেই ভ্রান্ত আকিদা যদি ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে যায় তাহলে সে আর মুসলমান থাকে না; কাফের হয়ে যায়। আর যদি ইসলামের গণ্ডি ছাড়িয়ে না যায় তাহলে সে মুসলমান থাকে; কিন্তু পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

যেমন মুসলমান নামধারী একটা দলের নাম শিয়া। তাদের বারোটি উপদল আছে। তার একটার নাম শিয়া হুলুলিয়া। তারা বিশ্বাস করে– আলী খোদ আল্লাহ, আল্লাহই আলী (নাঊযুবিল্লাহ)। ওরা কিছুতেই ইসলামের গণ্ডিতে নেই? বরং ইসলামের গণ্ডি পার হয়ে গেছে– এরা নিঃসন্দেহে কাফের।

তাদের আরেকটা দলের নাম শিয়া যায়দিয়্যা। তারা বিশ্বাস করে– আল্লাহ আলী নন, আলী আল্লাহ নন। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন আলী। তাকে প্রথম খলীফা নিযুক্ত না করে তার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। এ বিশ্বাসের কারণে এরা ইসলামের গণ্ডির বাইরে যায়নি। তবে এরা খাঁটি মুসলমান নয়; ভেজাল মুসলমান।

সারকথা, কুরআন-হাদীসে বিভিন্ন সময় দীনের বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব নয়। একমাত্র আলেমরাই এ শব্দের সহীহ ব্যাখ্যা বুঝবেন এবং অন্যদেরকে বোঝাবেন।

এখন প্রশ্ন হলো, আজকের আলোচ্য আয়াতে দীনের কোন অর্থ ধর্তব্য হবে? এই আয়াতের মধ্যে দীনের অর্থ বিধি বিধান, হুকুম-আহকাম। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, আজকে আমি ইসলামের বিধি বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।

যদি এখানে আপনি দীনের অর্থ ধর্ম করেন তাহলে কি ভয়াবহ অর্থ হয়!

এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো বিদায় হজের সময়। এর তিন মাস পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। নবীজী দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার মাত্র নয় দিন আগে আরেকটি আয়াত নাযিল হয়েছে,

> وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.
>
> অর্থ : ঐ দিনকে ভয় করো যেদিন সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সেদিন প্রতিটি মানুষকে আপন আপন কর্মফল ভোগ করতে হবে। মানুষকে কর্মফল দেওয়ার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। (সূরা বাকারা; আয়াত ২৮১)

এই আয়াতটা ধর্মের ভিতরে না বাইরে? ভিতরে। কুরআনে কি ধর্ম বহির্ভূত কোন আয়াত আছে? নেই। সুতরাং (اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا) এই আয়াতে দীনের অর্থ করতে হবে বিধি-বিধান। বিদায় হজের দিন আল্লাহ তা‘আলা ইসলামের বিধি-বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এরপরে নাযিল হওয়া আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা কোনো বিধান বর্ণনা করেননি। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম দীন শব্দের অর্থ একেক জায়গায় একেক রকম হয়।

আয়াতের তৃতীয়াংশের ব্যাখ্যা

আয়াতের মধ্যে দীনকে পরিপূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। দীনকে পরিপূর্ণ করার পদ্ধতি বুঝার জন্য কয়েকটি উদাহরণ বুঝতে হবে।

আজকাল অনেকেই বলে যে, আমরা কুরআন ও হাদীসে যা আছে তা মানি। এর বাইরে কিছু মানি না। শুনতে কিন্তু কথাটা খুব চমকপ্রদ। সাধারণ মুসলমান কথাটা শুনে বড় মজা পায়। মনে করে, ঠিকই তো।

এ ধরনের কথা যারা বলেন ও বিশ্বাস করেন তাদেরকে আমি বলবো, সারা দুনিয়ায় মাইকে আযান ও ইকামত দেওয়া হয়। মাইকে নামায পড়া হয়। ধর্মের কথা আলোচনা করা হয়। আপনারা এটা কোথায় পেলেন? মাইকে আযান দেওয়া, ইকামত দেওয়া, নামায পড়া কুরআন হাদীসের কোথায় আছে?

যদি জায়েয বলেন তাহলে আপনাকে বলতে হবে– পেয়েছেন কোথায়? নাজায়েয বললেও পার পাবেন না। বলতে হবে– পেয়েছেন কোথায়? এ সকল লোকদের কথা সত্য, কিন্তু মতলব খারাপ।

আজকের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা বড় চমকপ্রদ কথা বলে থাকে, তবে তাদের মতলব খারাপ। এ সমস্ত লোকের খপ্পরে যেন আপনারা না পড়েন এজন্য আমি উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে এ বিষয়টির আলোচনা শুরু করেছি।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা দীনকে পরিপূর্ণ করার কথা বলেছেন; তবে পদ্ধতি বলেননি। পদ্ধতি বলেছেন অন্য আয়াতে। সূরা নিসা’র ৫৯নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

> يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ.

এই আয়াতের তরজমা হলো,

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের সমাধান দাতাদের আনুগত্য করো। আর যদি কোন ব্যাপারে মতানৈক্য হয় তাহলে সে ব্যাপারটিকে আল্লাহ ও রাসূলের কাছে সমর্পণ করো।

কিছু কি বুঝতে পারলেন? আল্লাহর আনুগত্য, রাসূলের আনুগত্য। কারা সমাধানদাতা? তাদের সমাধানই বা কী? কীসের আবার মতানৈক্য? আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তনের পদ্ধতি কী? এগুলো বুঝতে হলে ব্যাখ্যাসহ গভীরভাবে বুঝতে হবে।

আগেই বলেছিলাম, কুরআনের ব্যাখ্যা করার ছয়টি উৎস রয়েছে। যারা এই ছয় উৎস থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা করে গেছেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ.। তিনি তিনটি বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন।

১. জগতশ্রেষ্ঠ ওলী।

২. জগতশ্রেষ্ঠ দার্শনিক

৩. জগতশ্রেষ্ঠ মুফাসসিরে কুরআন।

তাঁর লিখিত তাফসীরের নাম তাফসীরে কাবীর। তাফসীরে কাবীরে আমি সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যা পেয়েছি। তার সারমর্মটা আপনাদেরকে শুনাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا اَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো। (সূরা নিসা; আয়াত ৫৯)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করেছেন,

اِنِ الۡحُكۡمُ اِلَّا لِلّٰهِ

অর্থ : হুকুম মানতে হবে একমাত্র আল্লাহর। (সূরা ইউসুফ; আয়াত ৪০)

এই দুই আয়াতে আল্লাহর হুকুম মানা ও তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এতটুকু পর্যন্ত দুই আয়াত বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু প্রথম আয়াতের পরবর্তী অংশ হলো,

وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ

অর্থ : এবং রাসূলেরও হুকুম মানো। (সূরা নিসা; আয়াত ৫৯)

এখানে বোঝার ব্যাপার রয়েছে। একবার বলা হলো– আল্লাহর হুকুম মানো, তাঁর হুকুম ছাড়া অন্য কারো হুকুম মানা যাবে না। তাহলে এ আয়াতে কেনো বলা হলো– রাসূলের হুকুম মানো? রাসূলের হুকুম মানলে তো আর একমাত্র আল্লাহর হুকুম মানা হলো না? এ প্রশ্নের জবাবও আল্লাহ তা'আলা খুব পরিষ্কারভাবে অন্যত্র বলে দিয়েছেন,

مَنۡ يُّطِعِ الرَّسُوۡلَ فَقَدۡ اَطَاعَ اللّٰهَ

অর্থ : যে রাসূলের হুকুম মানলো সে আল্লাহর হুকুমই মানলো। (সূরা নিসা; আয়াত ৮০)

কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কোন হুকুমই দেন না। হুকুমেরই ব্যাখ্যা করেন মাত্র। সেজন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম মানা যে কথা আল্লাহর হুকুম মানাও সে কথা।

আয়াতের পরের অংশের প্রশ্ন আরো জটিল। কিন্তু আয়াতের এ অংশের প্রশ্নোত্তরটি বুঝলে সে অংশের উত্তর খুব সহজেই বুঝে আসবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اُولِي الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ

অর্থ : তোমাদের সমাধান দাতাগণের হুকুম মানো। (সূরা নিসা; আয়াত ৫৯)

আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আমাদের জন্য সমাধানদাতা কারা? মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, সন্তানের জন্য মা-বাবা সমাধানদাতা, ছাত্রের জন্য উস্তাদ সমাধানদাতা, ছোটর জন্য বড় সমাধানদাতা, যে কোনো অধীনস্থের জন্য উপরস্থ ব্যক্তি সমাধানদাতা। দেশের জনগণের জন্য সরকার সমাধানদাতা।

সরকারের একটা সমাধানের কথা আপনাদেরকে বলি। পৃথিবীর যতগুলো দেশে আমার ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছে সব দেশের সরকারের একটা সমাধান দেখতে পেয়েছি। সেটা হলো ট্রাফিক সিগন্যাল। সিগন্যালে যদি লাল বাতি জ্বলে উঠে তাহলে গাড়ি চলা নিষিদ্ধ। আর যদি সবুজ বাতি জ্বলে ওঠে তাহলে গাড়ি চলা অনুমোদিত। এটা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া সমাধান? না সরকারের দেওয়া সমাধান?

সুতরাং বুঝা গেলো আল্লাহ ও রাসূল ছাড়াও আরো সমাধানদাতা আছে। তবে এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধার্য করে দিয়েছেন। সেটা হলো, যার সমাধান মেনে নিলে আল্লাহর সমাধানের বিরুদ্ধাচরণ হয় তার সমাধান কোনো মুসলমান মেনে নিতে পারে না। কাজেই মা-বাবা যদি তার সন্তানকে আল্লাহর বিরুদ্ধে সমাধান দেয়, এমনিভাবে কোনো ছাত্রকে তার উস্তাদ, কোনো মুরীদকে তার পীর, কোনো সদস্যকে তার দলনেতা, কোনো জনগণকে তার দেশের সরকার আল্লাহর বিরুদ্ধে সমাধান দেয় তাহলে তার এই সমাধান মেনে নেওয়া মুসলমানদের জন্য হারাম, হারাম, হারাম।

আল্লাহ এবং রাসূলের বেলায় সমাধান মেনে নিতে কোন শর্ত নেই। আর যত সমাধানদাতা আছে তাদের সমাধান মেনে নেওয়ার জন্য আল্লাহ হুকুম করছেন। তবে শর্ত হলো, সে সমাধান আল্লাহর সমাধানের বিরুদ্ধে যেতে পারবে না।

শরীয়তেও আল্লাহ এবং রাসূল সারল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া সমাধানদাতা আছেন। যেমন যারা আলেম নন তাদের জন্য আলেমগণ

সমাধানদাতা। আপনি উযূ কিভাবে করবেন, সমাধান দিবেন আলেমগণ। আপনি আপনার ইচ্ছামতো উযূ করলে উযূ হবে না। আপনি নামায কিভাবে পড়বেন, হজ কিভাবে আদায় করবেন, যাকাত কিভাবে প্রদান করবেন, সমাধান দিবেন আলেমগণ। আপনার ইচ্ছামতো করলে হবে না। ঠিক এমনিভাবে যে সমস্ত আলেম মুজতাহিদ নন তাদের জন্য মুজতাহিদগণ সমাধানদাতা। ইমাম আবূ হানীফা রহ. একজন মুজতাহিদ ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. সকলেই একেকজন মুজতাহিদ ছিলেন। যে সকল আলেম তাদের সমপর্যায়ের নন তাদের জন্য এ ইমামগণ সমাধানদাতা।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ দ্বারা এই শেষোক্ত সমাধানদাতা মুজতাহিদগণের কথা বুঝিয়েছেন। তুমি আলেম হও আর না হও যদি মুজতাহিদ না হয়ে থাকো তাহলে মুজতাহিদগণের সমাধান মানতেই হবে।

কাজেই ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. তাফসীরে কাবীরে লিখেন, আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন– আল্লাহর হুকুম মানো, এর অর্থ ইসলামের যে বিধি-বিধান স্পষ্টভাবে কুরআন থেকে পাও সেটা কুরআন থেকে গ্রহণ করো। এরপর যে বলেছেন– রাসূলের হুকুম মানো, এর মর্ম হল ইসলামের যে বিধান কুরআন থেকে না পাও তা রাসূলের হাদীস থেকে গ্রহণ করো।

ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাইরে সমাধানদাতার ব্যাপারে এ দু'টি উদাহরণ বুঝে থাকলে পরবর্তী কথাগুলো বুঝা আপনাদের জন্য সহজ হবে।

আমরা সকল মুসলমান জানি এবং বিশ্বাস করি যে, ইসলামের বিধান মতে রমাযান মাসে রোযা রাখা ফরয। ইসলামের এ বিধানটি পেলাম কোথায়? আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার বেশ কয়েকটি আয়াতে রমাযান মাসে রোযা রাখার বিধানটি ফরয করেছেন। কিন্তু কতদিন রোযা রাখা ফরয, এর সমাধান কুরআনে নেই। এই না থাকার কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, কুরআনে উল্লেখ না থাকার উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হলো, অনেক বিষয় এমন আছে কুরআনে যদি আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দেন অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে দেন তাহলে তোমাদের দু'টি ক্ষতি হবে-

১. হয়তো তোমরা সঙ্কটের মুখোমুখি হবে।

২. নয়তো তোমরা কম উপকৃত হবে।

বেশি উপকৃত হওয়ার জন্য এবং কোনো সঙ্কটের সম্মুখীন না হওয়ার জন্য অনেক বিধান আল্লাহ তাঁর কুরআনে বলেননি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাদীসে বলেননি।

এবার বুঝুন, আল্লাহ এখানে কতদিন রোযা রাখতে হবে তা কেন বলেননি! মুফাসসিরগণ বলেছেন, যদি আল্লাহ বলে দিতেন রমাযান মাস আসা মাত্রই তোমাদের লাগাতার ৩০ দিন রোযা রাখতে হবে। এই ৩০ সংখাটা যদি আল্লাহ পরিষ্কাভাবে কুরআনে বলে দিতেন, তাহলে যে বছর রমাযান মাসে ২৯ তারিখ বিকেল বেলা ঈদের চাঁদ দেখা যেতো, সে বছর ঈদের দিন রোযা রেখে আল্লাহর ঘোষিত ৩০ সংখ্যা পুরা করতে হতো। তখন সুবিধা না হয়ে আরো সঙ্কট দেখা দিতো? তোমাদেরকে এই সঙ্কট থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেননি। কাজেই এখন সংখ্যাটা পাওয়া যাবে ইসলামের বিধান পাওয়ার দ্বিতীয় ঠিকানা রাসূলের হাদীসে। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে বছর রমাযানের ২৯ তারিখ বিকালে ঈদের চাঁদ দেখা যাবে সে বছর ২৯টি রোযা রাখা ফরয হবে। আর যে বছর রমাযান মাসের ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা যাবে না, সে বছর ৩০টি রোযা রাখা ফরয হবে।

দেখুন, কোন মাসে কতদিন রোযা রাখা ফরয এই প্রশ্নের সমাধান কুরআনে না পেয়ে আমরা পেলাম হাদীসে।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বাণী أَطِيعُوا اللَّهَ এর মর্ম হলো, ইসলামের যে বিধান কুরআনে পাও সেটা কুরআন থেকে গ্রহণ করো।

أَطِيعُوا الرَّسُولَ এর মর্ম হলো, ইসলামের যে বিধান কুরআনে পাওয়া যায় না বরং রাসূলের হাদীসে পাওয়া যায় সেটা সেখান থেকে গ্রহণ করো।

এরপর যে বললেন, أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ (অর্থ) তোমাদের সমাধানদাতাদের হুকুম মানো। এখানে সমাধানদাতাগণ বলতে বুঝিয়েছে মুজতাহিদগণকে। এই উম্মতের মুজতাহিদগণ বাকি সমস্ত উম্মতের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধানদাতা। এরা যে সকল বিষয়ে কুরআন এবং হাদীসে স্পষ্ট কোন বিধান পাওয়া যায় না সে সকল বিষয়ে সমাধান দিবেন।

এখন কথা হলো, তারা সমাধান দিবেন কোথা থেকে? তাদের পরিচয় ও যোগ্যতা সম্পর্কে একটু আলোচনা হওয়া দরকার। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসা'র ৮৩নং আয়াতে একদল মানুষের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কোনো

কারণে যদি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সমাধান না দেন, রাসূলও যদি হাদীসে এর সমাধান না দিয়ে থাকেন তাহলে একদল মানুষের হাতে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যারা কুরআন হাদীসের আলোকে গবেষণা করে তোমাদেরকে এর সমাধান বের করে দিবেন।

এই সমাধানকারীদেরকে ইসলামের পরিভাষায় মুজতাহিদ বলা হয়। তাদের গবেষণাকে ইজতিহাদ বলা হয়। তাদের গবেষণার নীতিমালাকে কিয়াস এবং গবেষণা করে সমাধান বের করাকে ইস্তিম্বাত বলা হয়।

এরাই সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধানদাতা। সন্তানের জন্য মা-বাবা, ছাত্রের জন্য উস্তাদ, মুরীদের জন্য পীর, সদস্যের জন্য দলনেতা, জনগণের জন্য সরকারও এতবড় সমাধানদাতা নয়; গোটা মুসলিম জাতির জন্য মুজতাহিদগণ যতবড় সমাধানদাতা।

এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, হুকুম মানো সমাধানদাতাগণের। এটা হলো ঐ সমাধান যেটা কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট পাওয়া যায় না। যেমন- আযান, ইকামত এবং নামাযে মাইকের ব্যবহার জায়েয কি জায়েয নয় এর কোন সমাধান কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না। এ ধরনের বিষয়ের সমাধান বের করার জন্য আল্লাহ তা'আলা একদল মানুষের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এদের নাম হল মুজতাহিদ। তারা যদি ঐক্যবদ্ধ সমাধান বের করেন তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের ব্যাপারে তাঁর হাদীস শরীফে অগ্রিম অনুমোদন দিয়ে বলেন,

إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة.

(সহীহ মুসলিম; হাদীস ২১৬৭)

এ হাদীসের মর্ম হলো, যে সমাধান তোমরা কোরআনে পেলে না, হাদীসেও পেলে না সে বিষয়ের সমাধান যদি মুজতাহিদগণ ঐক্যবদ্ধভাবে বের করে দিতে পারেন, তবে তা শতকরা একশত ভাগ নির্ভুল ইসলামী বিধান বলে গণ্য হবে। কুরআন-হাদীস যেমন শতভাগ নির্ভুল, মুজতাহিদগণের ঐক্যবদ্ধ সমাধানও শতকরা একশত ভাগ নির্ভুল।

মুজতাহিদদের নির্ভুল ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তের একটি উদাহরণ

রাসূলের ইন্তিকালের পর রাসূলের খলিফা কে হবেন এটা একটা বিরাট প্রশ্ন ছিলো। এই প্রশ্নের জবাব কুরআনের কোন আয়াতে নেই। রাসূলের কোন হাদীসেও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই। যে বিষয় কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই অথবা উল্লেখ আছে অস্পষ্টভাবে অথবা সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ থাকলেও পরস্পর

বিরোধী সে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা মুজতাহিদদেরকে ইজতিহাদ করে হুকুম বের করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

রাসূলের ইন্তিকালের পর খলিফা কে হবেন? কুরআন-হাদীসে উল্লেখ না থাকায় সাহাবায়ে কেরামকে ইজতিহাদ করতে হয়েছে। তারা একটি হাদীসের আলোকে ইজতিহাদ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত। মসজিদে যেতে পারছিলেন না। তখন হযরত আবূ বকর রাযি. কে নামাযের ইমামতির জন্য হুকুম করেছিলেন। তার কাছে আপত্তি জানানো হলো আবূ বকর বড় কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি যখন মুসল্লায় দাঁড়িয়ে ইমামতি করবেন; আপনার চিন্তায় ভেঙ্গে পড়বেন। কাঁদতে কাঁদতে নিজের নামাযও ভেঙ্গে ফেলবেন। জামাআতের নামাযও ভেঙ্গে ফেলবেন। কাজেই এমন কোমল-হৃদয় মানুষকে ইমামতির জন্য না দিয়ে সাহসী হযরত উমর রাযি. কে ইমামতি করার জন্য দিলে ভালো হয়। এ আপত্তির পরও রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকরকেই নামাযের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

একজনের পরিবর্তে আরেকজন দায়িত্ব পালন করাকে খিলাফত বলে। যিনি দায়িত্ব পালন করেন তাকে খলীফা বলে। বুখারী শরীফে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর রাযি. কে নামাযের খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। এ হাদীস থেকে সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদ করে হযরত আবূ বকর রাযি. কে রাষ্ট্রের খলীফা নিযুক্ত করেন।

এখানে আবূ বকরকে খলীফা বানানোর সিদ্ধান্ত কুরআন-হাদীস থেকে পাওয়া যায়নি; বরং সমাধানদাতাদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। সকল সাহাবা ঐক্যবদ্ধভাবে হযরত আবূ বকর রাযি. কে খলীফা নিযুক্ত করেন। এই ঐক্যভাবে ফায়সালা করার নাম ইজমা। কুরআন ও হাদীস যেমন একশত ভাগ নির্ভুল ঠিক তেমনিভাবে উম্মতের ইজমাও একশতভাগ নির্ভুল।

ইজমার প্রকারভেদ

ইজমার তিনটি স্তর রয়েছে-

১. সাহাবাগণের ইজমা।

২. মুজতাহিদ ইমামগণের ইজমা।

৩. যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের ইজমা।

তিনটা ইজমার তিনটা উদাহরণ পেশ করবো।

সাহাবাগণের ইজমা

যে ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা হয়ে যায় সে ব্যাপারে কোনো মাযহাবের ইমামের কথা বলার অধিকার থাকে না। এ জন্যই হযরত আবূ বকর রাযি. কে খলীফা বানানোর ব্যাপারে চার মাযহাবের কোন ইমামের কোনো মন্তব্য নেই। মন্তব্য করার অধিকারও নেই।

মুজতাহিদ ইমামগণের ইজমা

মুজতাহিদদের ইজমা বুঝার আগে আমরা দু'জন ইমামের দু'টি মাসআলা জেনে নিই। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মতে নামাযে রক্ত গড়িয়ে পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বিবিকে স্পর্শ করলে উযূ ভাঙ্গে না।

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মতে বিবিকে স্পর্শ করলে উযূ ভেঙ্গে যায়। তবে রক্ত গড়িয়ে পড়লে নামায ভাঙ্গে না।

মুজতাহিদদের এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মতকে ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব বলা হয়।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে, তাবেঈদের যুগে এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও মুজতাহিদদের অনুসরণ করে আমল করা হতো।

তাবে-তাবেঈদের যুগে এসে একদল লোকের আবির্ভাব হলো। তারা সুবিধা মতো মাযহাব মানতো। রক্ত গড়িয়ে পড়ার বেলায় ইমাম শাফেয়ী আর বিবিকে স্পর্শ করার বেলায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর মত গ্রহণ করতো।

বলুন তো এরা মাযহাবের অনুসরণকারী না মতলববাজ? মতলববাজ। এমন মতলববাজ নবীর যুগে ছিলো না, সাহাবাদের যুগে ছিলো না, তাবেঈদের যুগে ছিলো না। তাবে-তাবেঈদের যুগ থেকে এ ধরনের লোক সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের মতলববাজ লোক তৈরি হওয়ার পর ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে– প্রত্যেককে চার মাযহাবের যে কোনো একটার বিধান অনুযায়ী আমল করতে হবে। চার মাযহাবের বাইরে আমল করা যাবে না। আজকে একটা কালকে আরেকটা এমনটি করা যাবে না।

সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম, যেই বিষয়ের সমস্যা সাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিলো না; পরবর্তী যুগে দেখা দিয়েছে, সেই ব্যাপারে যদি মুজতাহিদগণ ঐক্যবদ্ধ সমাধান দেন তাহলে সেটাকেই বলা হয় মুজতাহিদদের ইজমা। সেটার ব্যাপারে যে সকল আলেম মুজতাহিদ নন তাদেরও দ্বিমত করার অধিকার থাকে না।

মাযহাব প্রসঙ্গে জরুরী একটি কথা

মুজতাহিদ ইমামগণের ভিন্ন ভিন্ন মতামত ও তাদের মাযহাব প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন মানুষের মনে তৈরি হয়। প্রশ্নটি হলো, কোন্ দেশের মানুষ কোন্ মাযহাব পালন করবে? এই প্রশ্নের জবাবও আরেক হাদীসের আলোকে স্পষ্ট।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয রাযি. কে ইয়ামানের গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কিভাবে সমাজে ফায়সালা করবে? তিনি বলেছিলেন কুরআনের বিধান অনুযায়ী। প্রশ্ন করলেন, সেখানে না পেলে? উত্তর দিলেন, হাদীসের বিধান মতে। প্রশ্ন করা হলো, সেখানেও না পেলে? মু'আয রাযি. বললেন, ইজতিহাদের মাধ্যমে। একজনের ইজতিহাদ ও মতামতকেই তো মাযহাব বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইয়ামানবাসীকে মু'আয ইবনে জাবালের মাযহাব মানার নিয়ম চালু করে দিয়েছেন।

সুতরাং এই হাদীসের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে দেশে যার মাযহাব চালু আছে সেই দেশে তার মাযহাবের অনুসরণ করা হবে।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন হয়, মাযহাব বা মত তো অনেকগুলো। তাহলে কোন্টি কুরআন-হাদীস অনুযায়ী আর কোন্টি কুরআন-হাদীস বিরোধী?

একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই প্রশ্নের জবাব দিবো। কুরআনের সূরা বাকারা'র ২২৮নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ.

> অর্থ : তালাকপ্রাপ্তা নারীরা ভিন্ন স্বামী গ্রহণের আগে কিছু সময় অপেক্ষায় থাকবে। (সূরা বাকারা; আয়াত ২২৮)

কতদিন অপেক্ষা করবে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ। এই قُرُوء শব্দের দুইটি অর্থ আছে। হায়েয অবস্থার নাম قُرُوء। পবিত্র অবস্থার নামও قُرُوء।

দেখা গেলো قُرُوء শব্দের দুই অর্থ। একটা আরেকটার বিরোধী। ইমাম শাফেয়ী রহ. পবিত্রতার অর্থ নিয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. অপবিত্রতার অর্থ নিয়েছেন।

আপনারাই বলেন, এখানে কোনো মাযহাব কি কুরআন বিরোধী হয়েছে? নাকি দুই মাযহাবই কুরআন সাপেক্ষ হয়েছে? কারণ দুই মাযহাবের মূল বক্তব্যই তো

কুরআনে আছে। তাহলে বুঝা গেলো কোনো মাযহাব কুরআন বিরোধী নয়। প্রত্যেক মুজতাহিদের সমাধানই ইসলামী সমাধান বলে বুঝতে হবে।

সুতরাং যারা বলে, মাযহাব কুরআন বিরোধী, এরা কুরআন-হাদীস বলতে কিছুই বুঝে না।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের ইজমা

ইজমার তৃতীয় স্তর হলো– যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণের ইজমা। যুগশ্রেষ্ঠ আলেমগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, আযান-ইকামতে ও দীনী কাজে মাইক ব্যবহার করা যাবে।

ইজমা না থাকলে করণীয়

এখন যদি কোন বিষয়ের সমাধান কুরআন-হাদীসে না থাকে, আবার সে ব্যাপারে তিন স্তরের ইজমার কোনটাই সংঘটিত না হয় তাহলে সে ব্যাপারে ইমামের মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলছেন,

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ.

এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

> ‘যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা দেয় তাহলে বিষয়টা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে সমর্পণ করো।’ (সূরা নিসা; আয়াত ৫৯)

আপনারাই বলুন, মতভিন্নতা দেখা দেয় কোন বিষয়ে? যে বিষয়ে ইজমা ও উম্মতের ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে সে বিষয়ে কি আর মতভিন্নতা থাকা সম্ভব? ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. বলেন,

> আল্লাহ তা‘আলার এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে বিষয়ের সমাধান কুরআন-হাদীস ও উম্মতের ইজমা থেকে পাওয়া যাবে না সেই বিষয়ে ইমামগণের মাযহাব অনুসরণ করতে হবে এবং সবগুলোই আল্লাহ ও রাসূলের মর্জি মোতাবেক ইসলামী সমাধান হিসেবে গণ্য হবে।

আলোচনার সারকথা

সূরা মায়িদার তিন নম্বর আয়াতে দীন বলতে ইসলামের বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। ইসলামের এই বিধি-বিধান চারটি উৎসের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হবে। সেই চারটি উৎস হলো-

১. কুরআন

২. হাদীস

৩. উম্মতের ইজমা

৪. ইমামগণের মাযহাব

সুতরাং এই চার ঠিকানা ছাড়া অন্য কোন ঠিকানা গ্রহণ করলে সেটা হবে বিদ‘আত।

সুতরাং ইসলামের নামে যদি এমন কিছু করা হয় যেটা এই চার উৎসের কোথাও নেই তাহলে সেটাই হবে বিদ‘আত।

বিদ‘আতের দৃষ্টান্ত

বর্তমানে ১২ই রবিউল আউয়ালে কিছু লোক একটা মিছিল করে। এই মিছিলের নাম জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের এক পীরকে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিলো। সে পীরের নাম তৈয়ব শাহ। সে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে ১২ই রবিউল আউয়ালে সমস্ত লোকদের মিছিল করার নির্দেশ দিয়েছিলো। নাম দিয়েছিলো জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী। ১৯৭৪ সালের আগে এই নামে কেউ মিছিল করেনি। এখন যারা এই নামে মিছিল ও ঈদ পালন করে তাদের বাপ, দাদা, পরদাদা এই নামে ১৯৭৪ সালের আগে কোন মিছিল ও ঈদ পালন করেনি। এই মিছিল না করলে যদি কাফের হয়ে যায়, তাহলে তো তারা সবাই কাফের ছিলো।

তারা এই মিছিলে আরো একটি চটকদার শ্লোগান দিয়ে থাকে- ‘যিন্দা নবীর আগমন; শুভেচ্ছা স্বাগতম।’

রাসূলের ইন্তিকালের পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হয়েছে যারা রাসূলের ইন্তিকাল মানে না। তারা দাবি করে যে, যিন্দা নবীর আবার মরণ কিসের? কেউ বলে যারা নবীর মৃত্যুর বিষয়ে স্বীকৃতি দিবে তারা ওহাবী ও কাফের। নবীজীর মৃত্যুর কথা বললেই যদি কাফের হয়ে যায় তাহলে এ আয়াতের কি অর্থ হবে? আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে নবীজীকে সম্বোধন করে বলেছেন,

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ.

> অর্থ : নিশ্চয় আপনি মরণশীল আর তারাও মরণশীল। (সূরা যুমার; আয়াত ৩০)

তো নবীজিকে মৃত বললেই যদি কাফের হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তা‘আলাকে কী বলবে!?

যদি কেউ বলে, প্রথমে রাসূলের ইন্তিকাল হয়েছে, পরে আবার তাঁকে যিন্দা করা হয়েছে এবং সেখান থেকে আমাদের মজলিসসমূহে তিনি আগমন করেন তাহলে আমরা বলবো, আগমনের কথা কোথায় পেলে? সুতরাং আগমনের বিষয়টা স্পষ্ট গোমরাহী এবং ভণ্ডামী।

আপনারা শুরুতেই জেনেছেন, ইসলামের নামে ভ্রান্তি দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ভ্রান্তির মাধ্যমে কাফের হয়ে যায়। দ্বিতীয় প্রকার ভ্রান্তির মাধ্যমে বিদ‘আতী হয়ে যায়। ভেজালযুক্ত হয়ে যায়।

এ মূলনীতির আলোকে ‘রাসূলের কখনো ইন্তিকাল হয়নি, দাফনের আগেও না পরেও না’– এটা কুফুরী কথা। আর ‘রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মজলিসে আগমন করেন’– এটা রাসূল বিরোধী শ্লোগান, হাদীস বিরোধী শ্লোগান। এমন শ্লোগান দিয়ে কেউ আশেকে রাসূল হতে পারে না।

ঈদে মিলাদুন্নবীর ব্যাপারে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি

হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ আমার মুসলমান উম্মতের জন্য বার্ষিক দুইটি ঈদের ব্যবস্থা করেছেন। একটি ঈদুল ফিতর, আরেকটি ঈদুল আযহা। এখন যদি আপনি ১২ রবিউল আউয়ালে আরেকটি ঈদ পালন করেন তাহলে এর সিরিয়াল নম্বর হবে তিন। এ নম্বরটাই তো বলে দিচ্ছে যে, এই ঈদ বিদ‘আত। কারণ রাসূল বলেছেন দুইটি। আর আপনি পালন করেন তিনটি। ঈদে মীলাদুন্নবীর শুরু শেষ সবটুকুই বিদ‘আত।

শেষকথা

সুতরাং সাবধান উম্মতে মুসলিমা! মনগড়া কোন কাজ করবেন না। করলে বিদ‘আতী হবেন। আর বিদ‘আতী হলে জান্নাতের পথ হারাবেন। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار.

> অর্থ : তোমরা নবোদ্ভাবিত বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকো। কেননা প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা। অন্য এক রেওয়ায়েত মতে প্রত্যেক ভ্রষ্টতার শেষ পরিণাম জাহান্নাম। (আল-মু’জামুল কাবীর লিত-তাবারানী; হাদীস ৬১৭, সুনানে নাসায়ী; হাদীস ১৭৮৬)

বর্তমান যামানায় যারা বিদ‘আতী কথা-বার্তা ছড়ায় তাদের থেকে দূরে থাকবেন। এমন ফিতনার যামানায় যারা বিদ‘আত থেকে দূরে থাকবে এবং

চার দলীলে অটল থাকবে, তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

المتمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد.

> অর্থ : যে ব্যাক্তি ফিতনা-ফাসাদের সময় আমার সুন্নাতের উপর অটল থাকবে, সে শহীদের সাওয়াব পাবে। (আল-মু’জামুল আওসাত লিত-তাবারানী; হাদীস ৫৪১৪)

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সবাইকে শরীয়ত বর্ণিত চার ঠিকানা ও উৎস থেকে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করে দুনিয়া-আখেরাতের জীবনকে সফল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অনুলিখন ও পরিমার্জন : মাওলানা ইরফান জিয়া
দারুত তাসনীফ, মা’হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া

করোনা ও প্রাণঘাতী বালা-মুসীবত কারণ ও আমাদের করণীয়

মুফতী মাহমূদুল আমীন*

বিপদাপদের কারণ

বর্তমান বিশ্ব নানাবিধ বিপদে আক্রান্ত। নিত্যনতুন মহামারীতে গোটা বিশ্ব বিপর্যস্ত। এক একটি মহামারীতে মানুষের উন্নত প্রযুক্তি, শক্তি ও দম্ভোক্তি ধূলায় মিশে যাচ্ছে। মানবজাতির এ অসহায়ত্ব মহান রাব্বুল আলামীনের বাণীরই সত্যায়ন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا.

> অর্থ : মানুষকে অতি দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা নিসা; আয়াত ২৮)

করোনা, ইবোলা, ডেঙ্গু, এইড্সসহ ভয়ঙ্কর যেসব রোগ-ব্যাধিতে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত এর জন্য মানুষই দায়ী। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন ও তাঁর হুকুম মান্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

> অর্থ : আমি মানুষ ও জিন জাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত; আয়াত ৫৬)

কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ তাকে সৃষ্টি করার এ উদ্দেশ্য ভুলে গেছে। তারা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্যের পরিবর্তে আল্লাহর নাফরমানীতে আকণ্ঠ ডুবে আছে। তারা শুধু নিজেরা অবাধ্য হয়েই ক্ষান্ত নয়; বরং মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ, যারা মুসলিম, যারা আল্লাহর অনুগত, আল্লাহর হুকুম মানতে চায় তাদের পথও ওরা আগলে দাঁড়ায়। জুলুম, নির্যাতন আর চরম নিপীড়নে আল্লাহর অনুগত মুসলিমদের নাম-নিশানা আল্লাহর যমীন থেকে মুছে ফেলতে চায়।

তাইতো আজ চোখ মেললেই ভেষে ওঠে উইঘুর মুসলিমদের উপর জালিম চাইনিজদের নির্যাতনের করুণ চিত্র। কান পাতলেই শোনা যায় মগদস্যুদের নিপীড়নে সম্ভ্রমহীন মুসলিম মা-বোনদের বুকফাটা আর্তচিৎকার। আমাদের প্রতিবেশী দেশের রাজধানীতে মালউন হিন্দুদের পাশবিক আগ্রাসন ও নিহত মুসলিম ভাই-বোনের লাশের উপর জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে লম্ফঝম্ফ করার দৃশ্যও বিশ্ববাসীকে দেখতে হয়েছে। আল্লাহর ঘর মসজিদে আক্রমণ এবং তার মিনারে হনুমান পতাকা উড্ডয়ণের মত ভয়ানক অন্যায়ও প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত হয়েছে। কাশ্মীর, ফিলিস্তীন, চেচনিয়া, বসনিয়া, সিরিয়াসহ গোটা বিশ্ব যেন আল্লাহর অনুগত বান্দাদের তাজা খুনের রক্ত পলাশে পরিণত হয়েছে। মুসলিম নামধারী অনেক ক্ষমতাধরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুফুরী শক্তিকে সমর্থন করে মুসলিম খুনে নিজেদের আমলনামাকে রক্তলাল করছে।

আর যারা মুসলিম। যারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে দাবি করে থাকে, তাদেরও অধিকাংশ অহরহ আল্লাহর নাফরমানী করে যাচ্ছে। নামায-রোযার পাবন্দী নেই। হজ-যাকাতের গুরুত্ব নেই। আল্লাহর নামারমানী থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা নেই। সুদ-ঘুষ, জুলুম-নির্যাতন, ধোঁকা-প্রতারণা, ধর্ষণ-লুণ্ঠনসহ সকল প্রকার গুনাহই মুসলিম সমাজে বিদ্যমান। অধিকাংশ মুসলমানের বাহ্যিক দেহাবয়বে ইসলামের কোন ছাপ নেই। মুসলিম দেশের বেশিরভাগ শিক্ষালয়েও কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা নেই, আল্লাহর আনুগত্যের দীক্ষা নেই, আর এজন্য অভিভাবকদের অনুশোচনাও নেই। ফলে তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের অশ্লীলতায় পথে-ঘাটে চোখ মেলাও দায়। তাদের ধর্মহীনতায় আঁতকে ওঠে মুমিন হৃদয়।

এতসব অন্যায়, অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের পরও আল্লাহ তা'আলা যে

মানবজাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, আসমান যমীন ঠিক রেখেছেন, পৃথিবীর আলো-বাতাস বহাল রেখেছেন এটা মহান রাব্বুল আলামীনের অপার করুণা বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ.

> অর্থ : তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (সূরা শূরা; আয়াত ৩০)

* মুদীর, মা'হাদুল বুহূসিল ইসলামিয়া, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
মুদাররিস, জামি'আ ইসলামিয়া, চরওয়াশপুর, ঢাকা
খতীব, আজিমপুর সরকারি কলোনি (পার্টি হাউস) জামে মসজিদ, আজিমপুর, ঢাকা

আল্লাহ তা'আলা যদি মাফ না করতেন তাহলে পুরো ধরাপৃষ্ঠ মানবশূন্য হয়ে পড়তো। তবে কোনো সম্প্রদায় যদি সীমালংঘনের চরমে পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা আযাব দিয়ে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা আ'দ, সামুদ, ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন। কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সূরা হা-ক্কাহ'র শুরু দিকে তাদের ধ্বংসের বিবরণ এভাবে এসেছে,

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ. فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ. وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ.

অর্থ : সামুদ ও আদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিলো। অতঃপর সামুদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় দ্বারা। আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। আপনি তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পান কি?

ফিরাউন, তাঁর পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিলো। তারা তাদের পালনকর্তার রাসূলকে অমান্য করেছিলো। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরহস্তে পাকড়াও করলেন। যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিলো, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। যাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে। (সূরা হা-ক্কাহ; আয়াত ৪-১২)

কখনো আবার আল্লাহ তা'আলা কিছুটা শাস্তি ও বিপদাপদ দিয়ে মানুষকে সতর্ক করেন এবং তওবা করে দ্রুত তাঁর আনুগত্যে ফিরে আসার সুযোগ দেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

অর্থ : স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা রূম; আয়াত ৪১)

বিপদাপদে এবং মহামারী অবস্থায় আমাদের করণীয়

এক. তওবা করা ও ইসলামের অনুশাসন পরিপূর্ণ মেনে চলা

করোনা, চিকুনগুনিয়া, এইড্‌সসহ সকল রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ যেহেতু মানুষের গুনাহের ফল। এজন্য সর্বপ্রথম করণীয় হলো, সকল প্রকার গুনাহ বর্জণ করা। যে সকল অমুসলিম স্থায়ীভাবে বিপদ থেকে বাঁচতে চায় তাদের জন্য উচিত হলো দ্রুত ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা। আর মুসলমানদের জন্য জরুরী হলো দ্রুত সকল গুনাহ ছেড়ে দিয়ে খালেস দিলে তওবা করা এবং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপনের শপথ নেওয়া। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

অর্থ : হে মুমিন সকল! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ করো না। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা বাকারা; আয়াত ২০৮)

সুতরাং ইবাদত-বন্দেগী, লেন-দেন, আচার-আচরণ, বিবাহ-শাদীসহ সকল কাজ ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক সম্পাদন করতে হবে। নিজের ভিতর-বাহিরকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাজাতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ.

অর্থ : আর তোমার পালনকর্তা এমন নন যে, জনবসতিগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, সেখানকার লোকেরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও। (সূরা হুদ; আয়াত ১১৭)

ভবিষ্যতে সকল গুনাহ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে তওবা করতে হবে। তাহলেই সফলতা আসবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ : মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (সূরা নূর; আয়াত ৩১)

তওবার মাধ্যমে অত্যাসন্ন বিপদও দূর হয়ে যায়। যেমন- হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কওমের ক্ষেত্রে হয়েছিলো। আল্লাহর আযাব যখন কালো হয়ে গোটা আকাশ ছেয়ে ধেয়ে আসছিলো তখন তারা তওবা করেছিলো এবং ঈমান আনয়ন করেছিলো। ফলে আল্লাহ তাদের উপর থেকে আযাব উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.

অর্থ : সুতরাং কোন জনপদের অধিবাসীরা কেন এমন হলো না যারা ঈমান এনেছে অতঃপর তার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর? অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা আলাদা। তারা যখন ঈমান আনে তখন আমি পার্থিব জীবনে তাদের উপর থেকে অপমানজনক আযাব তুলে নিই এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। (সূরা ইউনুস; আয়াত ৯৮)

দুই. তাকওয়া অবলম্বন, সুন্নাতের অনুসরণ এবং ইস্তিগফার করা

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

অর্থ : অথচ আল্লাহ কখনই তাদের উপর আযাব নাযিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দিবেন না। (সূরা আনফাল; আয়াত ৩৩)

এই আয়াতে আল্লাহর আযাব না আসার দু'টি কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে। (১) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকা। (২) ইস্তিগফার করতে থাকা (গুনাহ হলে মাফ চাইতে থাকা)।

এ যামানায় প্রথমটি প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া তো সম্ভব নয়; কিন্তু উলামায়ে কেরাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করলো এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করলো সে যেন নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই আছে। সুতরাং সেও আযাব থেকে বেঁচে থাকবে।

হযরত মু'আয বিন জাবাল রাযি. যখন ইয়ামান যাচ্ছিলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে কিছুপথ পায়ে হেঁটে চললেন। অতঃপর বললেন, মু'আয! এরপর হয়তো আমার সাথে তোমার আর দেখা হবে না। এরপর যখন মদিনায় আসবে হয়তো আমার মসজিদ ও আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে। একথা শুনে হযরত মু'আয রাযি. কাঁদতে লাগলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বললেন,

ان أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا.

অর্থ : নিশ্চয়ই আমার কাছের মানুষ হলেন মুত্তাকীগণ সে যেই হোক, যেখানেই থাকুক। (মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ২২৯৫১)

সুতরাং এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হলো, যারা মুত্তাকী তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই আছে। তারা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাবে ইনশা-আল্লাহ। আর মুত্তাকীগণ আল্লাহ তা'আলার বন্ধুও। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ.

অর্থ : কেবল মুত্তাকীগণই আল্লাহর বন্ধু। (সূরা আনফাল; আয়াত ৩৪)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুদেরকে আযাব দিবেন না।

সূরা আনফালের ৩৩নং আয়াতে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার দ্বিতীয় উপায় বলা হয়েছে ইস্তিগফার তথা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ.

অর্থ : যে ব্যক্তি ইস্তিগফার (গুনাহ থেকে মাফ চাওয়া) কে অপরিহার্য করে নিবে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রত্যেক সঙ্কট থেকে মুক্তি দিবেন, প্রত্যেক পেরেশানী থেকে উদ্ধার করবেন এবং তাকে অকল্পনীয় স্থান থেকে রিযিক দান করবেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৫১৮)

এজন্য জালালুদ্দীন রূমী রহ. বলেছেন,

غم چوں بینی زود استغفار کن، غم بامر خالق آمد کار کن۔

গম চুঁ বীনী যূদ ইস্তিগফার কুন,

গম বাআমরে খালেক আ-মাদ কা-র কুন।

> অর্থ : যখনই কোন পেরেশানী দেখ সাথে সাথে ইস্তিগফার করো। কেননা এই পেরেশানী আল্লাহর হুকুমে এসেছে, সুতরাং তার হুকুম মত আমল করো।

তিন. নাহী আনিল মুনকার বা অসৎ ও অন্যায় অবিচার বন্ধে সচেষ্ট হওয়া

আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার জন্য শুধু নিজে পাপাচার থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং নাহী আনিল মুনকার তথা নিষিদ্ধ ও অন্যায় কাজ থেকে অন্যকে বারণ করাও আবশ্যক। অবিচার ও পাপাচার বন্ধে সচেষ্ট হওয়াও জরুরী। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

> নিশ্চয়ই মানুষ যখন কাউকে জুলুম করতে দেখেও তাকে বাধা দেয় না, তখন এ আশঙ্কা তৈরি হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আযাবকে ব্যাপক করে দিবেন। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২১৬৮, সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৪৩৩৮)

কুরআনে কারীমে বনী ইসরাঈলের একটি ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের লোকদের জন্য শনিবার আল্লাহর পক্ষ হতে মাছ শিকার করা নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু একদল অসাধু জেলে কৌশলে মাছগুলো আটকে রেখে রবিবার সেগুলো ধরতো। একদল লোক তাদেরকে এই অন্যায় কাজ থেকে বারণ করলেন। আরেক দলের অন্তরে তাদের এই অসৎ কাজের প্রতি ঘৃণা ছিলো ঠিক কিন্তু তারা তাদেরকে এ কাজে বাধা দিলো না; বরং বারণকারী দলকে বললো, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছো, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আযাব দিতে চান-কঠিন আযাব?

এরপর আল্লাহ তা'আলা যারা অন্যায় করেছে এবং যারা অন্যায় থেকে বারণ করেনি উভয় দলকে নিকৃষ্টতম আযাবে নিপতিত করেছেন। শুধুমাত্র বারণকারী দলকে নাজাত দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

> 'আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো যা ছিলো নদীর তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশের

> ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল। যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর। আর যেদিন শনিবার হত না, আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিলো অবাধ্য।
>
> আর যখন তাদের মধ্যে থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছে, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আযাব দিতে চান– কঠিন আযাব? তারা বলল, তোমাদের পালনকর্তার নিকট দায়িত্ব মুক্তির জন্য এবং এজন্য যেন তারা সাবধান হয়ে যায়।
>
> অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিলো, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গুনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের অবাধ্যতার দরুণ।
>
> তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিলো, তখন আমি নির্দেশ দিলাম– তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।' (সূরা আ'রাফ; আয়াত ১৬৩-১৬৬)

সুতরাং আযাব থেকে বাঁচার জন্য শুধু অন্তরের ঘৃণা যথেষ্ট নয়; বরং সাধ্যানুযায়ী নাহী আনিল মুনকার করাও জরুরী। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

> তোমাদের মধ্য হতে কেউ কোন অন্যায় হতে দেখলে সে যেন হাত (শক্তি) দ্বারা পরিবর্তন (প্রতিহত) করে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে মুখ দ্বারা বারণ করবে। যদি তাও না পারে তাহলে অন্তর দিয়ে পরিবর্তন (পরিবর্তনের চিন্তা) করবে। আর এ (অন্তর দিয়ে পরিবর্তনের ফিকির করা) দুর্বলতম ঈমান। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৪৯)

এ জাতীয় বহু আয়াত ও হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই সাধ্যানুযায়ী অন্যকেও পাপাচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

চার. ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা

বিপদাপদে অধৈর্য্য না হওয়া। অস্থির না হওয়া ও বিলাপ না করা। বরং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে পরম ধৈর্য্যের সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকা। নামায ও ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে থাকা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
>
> অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারা; আয়াত ১৫৩)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হলে নামায পড়তেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৩১৯)

পাঁচ. বালা-মুসীবত থেকে বাঁচার মাসনূন দু'আ ও আমলসমূহ গুরুত্বের সাথে করতে থাকা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদাপদ ও বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার অনেক দু'আ ও আমল শিক্ষা দিয়েছেন। করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে এবং বালা মুসীবত থেকে রক্ষা পেতে সে দু'আ ও আমলগুলো আমাদের নিয়মিত করতে হবে। এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ দু'আ ও আমল নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. প্রতিদিন বাদ ফজর ও বাদ মাগরিব তিনবার করে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করা-

> بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
>
> অর্থ : (আমি শুরু করছি) আল্লাহর নামে যাঁর নামের সঙ্গে আসমান যমীনের কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

ফযীলত : হযরত উসমান রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে এই দু'আটি পাঠ করবে সে আকস্মিক কোন বিপদে পতিত হবে না। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৫০৮৮)

২. নিচের সূরা তিনটি তিনবার করে পাঠ করা-

> قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
>
> অর্থ : বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।
>
> قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
>
> অর্থ : বল, আমি শরণ নিচ্ছি ঊষার স্রষ্টার তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে, রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর হয়, সমস্ত নারীদের অনিষ্ট হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয় এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।
>
> قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَٰهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.
>
> অর্থ : বল, আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

ফযীলত : হযরত খুবাইব রাযি. বলেন,

> একদা আমরা প্রকট অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃষ্টি ভেজা রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বের হলাম, এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়বেন। ইত্যবসরে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, বলো। আমি কিছুই বললাম না। এপর আবার বললেন, বলো। আমি এবারও কিছুই বললাম না। এরপর আবার বললেন, বলো। এবার আমি বললাম, আমি কি বলবো? তিনি বললেন, বলো, قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (সূরা ইখলাস) এবং মু'আউওয়াযাতাইন (সূরা ফালাক এবং সূরা নাস)। এ সূরাগুলো সকাল-সন্ধ্যা তিনবার পাঠ করবে। সবকিছু থেকে এগুলো তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৫৭৫)

৩. নিম্নের দু‘আটি সাতবার পাঠ করা-

حَسْبِيَ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

অর্থ : আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনি মর্যাদাবান আরশের মালিক।

ফযীলত : হযরত আবূ দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা যে ব্যক্তি এ দু‘আটি সাতবার পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার ইহকাল পরকাল বিষয়ক দুশ্চিন্তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। (আ’মালুল ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ, ইবনুস সুন্নী; হাদীস ৭১)

৪. নিম্নের দু‘আটি বেশি বেশি পাঠ করা-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ : আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; আপনি নির্দোষ; আমি গুনাহগার। (সূরা আম্বিয়া; আয়াত ৮৭)

ফযীলত : হযরত ইউনুস আ. এই দু‘আর মাধ্যমে দু‘আ করে মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন– لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ। অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিশ্ববাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। (সূরা আম্বিয়া; আয়াত ৮৭-৮৮)

৫. মাঝে মাঝে এ দু‘আটি পাঠ করা-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি আপনার নিকট শ্বেতরোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ফযীলত : হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দু‘আটি পাঠ করতেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ১৫৫৪)

৬. কাউকে বিপদাক্রান্ত কিংবা রোগাক্রান্ত দেখলে পাঠ করা-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا.

অর্থ : আমি আল্লাহ তা‘আলার প্রসংশা জ্ঞাপন করছি যিনি তুমি যে বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হয়েছো তা হতে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং আমাকে অনেক সৃষ্টজীব হতে ভালো অবস্থায় এবং সসম্মানে রেখেছেন।

ফযীলত : হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

যে ব্যক্তি কোনো বিপদাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখে দু‘আটি পাঠ করবে সে কখনো ওই বিপদে আক্রান্ত হবে না। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ৩৪৩২)

৭. অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করার দু‘আ-

(ক)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

অর্থ : মানবজাতির প্রতিপালক হে আল্লাহ! রোগকে দূর করে দাও; আরোগ্য দান করো। তুমিই আরোগ্যদাতা। তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কেউ রোগমুক্তি দিতে পারে না। এমন আরোগ্য দান করো যা সকল ব্যধিকে দূরীভূত করে দেয়।

ফযীলত : হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন তখন উপরোক্ত দু‘আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৬৭৫, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২১৯১)

(খ) সূরা ফাতিহা নিয়মিত পাঠ করা। সুরা ফাতেহা পাঠ করে পানিতে ফুঁ দিয়ে সে পানি নিজে পান করা ও অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করানো। সূরা ফাতেহা পাঠ করে অসুস্থ ব্যক্তিকে ফুঁ দেওয়াতেও ফায়েদা হয়।

ফযীলত : হযরত আবূ সঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত,

> প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের একটি জামাআত আরবের একটি গ্রামে আসলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাদেরকে মেহমানদারী করলো না। ইত্যবসরে ঐ গ্রামের সর্দারকে সাপে দংশন করলো। ফলে তারা সাহাবায়ে কেরামের কাছে এসে বললো তোমাদের কাছে এর কোনো চিকিৎসা আছে কি? সাহাবাগণ বললেন, তোমরা তো আমাদের মেহমানদারী করোনি, তাই আমাদেরকে বিনিময় না দিলে আমরা চিকিৎসা করবো না। তখন তারা বিনিময়ে এক পাল ছাগল দিতে সম্মত হলো। ফলে এক সাহাবী সূরা ফাতেহা পাঠ করে (আক্রান্ত ব্যাক্তির উপর) থুথু মিশ্রিত দম করলেন (ফুঁ দিলেন)। ফলে সে সুস্থ হয়ে গেলো। তখন ঐ সাহাবী একপাল ছাগল নিয়ে আসলেন। কিন্তু সবাই বললো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে না জিজ্ঞেস করে এই ছাগল আমরা গ্রহণ (ভক্ষণ) করবো না। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হাসলেন এবং বললেন তোমরা কিভাবে জানলে যে সূরা ফাতেহা দ্বারা চিকিৎসা হয়? তোমরা এই ছাগল গ্রহণ করো এবং আমাকেও একটি অংশ দাও। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৭৩৬)

৮. রোগী দর্শনের দু'আ-

(ক)

اَسْئَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَن يَّشْفِيَكَ.

> অর্থ : আমি মহান আরশের প্রতিপালক মহামহিম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি আপনাকে সুস্থতা দান করুন।

ফযীলত : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

> যখন কেউ কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় এবং তার পাশে উপরোক্ত দু'আটি সাতবার পড়ে; যদি সে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই সুস্থতা দান করবেন। (সুনানে আবূ দাউদ; হাদীস ৩১০৬, সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২০৮৩)

(খ)

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللهُ.

> অর্থ : ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। (আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন) ইনশাআল্লাহ। এ রোগ পবিত্রতা সাধনকারী।

ফযীলত : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগী দর্শনে গিয়ে দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৬১৬)

উপসংহার

বিপদাপদ বালা মুসীবত মানুষের গুনাহের ফল। কাফের ও গুনাহগারদের জন্য আল্লাহর আযাব এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সবাব (উপায়)। আর মুমিনের জন্য গুনাহ মার্জনার কারণ ও মর্তবা উন্নত হওয়ার সোপান। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম ইরশাদ করেন,

> মুমিনের বিষয়টি বড় বিস্ময়কর, প্রত্যেক হালতই তার জন্য কল্যাণকর। সে যদি ভালো অবস্থায় থাকে তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করে ও শুকরিয়া আদায় করো, এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি কোন খারাপ হালতে পতিত হয় তাহলেও সে আল্লাহর প্রশংসা করে ও ধৈর্যধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২৯৯৯)

বিশেষ করে মুমিন যদি মহামারি বা এজাতীয় কোন মুসীবতে মারা যায় তাহলে তার শহীদী মর্তবা লাভ হয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম ইরশাদ করেন,

> শহীদ পাঁচ প্রকার ১. যে মহামারিতে মৃত্যু বরণ করে। ২. যে পেটের পীড়ায় মারা যায়। ৩. যে পানিতে ডুবে মারা যায়। ৪. যে ধসে মারা যায়। ৫. যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১০৬৩)

তাই আসুন আমরা বিপদাপদে অস্থির ও বে-সবর না হয়ে এখনই সকল গুনাহ থেকে তওবা করি। আল্লাহর ফয়সালায় রাজি থেকে উল্লিখিত আমলগুলো করতে থাকি। আল্লাহর উপরই ভরসা রাখি। দু'আ ও রোনাযারীর মাধ্যমে তাঁকে রাজি করার চেষ্টা করি। অবশেষে আমরাতো তাঁর কাছেই ফিরে যাবো। তিনিইতো আমাদের মহান মালিক।

হিউম্যান মিল্কব্যাংক
একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মুফতী হাফিজুর রহমান*

সূচনাকথা

বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মিল্কব্যাংক ব্যবস্থাটি বেশ পুরনো। তবে দেশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাটি নতুন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মিল্কব্যাংকের বৈধতা-অবৈধতা এবং সমস্যা ও উপকারিতা নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে। বাস্তবতার দৃষ্টিতে এ ব্যবস্থাটিকে বৈজ্ঞানিক ও নৈতিকতার দিক থেকে জটিলতা ও সমস্যামুক্ত স্বচ্ছ ব্যবস্থা ভাবার সুযোগ নেই। আলোচনার যুক্তিগ্রাহ্যতার খাতিরে বক্ষ্যমান মিল্কব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রথমত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকে সামনে রেখে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর দেশীয় পরিমণ্ডলকে সামনে রেখে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

মিল্কব্যাংক কী?

মিল্কব্যাংক হলো সংক্ষিপ্ত রূপ। পূর্ণ রূপ হলো হিউম্যান মিল্কব্যাংক। এটি ইংরেজি শব্দ। ইংরেজি রূপ হলো Human milk bank। বাংলায় মাতৃদুগ্ধ ভাণ্ডার। আরবীতে بنوك الحليب (বুনূকুল হালীব) বা بنك اللبن (বানকুল লাবান)। উর্দূ ভাষায় انسانی دودھ کا ذخیرہ (ইনসানী দুধ কা যাখীরাহ)।

হিউম্যান মিল্কব্যাংকের পারিভাষিক সংজ্ঞা

পরিভাষায় হিউম্যান মিল্কব্যাংক এমন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় যেখানে স্তন্যদানকারিণী নারীদের থেকে অর্থের বিনিময়ে কিংবা দান হিসেবে বিশেষ পদ্ধতিতে তরল দুগ্ধ সংগ্র করা হয়। এবং বিশেষ পদ্ধতিতে পাস্তুরিত করত সংরক্ষণ করে অসহায় দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে অর্থের বিনিময়ে কিংবা দান হিসেবে প্রদান করা হয়। (জিহাতুল ইসলাম; খণ্ড ১১ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭), সংখ্যা ১, মুহাম্মাদ উমাইর ও মুহাম্মাদ খুবাইব কৃত ইনসানী দুধ কা যাখীরা : শরীয়ত আওর কানূন কি নযর মেঁ)

---

* আমীনুত তা'লীম, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
ইমাম ও খতীব, সাবেদ আলী মোল্লা জামে মসজিদ, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

১৯১০ সালে আমেরিকার বোস্টন শহরে প্রফেসর টালবোট সর্বপ্রথম মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। লন্ডনে ১৯৩৫ সালে মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা পায়। এরপর ডা. মারি এলিজ কায়সার জার্মানির ম্যাগডিবুরি শহরে একটি মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৯৪৭ সালে প্রফেসর লেলংগ পেরিসে মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। এশিয়া মহাদেশে সর্বপ্রথম ইন্ডিয়ার মোম্বাই শহরে ১৯৪৯ সালে লোকমানিয়া তিলাক মিউনিসিপল জেনারেল হসপিটালে ড. আর্মিদা ফর্নান্দেজ মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। সত্তর দশকে এসে মিল্কব্যাংক ধারণার বিস্তৃতি ঘটে। (জিহাতুল ইসলাম খণ্ড ১১ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭), সংখ্যা ১, মুহাম্মাদ উমাইর ও মুহাম্মাদ খুবাইব কৃত ইনসানী দুধ কা যাখীরা : শরীয়ত আওর কানূন কি নযর মেঁ)

মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

যে কোনো কিছু প্রতিষ্ঠার পেছনে নানামাত্রিক ধারণা ও উদ্দেশ্য কাজ করে থাকে। কোনো কোনোটা হয় মৌলিক আবার কোনো কোনোটা হয় প্রাসঙ্গিক। মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠার পেছনেও রয়েছে একাধিক ধারণা ও উদ্দেশ্য।

১. শিশু কর্তৃক অন্য মায়ের দুগ্ধ পানের ইতিহাস বেশ পুরোনো। প্রতিটি সমাজ ও ধর্মেই প্রয়োজন সাপেক্ষে দুগ্ধপানের এ ধারাটি বিদ্যমান ছিলো। পাশ্চাত্য সমাজে এক সময় সমঅধিকারের আওয়াজ উঠে। অধিকার বিষয়ে নারীরা পুরুষের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করে। এতে করে চিরাচরিত পারিবারিক ব্যবস্থা ও বৈবাহিক অবস্থায় ধস নেমে আসে। সন্তান যেহেতু স্বামী স্ত্রী উভয়ের যৌথ সম্পত্তি। তাই এক্ষেত্রে দুগ্ধদানে স্ত্রীরা একক দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানাতে চেষ্টা করে। উপরন্তু তারুণ্য ও রূপ লাবণ্য ধরে রাখার নিমিত্ত দুগ্ধদানে অনাগ্রহী হয়ে উঠে নারী সমাজ। তারা দুগ্ধদানকে তারুণ্য সংহারক হিসেবে জ্ঞান করতে থাকে। এতে করে স্বেচ্ছা দুগ্ধদানকারিণী নারীদের সঙ্কট তৈরি হয়। ফলে দুগ্ধপোষ্য শিশুরা মাতৃদুগ্ধ পান থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য আন্দোলনের ফলে নারীরা অফিস আদালতসহ জগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হতে শুরু করে। ফলে দিনমান অফিস আদালতে পড়ে থাকার ফলে নারীরা নিজেদের দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে দুগ্ধদান থেকে বঞ্চিত করতে শুরু করে। সমঅধিকার সৃষ্টির ফলে দুগ্ধবঞ্চিত শিশুদেরকে দুগ্ধদান করার মত অন্য নারীদের খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর হয়ে পড়ে। এ সমস্যা সমাধানে গরু বকরির দুধ ব্যবহার শুরু হয়। ফলে মার্কেটে গরু বকরির প্রস্তুতকৃত গুড়ো দুধ ও তরল দুধ চলে আসে। কিন্তু ধীরে ধীরে ডিব্বা

দুধের ক্ষতির দিকগুলো সামনে চলে আসে। এর বিকল্প হিসেবে মিল্কব্যাংকের ধারণাটি তৈরি হয়। (জিহাতুল ইসলাম খণ্ড ১১ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭), সংখ্যা ১, মুহাম্মাদ উমাইর ও মুহাম্মাদ খুবাইব কৃত ইনসানী দুধ কা যাখীরা : শরীআত আওর কানূন কি নজর মেঁ)

২. প্রচলিত অর্থব্যবস্থাটা পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এককভাবে যে কোনো মূল্যে অর্থের পাহাড় গড়ে তোলাই হলো এ অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ অর্থব্যবস্থায় ব্যবসা, সেবা ও অর্থোপার্জনের নামে নিত্য নতুন কলা ও কৌশল তৈরি হচ্ছে। বক্ষ্যমাণ মিল্কব্যাংক কন্সেপ্টটিও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার একটি সূক্ষ্ম কৌশল। এগুলো সেবা শিরোনামে আত্মপ্রকাশ করলেও এক সময় পেশাদার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে। এক সময় মানুষের বাস্তবিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্য সামগ্রী আবিষ্কার হতো। এখন আর সে ব্যবস্থা নেই। এখন পণ্যের আবিষ্কার মেকি প্রয়োজন তৈরি করে। এখন পণ্য আগে প্রয়োজন পরে। অল্প কথায় বলতে গেলে এখন প্রয়োজন পণ্য তৈরি করে না বরং পণ্য প্রয়োজন তৈরি করে। ফলে এখন পণ্যটা আগে এসে নানা রকম কলা কৌশলে মানুষের মাঝে অনর্থক ও মেকি প্রয়োজন তৈরি করে। মিল্কব্যাংকের ক্ষেত্রেও এই মনোভাব কার্যকর রয়েছে। ব্যাংক শিরোনামে বিশ্বে অনেক কিছুই তৈরি হয়েছে। কিছু আমাদের দেশে আমদানি হয়েছে। কিছু আমদানির অপেক্ষায় আছে। যেমন ব্লাড ব্যাংক, বীর্য ব্যাংক, কর্নিয়া ব্যাংক, মানবাঙ্গ ব্যাংক ইত্যাদি।

৩. অসহায় অনেক শিশু রয়েছে যাদেরকে নানা কারণে গর্ভধারিণী মায়ের দুধ পান করানো সম্ভব হয় না। উপরন্তু বিশ্বে অনেক শিশু নানা ধরনের দৈহিক দুর্বলতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অকালজাত শিশু (Premature babies) এদের অন্যতম। তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজন হয়। অন্য দিকে কর্মজীবী নারীরাও তাদের পেশাগত কাজের কারণে শিশুদেরকে মাতৃদুগ্ধ দিতে পারেন না। এসব শিশুরা দীর্ঘ একটা সময় মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত থাকে। এসব অসহায় ও দুগ্ধ বঞ্চিত শিশুদের বিষয়টিও মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠার ধারণাটিকে ত্বরান্বিত করেছে।

ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা

ইসলামী শরীয়ার আলোকে মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা অনুমোদিত নয়। কারণ এখানে যে প্রক্রিয়ায় মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ করা হয় এবং শিশুদের পান করানো হয় তাতে ইসলামী শরীয়ার অন্যতম স্পর্শকাতর বিধান দুগ্ধ সম্পর্কিত বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। অথচ পবিত্র

কুরআন সুন্নাহে বেশ স্পষ্ট করে দুগ্ধ সম্পর্কিত বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধ মাতা, দুগ্ধ ভগিনী... । (সূরা নিসা; আয়াত ২৩)

আয়াতটিতে রক্ত সম্পর্কিত বিবাহ-নিষিদ্ধ শ্রেণীর পাশাপাশি দুগ্ধ সম্পর্কিত বিবাহ-নিষিদ্ধ শ্রেণীর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। রক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেমন বিবাহ নিষিদ্ধ হয় তেমনি দুগ্ধ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিবাহ নিষিদ্ধ হয়।

২. আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> রক্তগত সম্পর্কের কারণে যেসব বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা সৃষ্টি হয় দুগ্ধগত সম্পর্কের কারণেও সেসব বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা সৃষ্টি হয়। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৩৬৫২)

হাদীসটিতে নিঃশর্তভাবে দুগ্ধগত সম্পর্কের ভিত্তিতে বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সুতরাং মিল্কব্যাংকের মাধ্যমে দুগ্ধপানে বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হবে। প্রসিদ্ধ মাযহাব চতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তও এরকম। (তাবয়ীনুল হাকায়িক ৩/১৮৫, জাওয়াহিরুল ইকলীল ১/৩৯৯, আল-বাহরুর রায়িক ৩/৬৪৫, আশ-শরহুল কাবীর লিদ-দারদীর ২/৫০৩)

৩. ১৯৮৫ সালে ওআইসির ইসলামিক ফিকহ একাডেমিতে মিল্কব্যাংক বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিশ্বের বড় বড় ফিকহ বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে বড় বড় আলেমদের উপস্থাপতি মিল্কব্যাংক বিষয়ক প্রবন্ধ নিবন্ধ পর্যালোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, মিল্কব্যাংক ব্যবস্থা বৈধ নয়। নিম্নে সে পর্যালোচনার সারনির্যাস উল্লেখ করা হলো।

> (ক) মিল্কব্যাংক বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্ব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে তাতে তত্ত্বগত ও প্রযুক্তিগত জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে মিল্কব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ ও গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।
>
> (খ) ইসলাম দুগ্ধপানের সম্পর্ককে রক্তের সম্পর্কের মত বিবেচনা করে। মুসলিম আইন শাস্ত্রজ্ঞদের ঐকমত্যে রক্তগত সম্পর্কের কারণে যেসব বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা সৃষ্টি হয় দুগ্ধগত সম্পর্কের

কারণেও সেসব বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা সৃষ্টি হয়। আর বংশধারার সংরক্ষণ ইসলামী শরীয়ার মূল লক্ষবস্তুর অন্যতম। মিল্কব্যাংক ব্যবস্থা বংশগত সম্পর্কের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করে।

(গ) মুসলিম বিশ্বের সামাজিক অবকাঠামোই সবিশেষ ক্ষেত্রসমূহে স্বাভাবিক স্তন্যদানের মাধ্যমেই অকালজাত শিশু, লো বার্থ ওয়েট বেবি তথা জন্মকালীন স্বল্প ওজনের শিশু কিংবা মাতৃদুগ্ধ নির্ভর শিশুদের মাতৃদুগ্ধের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট সক্ষমতা রাখে। সুতরাং এক্ষেত্রে মিল্কব্যাংক ব্যবস্থার আর কোনো প্রয়োজনীয়তাই বাকি থাকে না।

অতএব উপরোক্ত বিবেচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো-

(ক) মুসলিম বিশ্বে মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ।

(খ) মিল্কব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুদেরকে দুগ্ধ দান করানো হলে বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা সৃষ্টি হবে। তাই এখান থেকে দুগ্ধপান নিষিদ্ধ।

(আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-বাসসাম, তাওযীহুল আহকাম মিন বুলূগিল মারাম ৬/১৮, ওয়াহবাহ আয-যুহাইলী, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ ৭/১০৭, মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী আদ-দুয়ালী; সংখ্যা ২, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮৩)

আরবের আরো অনেক উলামায়ে কেরাম মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে অবৈধ বলেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলো, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আলউসাইমীন, শাইখ আব্দুর রহমান আননাজ্জার, শাইখ মুহাম্মাদ হুসামুদ্দীন, শাইখ যুহাইর আসসিবায়ী, শাইখ মুহাম্মাদ আলবার, শাইখ মুহাম্মাদ আশ-শাতিরী প্রমুখ উলামায়ে কেরাম।

৪. আরবের নির্ভরযোগ্য ফতওয়া ও ইলমী গবেষণা কমিটি আল-লাজনাতুদ দায়িমাহ-এ মিল্কব্যাংক বিষয়ে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিলো। সেখানে মিল্কব্যাংক ব্যবস্থাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। নিম্নে উক্ত প্রশ্নোত্তরটি হুবহু তুলে ধরা হলো।

প্রশ্ন : ক্লিনিকে মায়েরা দুগ্ধ দোহন করে রেখে যায়। এবং সে দুধকে ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়। এরপর শিশুদেরকে সেখান থেকে দুধ পান করানো হয়। এখানে কে দুগ্ধদানকারিণী আর কে

দুগ্ধপানকারী তা জ্ঞাত থাকে না। এ পদ্ধতি ইসলামী শরীয়াসম্মত কী না?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মায়েদের দুগ্ধ দোহন করত তা সংরক্ষণ করে অন্য শিশুদেরকে পান করানো বৈধ নয়। কারণ এ ব্যবস্থার মাঝে অস্পষ্টতা রয়েছে। যাতে দুগ্ধ সম্পর্কিত বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা পদ্ধতি বিনষ্ট হয়ে যায়। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত ব্যবস্থায় দুগ্ধপানের মাধ্যমে দুগ্ধপানকারী শিশু ও দুগ্ধদানকারিণী মায়ের সাথে বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা তৈরি হয়ে যায়। কারণ রক্ত সম্পর্কের কারণে বৈবাহিক যে নিষেধাজ্ঞা তৈরি হয় দুগ্ধ সম্পর্কের কারণে ঠিক একই বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা তৈরি হয়। অন্য দিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সংশয় থেকে বেঁচে থাকলো সে তার দীন ও মান সম্মানকে রক্ষা করতে পারলো। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫২)

সুতরাং এসব কারণে দুগ্ধপায়ী শিশুদের দুধ পান করানোর জন্য মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা বৈধ নয়। একমাত্র আল্লাহর নিকটই কর্মক্ষমতা কামনা। সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লাম। (বাকার আবূ যাইদ, আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ, সালিহ আল-ফাউযান, আব্দুল্লাহ বিন গুদইয়ান, আব্দুর রাযযাক আফীফী, আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রহ.; ফাতাওয়া আল-লাজনাতিদ দায়িমাহ লিল-বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল-ইফতা ২১/৪৩-৪৪)

মিল্কব্যাংক ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্থ হবে বংশীয়ধারা

বংশধারা সংরক্ষণ ইসলামী শরীয়াতের অন্যতম একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সুতরাং এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে যেসব জিনিস বাধা হয়ে দাঁড়াবে কিংবা যেসকল জিনিসের মাধ্যমে তাতে বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে সেগুলোকে নিষিদ্ধ করাও আবশ্যক হবে। মিল্কব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে বংশ রক্ষার লক্ষ্যটি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ একে তো সেখানে সকল নারীর দুধকে মিশ্রিত করে ফেলা হয়। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক নারীর দুধ আলাদা করে রাখা হলেও তাতে দুগ্ধপানকারী শিশু ও দুগ্ধদানকারিণী নারীর মধ্যকার পরিচিতি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ফলে কে কার দুধ পান করেছে তা অজ্ঞাত থেকে যায়। ফলে এ বিষয়টি বৈবাহিক সম্পর্কের মাঝে একটি স্পর্শকাতর সংশয় ও দুর্বোধ্য জটিলতা তৈরি করবে। সুতরাং বংশ

রক্ষার মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উপলক্ষ্য তৈরি করা কিংবা বংশ রক্ষার ধারাকে বিলুপ্ত করার উপায় তৈরি করা স্পষ্ট হারাম ও নিষিদ্ধ। ইসলামী শরীয়াতের একটি মূলনীতি হলো যে উপায় গ্রহণে হারামের মাঝে পতিত হওয়া নিশ্চিত হয়ে পড়ে সে উপায়কে পরিত্যাগ করা আবশ্যক এবং সে উপায় গ্রহণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ। (ওয়ালীদ সাঈদান, আল-ইফাদাতুশ শারঈয়্যাহ ফী বা'যিল মাসাইলিত তিব্বিয়্যাহ)

মিল্কব্যাংক ব্যবস্থা অনেককেই নিজের অজান্তেই হারাম কাজে লিপ্ত করে দিবে। কেউ এমন এক নারীকে বিবাহ করলো যে এ নারীর দুগ্ধ পান করেছে অথবা তার মেয়ের দুধ পান করেছে কিংবা তার মায়ের দুধ পান করেছে। এটা বড় ধরনের একটি জটিলতা যা বংশসমূহকে একাকার করে দিবে। সুতরাং হারামের ছিদ্রপথ বন্ধ করার স্বার্থে হলেও মিল্কব্যাংকের এ ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করা আবশ্যক।

মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চিকিৎসাগত, সামাজিক ও ধর্মীয় দিক থেকে নানা ধরনের সমস্যা ও অসঙ্গতি রয়েছে। এসব অসঙ্গতির দৃষ্টিকোণ থেকে মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগই বাকি থাকে না। পাশ্চাত্যের যে কোনো আহ্বানেই সাড়া দেওয়া কিংবা যে কোনো ব্যবস্থার সাথে সহমত পোষণ করা তো আমাদের জন্য আবশ্যক নয়; বরং এটা আমাদের জন্য মানহানিকর ও স্বকীয়তাকে বিসর্জন দেওয়া। আমাদের উচিত সে সতর্কবাণী থেকে শিক্ষা নেওয়া, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি নীতি অনুসরণ করবে বাহুতে বাহুতে, হাতে হাতে এবং বিঘতে বিঘতে। এমনকি তারা যদি শাণ্ডার (মরুচারী গুইসাপ প্রজাতির এক ধরনের জন্তু বিশেষ) গর্তের ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করবে। (বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন,) আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি ইহুদী নাসারা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর কারা? (সহীহ বুখারী; হাদীস ৩৪৫৬)

পৃথিবীর যেখানেই বিশেষ প্রয়োজনে মানবতার সেবার নামে কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়েছে তা সেবার আবেদনকে অটুট রেখে টিকে থাকতে পারেনি। তারা বাধ্য হয়ে এক পর্যায়ে ব্যবসায়িক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। যার জ্বলন্ত উদাহরণ ব্লাড ব্যাংক। সুতরাং মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা পেলে ধীরে ধীরে তার সেবার আবেদন হারাবে। এক সময় তা দুগ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে।

বাণিজ্যিক পলিসি গ্রহণের ফলে এর পরিধি বৃদ্ধি পাবে। পুঁজিবাদী চিন্তাধারার অন্যান্য মানুষগুলো এতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। ফলে বংশ মিশ্রণের ধারা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

ইসলামী শরীয়াতের বিধান হলো, স্ত্রী যে কোনো শিশুকেই দুগ্ধদান করবে না। এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া দুধ পান করাবে না। কাউকে দুগ্ধদানের প্রয়োজন হলে সেটা স্মরণে রাখবে। এবং তার বংশের লোকদের জানিয়ে রাখবে। যাতে দুগ্ধ সম্পর্কিত বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা রীতি ধ্বংস না হয়ে যায়। ইসলামী শরীয়তে স্তন্যদান একটি গুরুতর স্পর্শকাতর বিষয়। সুতরাং এ সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয়গুলো খুব বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। একদিকে বংশধারা একাকার হওয়া অন্যদিকে মিল্কব্যাংক পরিহার করা, এ দু'টি ক্ষতির মাঝে কোনটি গুরুতর তা নির্ণয় করা খুবই প্রয়োজন। বড় ক্ষতি গ্রহণ করে ছোট ক্ষতিকে দূরীভূত করা শরীয়াসঙ্গত নয়।

অনেক নারীই তাদের যৌবন ও ফিগার অটুট রাখার জন্য শিশুদেরকে স্তন্যদান থেকে বিরত থাকেন। মিল্ক ব্যবস্থার ফলে এ ধরনের নারীদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে যাবে সন্দেহ নেই। অথচ স্তন্যদানের কারণে যৌবন বা ফিগার নষ্ট তো হয়ই না বরং এতে নানা ধরনের স্তন ব্যাধিসহ অন্যান্য সমস্যা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। এগুলো চিকিৎসা বিজ্ঞানীদেরই কথা।

আত-তাবীব : আদাবুহু ওয়া ফিকহুহু-এর গ্রন্থকার বলেন, আমেরিকায় কাজ করে এমন একটি শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পরিষদকে ১৯৮৩ সনের জানুয়ারি মাসে আমেরিকায় সফরকালে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারা আমাকে জানালো আমেরিকাতে মিল্কব্যাংক ব্যবস্থা মৃতপ্রায় অবস্থায় উপণীত হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. মিল্কব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা বিরল।

২. এটা নিতান্ত ব্যয়বহুল।

৩. স্বেচ্ছা দুগ্ধদানকারিণী মায়েদের সংখ্যা বিরল।

৪. মেয়াদ উত্তীর্ণের কারণে সংরক্ষিত দুধের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। (আত-তাবীব : আদবুহু ওয়া ফিকহুহ; পৃষ্ঠা ৩৪৫-৩৫৫)

এপরিসংখ্যান থেকে খুব সহজেই বের হয়ে এসেছে, উন্নত বিশ্বে মিল্কব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার মাত্রা কতটুকু। সুতরাং আমাদের দেশে যে এ প্রয়োজনীয়তার হার বহুলাংশে কম হবে তা বলাই বাহুল্য।

মিল্কব্যাংক বিষয়ে আরবের সমাজ বিজ্ঞানী ড. আলী ফাহমীর অভিমত

সমাজ বিজ্ঞানী ড. আলী ফাহমী বলেন,

> যদি মিল্কব্যাংক ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অসামাজিক একটি ব্যর্থ প্রজন্মের জন্ম হবে, যারা সমাজ ও পরিবেশের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারবে না। উপরন্তু নানা রকম রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত একটি প্রজন্ম সৃষ্টি হবে। কারণ যেসব মায়েরা মিল্কব্যাংকে অর্থের বিনিময়ে দুধ বিক্রি করবে তাদের গর্ভজাত শিশুরা স্বাভাবিক মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হবে। সাথে সাথে ব্লাড ব্যবসার মত অনেক নারী বুকের দুধ ব্যবসায় উৎসাহিত হয়ে উঠবে। এবং এ মাতৃদুগ্ধ ব্যবসায় এমন নিম্ন শ্রেণীর নারীরাও এগিয়ে আসবে যারা বহু রোগের ধারক বাহক। আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, কী করে এটি একটি মানবিক কাজ হতে পারে। কারণ এ ব্যবস্থা হাজারো নারীকে তাদের গর্ভজাত শিশুকে দুগ্ধদান থেকে বঞ্চিত করতে প্ররোচিত করবে। আর এতে শিশুর মানসিক জটিলতা তো থাকবেই। (আল-ইসলাম ওয়াল-মুশকিলাতুত তিব্যিয়্যাহ আল-মুআসারাহ; পৃষ্ঠা ৪৬৫, ৪৬৬)

মিল্কব্যাংক বিষয়ে মিশরের দুগ্ধ হিমায়ন ও সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ ফুয়াদ ইসমাঈলের অভিমত

অধ্যাপক মুহাম্মাদ ফুয়াদ ইসমাঈল বলেন,

> আল্লাহ মানুষকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মিল্কব্যাংক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে একজন নারীর মানবিক শ্রেষ্ঠত্ব অটুট থাকবে না; বরং এতে করে সে দুগ্ধবতী গাভী, মহিষী কিংবা ভেড়ীতে রূপান্তরিত হবে। এদের দুধ সংগ্রহ করা হবে। এরপর হিমায়ন বা শুষ্ককরণসহ নানা উপায়ে তা সংরক্ষণ করা হবে। একজন মানুষ এ ব্যবস্থাকে কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারে না। (আল-ইসলাম ওয়াল-মুশকিলাতুত তিব্যিয়্যাহ আল-মুআসারাহ; পৃষ্ঠা ৪৬৫, ৪৬৬)

শরয়ী জরুরত (প্রয়োজন) এবং মিল্কব্যাংক ব্যবস্থা

অনেকেই বলেন, মিল্কব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শরীয়াগত জটিলতা থাকলেও তা জরুরত ও প্রয়োজনের কারণে বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

আমাদের কথা হলো, কখনো কখনো কিছু কারণে শরয়ী নিষেধাজ্ঞায় সাময়িক শিথিলতা চলে আসে। এগুলো মূলত শরয়ী নিষেধাজ্ঞা শিথিল হওয়ার মৌলিক ও স্থায়ী কোনো কার্যকারণ নয়; সাময়িক ও অস্থায়ী প্রাসঙ্গিক কার্যকারণ। তন্মধ্য হতে অন্যতম হলো হাজত এবং জরুরত। বাংলা ভাষায় শব্দ দু'টির মাঝে তেমন ব্যবধান লক্ষ করা যায় না। দু'টির অর্থই প্রয়োজন, আবশ্যক ও দরকার করা হয়। কিন্তু আরবী ভাষায় শব্দদু'টির মাঝে বড় ধরনের ব্যবধান রয়েছে।

জরুরত বা জরুরী শব্দটি মূলত এসেছে আরবী যরর (ضرر) শব্দ থেকে। যরর (ضرر) অর্থ ক্ষতি, অনিষ্ট। সুতরাং জরুরত ও জরুরী শব্দের পারিভাষিক অর্থের মাঝেও আভিধানিক অর্থটি সমহিমায় বিদ্যমান। আর ফিকহের পরিভাষায় জরুরত বলা হয়, কোনো ব্যক্তির এমন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যে পরিস্থিতিতে সে নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ না করলে নির্ঘাত মৃত্যু মুখে পতিত হবে কিংবা মৃত্যুর খুব কাছে চলে যাবে। এমন ক্ষতিকর পরিস্থিতিতে উপণিত হলে ইসলামী শরীয়াত তাকে ওই নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণের অনুমতি দিবে।

পক্ষান্তরে ফিকহের পরিভাষায় হাজত হলো, কোনো ব্যক্তির এমন পরিস্থিতিতে উপণিত হওয়া যে পরিস্থিতিতে সে নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ না করলে মৃত্যু মুখে পতিত হবে না। তবে কষ্টের সম্মুখীন হবে। ইসলামী শরীয়াত হাজতের ক্ষেত্রে হারাম বস্তু গ্রহণের অনুমতি দিবে না। সারকথা, জীবন কিংবা দেহের কোনো অঙ্গহানি হবার সম্ভাব্যতা নয়; বাস্তবিক আশঙ্কা সৃষ্টি হলে হারাম ও নিষিদ্ধ উপায় গ্রহণ করে সে আশঙ্কা থেকে উত্তোরণের পথ গ্রহণ করার সুযোগ ইসলামী শরীয়াতে আছে। তবে এর জন্য চারটি শর্ত প্রযোজ্য।

১. জীবন বা অঙ্গের উপর সুনিশ্চিত আশঙ্কা সৃষ্টি হতে হবে।

২. ক্ষতির আশঙ্কাটা উপস্থিত ও বাস্তবিক হতে হবে; সম্ভাব্য নয়।

৩. ক্ষতি দূর করার বৈধ কোনো পন্থা না থাকতে হবে।

৪. এ ক্ষতি দূর করতে গিয়ে অন্য কোনো ক্ষতি সৃষ্টি না করতে হবে। (আল্লামা তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা; পৃষ্ঠা ২৬৮-২৬৯)

যারা মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে বৈধ বলেন, তারা তাদের বক্তব্যের সপক্ষে জরুরতের প্রমাণটাকে বেশ জোরালোভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে থাকেন। জরুরতের এ প্রমাণ গ্রহণের দ্বারা বেশ পরিস্কারভাবে প্রতীয়মান হয়, তারা পরোক্ষভাবে হলেও বিশ্বাস করেন, মিল্কব্যাংক ব্যবস্থার মাঝে শরীয়াগত দিক থেকে আপত্তি ও অসঙ্গতি রয়েছে। জরুরত বা সবিশেষ সমস্যার কারণে সে

আপত্তি ও অসঙ্গতিগুলো দূরীভূত হবে। কারণ জরুরতের কারণে বৈধ জিনিস তো বৈধ হয় না; বরং জরুরতের কারণে একমাত্র অবৈধ ও হারাম জিনিসই অনুমোদিত ও বৈধ হয়। বৈধ জিনিসের ক্ষেত্রে জরুরত বা হাজতের অবতারণা করা বড়ই অপ্রাসঙ্গিক।

এখন দেখার বিষয় হলো, মিল্কব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জরুরতের প্রয়োগটা কতটুকু যথার্থ। একমাত্র মাতৃদুগ্ধের অভাবে শিশু মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে বিশ্বে এমন ঘটনার হার কত পার্সেন্ট? বাস্তবতা হলো সে হারটা গোণায় আসার মত নয়। নিতান্তই বিচ্ছিন্ন এমন ঘটনার জন্য ঘটা করে দুগ্ধ সম্পর্কিত বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা রীতিকে উঠিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও অনুমতি কোথাও নেই। এমন এক দু'টি সমস্যাকে সামাজিকভাবেই সমাধান করা সম্ভব। কারণ একটি পরিবারের আত্মীয়তার চেইন একেবারে ছোট নয়। সে চেইনে কি এক দুজন স্তন্যদানকারিণী মা পাওয়া যাবে না যারা মাতৃদুগ্ধের অভাবে মৃত্যু মুখে পতিত শিশুটিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে? অসহায় পথ শিশু কিংবা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের ক্ষেত্রেও সামাজিকভাবে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব। এ জাতীয় শিশুদের সংখ্যা এতটাই নগণ্য যে সামাজিকভাবে তা সমাধান করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। মুসলিম সমাজে তো বিষয়টি আরো সহজ। জরুরতের কারণে কোনো হারাম পন্থাকে হালালে রূপান্তরিত করতে হলে চারটি ধাপ পেরিয়ে আসতে হবে। মিল্কব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারটি শর্ত পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। সুতরাং জরুরতকে কেন্দ্র করে ঢালাওভাবে মিল্কব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা শরীয়াগত দিক থেকে বিধিসম্মত নয়। এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করা যাক।

আমেরিকান গোপন রোগ বিশেষজ্ঞ ড. মাহের হাতহুত বলেন,

> মাতৃদুগ্ধেরে অভাবে শিশু স্বাস্থ্যের সমস্যার পরিমাণ খুবই অল্প। যদিও সেটা প্রথমে অনেক বেশি মনে হয়। সে সমস্যা উৎপাদিত কৌটা বা প্যাকেট দুধের মাধ্যমেই সমাধা করা সম্ভব। স্বল্প ওজনের ওই সব শিশুই মাতৃদুগ্ধের মুখাপেক্ষী যারা উৎপাদিত দুধে সবিশেষ সংবেদনশীল কিংবা তা হজম করতে পারে না। মেয়াদপূর্ব ভূমিষ্ঠ নবজাতক শিশুদের বার্ষিক জন্ম হার শতকরা ৭%। সে ৭% এর মধ্য হতে ১% এরও কম সংখ্যক শিশুর মাতৃদুগ্ধের প্রয়োজন হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মিল্কব্যাংকগুলোর সাথে যোগাযোগ করেছি। তাতে দেখা গেছে, আমেরিকাতে সে হার এক তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে। এরপর মিল্কব্যাংক ব্যবহার

> করে এমন শিশুদের সংখ্যা জানতে লস এঞ্জেলসের শিশু ক্লিনিকগুলোতে যোগাযোগ করি। তাতে দেখা যায়, এ জাতীয় শিশুদের সংখ্যা শূন্যের কোঠায়। সুতরাং মাতৃদুগ্ধ জনিত দুর্বলতায় আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা খুবই স্বল্প। (কিতাবু মাজাল্লাতিল মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী ২/২৬৩, সিলসিলাতু মাতবূআতি মুনাজ্জামাতিত তিব্বিল ইসলামী; পৃষ্ঠা ৩৫-৩৬)

সুতরাং তাদের উপরোক্ত শর্ত মতে প্রচলিত মিল্কব্যাংকগুলো বৈধতার পর্যায়ে পড়ে না। কারণ এসব ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তগুলো প্রযোজ্য হয় না।

মাতৃদুগ্ধ বিক্রয় ও ইসলামী শরীয়ত

ব্লাড ব্যাংকের সূচনা একান্ত মানবিক সেবার শিরোনামে হয়েছিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে তা বিজনেসে রূপান্তরিত হয়। বহির্বিশ্বে মিল্কব্যাংকগুলোও মানবিক সেবার শিরোনামে আবির্ভূত হয়ে এখন মাতৃদুগ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এখানে নিয়মিত দুগ্ধ ক্রয় বিক্রয় হয়। বাংলাদেশে মিল্কব্যাংক ব্যবস্থা শুরু হলে কথিত সেবা বাণিজ্যে রূপান্তরিত হতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন পড়বে না। এখানে নিয়মিত মাতৃদুগ্ধ ক্রয় বিক্রয় হবে। এক্ষেত্রে নীতি নৈতিকতা ও ধর্মীয় বিধি নিষেধের কোনো পরওয়া করা হবে না-এ কথা বলা যায়। যেমনটি ব্লাড ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অথচ ইসলামী শরীয়াতে মাতৃদুগ্ধের ক্রয় বিক্রয় বৈধ নয়। কারণ দুগ্ধ মানুষের দেহের একটি উপাদান। মানুষের দেহের কোনো অংশ বা উপাদানের ক্রয় বিক্রয় বৈধ নয়। অনেকেই মাতৃদুগ্ধ বিক্রি বৈধতার পক্ষে যুক্তি দেখান, ইসলামী শরীয়াতে দুগ্ধদাত্রী নারীর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ। সুতরাং স্তন্যদানকারিণী নারীর জন্য দুধ বিক্রি করে তার বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে। কিন্তু এ যুক্তিটি নিতান্তই ভঙ্গুর। কারণ ক্রয় বিক্রয় আর ইজারা (শ্রমদান) স্বতন্ত্র দু'টি বিষয়। দুধ পান করানো একটি শ্রম। এ শ্রমের বিনিময় স্তন্যদানকারিণী গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু দুধের বিনিময় সে গ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং স্তন্যদানের বিনিময় গ্রহণ মানে দুগ্ধ বিক্রি নয়; বরং দুগ্ধপানের শ্রম বিক্রি। শ্রম বিক্রি তথা নিজেকে ইজারা দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ ইসলামী শরীয়াতে বৈধ। কিন্তু মানুষের দেহের কোনো অংশ বিক্রি করা বৈধ নয়। সুতরাং মিল্কব্যাংক প্রথা চালু করে মাতৃদুগ্ধ বিক্রির মত হারাম পথ উন্মুক্ত করা আদৌ বৈধ হতে পারে না।

যদি কোনো শিশুর পক্ষে মায়ের দুধপান সম্ভব না হয় তাহলে স্বেচ্ছা স্তন্যদানকারিণী নারীদের সংখ্যা অনেক রয়েছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পারস্পরিক সৌহার্দ সম্প্রীতি ও পারস্পরিক নিবিড় বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

একটি পরিবারে চাচী, ফুফু ও খালাসহ অনেক স্তন্যদানকারিণী আত্নীয়াদের উপস্থিতি বিদ্যমান থাকে। এদের কেউ যদি স্তন্যদানে অক্ষম হয়ে পড়ে তবে অনেক আত্নীয় স্বজন, প্রতিবেশী বা বন্ধবী থাকে যারা স্তন্যদানের কাজটি স্বাচ্ছন্দে আঞ্জাম দিতে আগ্রহী হবে। যদি কালে ভদ্রে স্বেচ্ছা স্তন্যদানকারিণী কাউকে না পাওয়া যায় তবে সে ক্ষেত্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্তন্যদানকারিণীদের ব্যবস্থা তো আছেই। সুতরাং বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে মিল্কব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। মাতৃদুগ্ধের পারিবারিক ও সামাজিক এত সহজ ব্যবস্থাপনা থাকতে মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠার মত বংশধারা বিনষ্টকারী ও মাতৃদুগ্ধ ক্রয়-বিক্রয়ের পথ উন্মুক্ত করা উত্তম পদ্ধতির পরিবর্তে অনুত্তম ও আপত্তিকর পদ্ধতি গ্রহণ করার নামান্তর।

ভারতের বিশিষ্ট ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ মুফতী খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী মিল্কব্যাংকের ব্যাপারে বলেন,

ইসলাম নীতিগতভাবে নারীকে অন্যের শিশু সন্তানকে স্তন্যদানের অনুমতি প্রদান করে। হাদীসের গ্রন্থগুলোতে এর ভূরি ভূরি নজির রয়েছে। দুগ্ধ সম্পর্কিত বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞার যাবতীয় বিধান এ নীতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রচলিত এ ধরনের মিল্কব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দু'টি সমস্যা সামনে চলে আসে। প্রথম মাতৃদুগ্ধ ক্রয়, দ্বিতীয় হলো মাতৃদুগ্ধ বিক্রয়। ফিকহ বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দুগ্ধদানকারিণী দুগ্ধদানের পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারে। বিষয়টি পবিত্র কুরআনেও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। তবে বিক্রয় এবং ইজারার মধ্যে পার্থক্য আছে। হানাফী মাযহাবে দুধ মানুষের অংশ হওয়ার কারণে তার বিক্রি বৈধ নয়। (জাদীদ ফিকহী মাসাইল ১/৩৭৯-৩৮০)

হিউম্যান মিল্কব্যাংক : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে গত ১ ডিসেম্বর '১৯ প্রথমবারের মত যাত্রা শুরু করে হিউম্যান মিল্কব্যাংক। তবে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শুরু হয়নি। মিল্কব্যাংক ব্যবস্থাপনাটি মূলত ঢাকা জেলার মাতুয়াইলের শিশু-মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের (আইসিএমএইচ) নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্র (স্ক্যানো) এবং নবজাতক আইসিইউ (এনআইসিইউ) এর নিজস্ব উদ্যোগ। ২০১৬ সালের একটি প্রকল্পের আওতায় বিপন্ন শিশুদের জীবন বাঁচাতে মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

মিল্কব্যাংকের জনবলকে প্রশিক্ষণ দেওয়াসহ অন্যান্য কার্যক্রমও সম্পন্ন করা হয়েছে। আইসিএমএইচের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম এ মান্নান বলেন,

মায়ের বুকের দুধ সংগ্রহ এবং অন্য নবজাতকদের খাওয়ানোর ক্ষেত্রে যাতে ইসলামী শরীয়াহর কোনো লঙ্ঘন না হয় সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। মুসলিম দেশের মধ্যে কুয়েতে প্রথম হিউম্যান মিল্কব্যাংক স্থপন করা হয়। এ ছাড়া ইরান, ইরাক, আরব অমিরাত, মালেয়েশিয়া ও পাকিস্তানসহ অনেক মুসলিম দেশ হিউম্যান মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। ওই দেশগুলো কিভাবে ব্যাংক পরিচালনা করছে তার বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্ম মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের মতামত নেওয়া হচ্ছে। ব্যক্তি উদ্যোগ এবং বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় মিল্কব্যাংকটি স্থাপনে এখন পর্যন্ত এক কোটি টাকার বেশি খরচ হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। (সূত্র, প্রথম আলো ১৯.১২.১৯ ও অন্যান্য)

মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি ও পর্যালোচনা

ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বংশ সম্পর্কের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা। মিল্কব্যাংক ব্যবস্থা এ ধারাকে চরমভাবে বাধাগ্রস্থ করবে। সমাজে অপরিচিত অনেক ভাই বোনের জন্ম হবে। এক সময় এদের সংখ্যা নিরূপণ করা আদৌ সম্ভব হবে না। অজ্ঞাতসারে দুধ ভাই বোনের মধ্যে বিবাহের নামে যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠার সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে তার দায় কে নিবে? কর্তৃপক্ষ যে বিষয়গুলো পরিপালনের কথা বলেছেন, তা বেশ জটিল ও দীর্ঘ মেয়াদী। এসব তদারকি করা অত্যন্ত দুরূহ ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রথম দিকে এ প্রক্রিয়া পালন করা সম্ভব হলেও অবকাঠামো বেড়ে গেলে তা হযবরল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইসলামী মূল্যবোধ ও শরীয়া অনুশাসনে হিউম্যান মিল্কব্যাংক একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। অনেক নারী আপন স্বাস্থ্য ও দৈহিক গঠন অটুট রাখার ঠুনকো অযুহাতে নিজ সন্তানকে দুধ পান না করিয়ে মিল্কব্যাংকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমনটি বহির্বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা বালাদেশে হিউম্যান মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠার পক্ষের বক্তব্যগুলোকে কয়েকটি পয়েন্টে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবে।

(ক) 'মিল্কব্যাংক ব্যবস্থাপনায় দুগ্ধ সম্পর্কিত বৈবাহিক জটিলতার যে আশঙ্কা করা হচ্ছে সে আশঙ্কা এখানে নেই। বাংলাদেশের ধর্মীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা করেই তারা এটা স্থাপন করেছেন। সম্পূর্ণভাবে ইসলামি বিধিবিধান মেনেই এই 'মিল্কব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।'

পর্যালোচনা

ধর্মীয় বিষয়টিকে মাথায় রেখে তারা যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তাতে সহজেই ধর্মীয় জটিলতা সমাধান হয়ে যাবে না। কারণ দুগ্ধ সম্পর্কটা শুধু দুগ্ধপানকারী শিশু আর দুগ্ধদানকারিণী মায়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এ সম্পর্ক আরো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দুগ্ধ সম্পর্কিত আলোচনাগুলোও বেশ জটিলতার দাবি রাখে। মাতৃদুগ্ধ সংশ্লিষ্ট সেসব বিষয়গুলো সাধারণের সহজে বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। যেমন একজন নারী একটি মেয়ে শিশুকে দুগ্ধপান করালো। অন্যদিকে স্তন্যদানকারিণী এ নারীর একজন শিশু দেবর রয়েছে। উভয়ে বড় হলো। ঘটনাক্রমে উভয়ের মাঝে বিবাহ বন্ধনের আয়োজন হলো। তো স্বামীর এ ভাই তো ওই শিশুর আইডি কার্ড সংরক্ষণ করেনি। ওই শিশু বা শিশুর পরিবারও জানে না যে তার ও এ শিশুর মাঝে দুগ্ধ সম্পর্ক তৈরি হয়ে আছে। কারণ তারা পরস্পরে দুগ্ধ সম্পর্কিত চাচা ভাতিজি। এখন যে বিবাহটা হবে সেটা তো স্পষ্ট হারাম হবে। অর্থাৎ বিবাহই সম্পন্ন হবে না। এদের মাঝে যে দৈহিক সম্পর্ক হবে তা ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হবে। যে সন্তান হবে তাও হবে অবৈধ ও জারজ সন্তান। এ সন্তানগুলো এ বাবার ত্যাজ্য সম্পত্তি পাবে না। যদি গ্রহণ করে তবে তা তাদের জন্য বিধিত হবে না।

(খ) 'এখানে যে মা দুধ দেবেন তার প্রয়োজনীয় ডাটা সংরক্ষণ করা হবে। তাকে আইডি কার্ড দেওয়া হবে। সংরক্ষিত দুধ যে শিশুকে দেওয়া হবে তার পরিচিতি সংরক্ষণ করা হবে। তাকেও কার্ড দেওয়া হবে। রেফারেন্স নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, খাতা ও ভলিউম, এন্ট্রি পৃষ্ঠার নম্বর, সবই তাদের দেওয়া হবে। একজন মায়ের দুধের সঙ্গে আরেকজন মায়ের দুধ মিশে যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।'

পর্যালোচনা

বেশ চমৎকার সতর্ক ব্যবস্থা। বাহ্যত এ ভাবনা লালনের জন্য কর্তৃপক্ষ সাধুবাদ পাবার যোগ্য। কিন্তু কথা হলো, তারা কাকে কাকে দিবেন এ আইডি কার্ড? তাদের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় তারা শুধু দুগ্ধদানকারিণী এবং দুগ্ধপানকারী এ দু'পক্ষের মাঝে কার্ড সরবরাহ করবেন। কিন্তু একজন নারীর দুধ তো একাধিক শিশু পান করতে পারে। তারা তো পরস্পরে ভাই বোনে পরিণত হবে। দুগ্ধপানকারী এসব শিশুদের পরস্পরের মাঝে কি তারা কার্ড সরবরাহ করবেন? সরবরাহ করলে কয়জন শিশু পরিবার বা স্তন্যদানকারিনী সে কার্ডকে সংরক্ষণ করবে। এবং যথা নিয়মে বিবাহের সময় সে কার্ড চেক করে করে

বিবাহ কার্য সম্পন্ন করবেন? পুরো প্রক্রিয়াটিকে কার্ডময় বা কার্ডসর্বস্ব করাটা কি আদৌ সম্ভব হবে? সম্ভব হলে কয়দিন তা চালু রাখা যাবে? কর্তৃপক্ষ কতোটা ধর্মীয় অনুশাসন প্রিয় বা ধার্মিক যে তারা প্রতিটি পর্বে কার্ড প্রদান সম্পন্ন করবেন বা করতে পারবেন? তাদের সদিচ্ছা থাকলেও যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করবেন তারা কতোটা কার্ড কার্যক্রমে যত্নবান হবেন? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আশাব্যঞ্জক হবে না। হয়তো মৌখিকভাবে ইতিবাচক উত্তর পাওয়া যাবে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে সে উত্তরগুলো বাস্তবায়িত হবে না একথা বলাই যায়।

বস্তুত দুগ্ধ সম্পর্কিত আলোচনাগুলো বেশ জটিল ও সূক্ষ্ম প্রকৃতির। এদেশের সাধারণ মানুষের ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়াবলির জানা শোনার মাত্রা নিতান্তই কম। যার ফলে দেখা যায়, যাদের মাঝে রক্ত সম্পর্কিত কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ তাদের মাঝেও কখনো কখনো বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়। অথচ এ রক্ত সম্পর্কিত বিষয়গুলো সাধারণত সবার জানা থাকার কথা। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় জানা শোনার চিত্রই যখন এতোটা দুঃখজনক তাহলে কি করে বলা যায় যে শুধু আইডি কার্ড প্রদানের মাধ্যমেই বৈবাহিক জটিলতা ও নিষিদ্ধতা দূর হয়ে যাবে!

মিল্কব্যাংকের প্রধানতম একটি সদিচ্ছা হলো, স্বজন পরিত্যাক্ত ছিন্নমূল নবজাতকদের দুগ্ধদান করা। এক্ষেত্রে তাদের দেওয়া কার্ড কে রক্ষা করবে? তাদেরকে রক্ষা করার মত মানুষ পাওয়াই তো দুষ্কর। এখানে কার্ড সংরক্ষণটা বড় কথা; কার্ড দেওয়াটাই বড় কথা নয়।

মিল্কব্যাংক কর্তৃপক্ষ থেকে জানা গেছে, এ দুধ আঠারো মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। মা তো দুধ দিয়ে তার পরিচিতি রেখে চলে যাবে। এখন তার দুধ কয়জন শিশু পান করবে সে সম্পর্কে তার কোনো কিছুই জানা থাকবে না। ব্যাপারটি কি এরকম হবে যে যখনই তার দুধ কোনো শিশুকে পান করানো হবে তখন তাকে কল করে শিশুর আইডি কার্ড নিয়ে যেতে বলা হবে বা তাকে পৌঁছে দেওয়া হবে? প্রলম্বিত এ প্রক্রিয়াগুলো কি তারা সম্পন্ন করবেন? ভাষাগত উত্তর প্রদান সহজ হলেও কার্যগত উত্তর প্রদান বড় জটিল।

(গ) 'একজন মেয়ে শিশুর মা মেয়ে শিশুকে এবং একজন ছেলে শিশুর মা ছেলে শিশুকেই দুধ দেবেন। যে কারণে যারা দুধ ভাই- বোনের মধ্যে বিয়ে হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে মনে করে বিরোধিতা করছেন, সে আশঙ্কা এখানে নেই। যারা বিরোধিতা করছেন, তারা যদি পুরো বিষয়টি সঠিকভাবে জানেন, তাহলে এখানে বিরোধিতা করার কিছু নেই।'

পর্যালোচনা

মিল্কব্যাংক কর্তৃপক্ষ একথাটিকে বার বার বলার চেষ্টা করছেন। প্রথমত আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হচ্ছে এগুলো মূলত শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রবণতা। সাময়িক এসব অগভীর ও যুক্তিহীন কথা বলে সাধারণ মানুষ ও সরকারকে অবুঝ বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো উপায়ে এ ব্যবস্থাটা প্রতিষ্ঠা করা গেলে কোথায় যাবে এসব নীতি কথার ফুলঝুরি তা বলা মুশকিল। এগুলো উড়ো কথা নয়; এগুলো বাস্তবতা। নীতিমালা শতভাগ স্বচ্ছ রেখে মাঠে ময়দানে তার উল্টো চিত্র দেখার অভিজ্ঞতা এদেশের মানুষের আছে। এসব উল্টো চিত্রে আমাদের দেশটা ভরে গেছে। সুতরাং মিল্কব্যাংক কর্তৃপক্ষ মাঠে নেমে যেতে পারলে যে এর কিছুই রক্ষা করার গরজবোধ করবেন না এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং মেয়ে শিশুর মা মেয়ে শিশুকে এবং ছেলে শিশুর মা ছেলে শিশুকে দুধ পান করানোর নীতি তারা রক্ষা করবেন না বা রক্ষা করতে পারবেন না-এমনটি বলা যেতে পারে। বাধাটা ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব ও কাজের পরিসর বৃদ্ধিসহ নানামাত্রিক জটিলতা হতে সৃষ্টি হতে পারে। আঠারো মাস পর্যন্ত রক্ষিত দুধকে এ প্রক্রিয়া মেইন্টন করে পান করানোটা বেশ জটিল ও দুরূহ ব্যাপার। এত দীর্ঘসূত্রতা কি তার পরিপালন করবেন? উত্তরটা তারাই দিক।

দ্বিতীয়ত তারা বলেছেন, এ পদ্ধতি রক্ষায় বৈবাহিক জটিলতার সমাধান হয়ে যাবে। দুগ্ধ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম আলোচনা বিষয়ে অধ্যয়ন থাকলে হয়তো তারা এতোটা হালকা কথা বলতেন না। অথচ দুগ্ধ সম্পর্কটা রক্ত সম্পর্কের মতোই। এখানে সম্পর্কটা শুধু দুগ্ধপানকারী শিশুদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এটা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এখানে যে ছেলে শিশুর মা ছেলে শিশুকে দুধ পান করালো এ মায়ের কি কন্যা সন্তান থাকতে পারে না কিংবা ভবিষ্যতে তার কন্য সন্তান জন্ম গ্রহণ করতে পারে না? এ মায়ের স্বামীর কি বোন নেই? এ মায়ের কি নিজের কোনো বোন নেই? এ জাতীয় উপর নীচের অনেকেই আছেন। এদের সবার সাথেই তো দুগ্ধপানকারী ওই শিশুর বিবাহ নিষিদ্ধ? সমাধান কোথায় হলো? সমস্যা তো রয়েই গেলো। বিষয়টিকে এতোটা সহজ করে দেখলে তো হবে না।

সবিশেষ উল্লেখ্য, উপরোক্ত যুক্তিটি সরকার পক্ষের বড় মাপের একজন আলেম থেকেও শোনা গেছে। বিষয়টি মিডিয়ায় এসেছে বলে জানা গেছে। বিষয়টি যদি বাস্তব হয় তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। পাবলিকের মুখ থেকে এ জাতীয় অগভীর যুক্তির অবতারণা তেমন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কিন্তু

সর্বমহলে পরিচিত একজন আলেমের মুখ থেকে এ জাতীয় যুক্তি নিতান্তই বেদনাদায়ক।

(ঘ) 'মুসলিম দেশের মধ্যে কুয়েতে প্রথম হিউম্যান মিল্কব্যাংক স্থপন করা হয়। এ ছাড়া ইরান, ইরাক, আরব অমিরাত, মালেয়েশিয়া ও পাকিস্তানসহ অনেক মুসলিম দেশ হিউম্যান মিল্কব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। সুতরাং আমাদের দেশে মিল্কব্যাংক করতে কোনো সমস্যা নেই।'

পর্যালোচনা

আমরা ইসলামী আইনের ভিত্তিতে মিল্কব্যাংকের ব্যাপারে কথা বলছি। কোনো দেশীয় আইনের ভিত্তিতে নয়। সুতরাং এখানে কোনো দেশের বিষয়টা খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয়। এখানে ইরানের কথা আসবে না। কারণ তারা শিয়া ধার্মিক। শিয়া আর মুসলিমের মাঝে বড় সড় ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্রে প্রচলিত কোনো বিষয় দিয়ে ইসলামী আইনকে পরিমাপ করা যায় না। অতএব ওই সব মুসলিম দেশে মিল্কব্যাংক থাকলেও সে দেশের উলামায়ে কেরাম এ ব্যবস্থাকে বৈধ বলেন কি না সেটা হলো দেখার বিষয়। রাষ্ট্রপ্রধানরা কোনটা অনুমোদন করলেন কোনটা অনুমোদন করলেন না সেটা এক্ষেত্রে ধর্তব্য বিষয় বলে পরিগণিত হবে না। কারণ তারা যাচ্ছে তাই করতে পারেন এবং করেনও বটে। উপরোক্ত মুসলিম রাষ্ট্রে যদি বাস্তবে মিল্কব্যাংক ব্যবস্থা কার্যকর হয়েও থাকে তবু সেটা গ্রহণীয় নয়। কারণ এ ব্যবস্থার পক্ষে মুসলিম দেশগুলোর বিশিষ্ট ফিকহ বিশেষজ্ঞ ও মুফতীদের অনুমোদন নেই। ওআইসির ফিকহ একাডেমিতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বড় বড় ফকীহ মুফতীগণ রয়েছেন। তারা মিল্কব্যাংক ব্যবস্থাকে শরীয়ত পরিপন্থী বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কুয়েতে এ নিয়ে সম্মিলিত গবেষণা হয়েছে। সেখানে উলামায়ে কেরাম ও বিজ্ঞজনেরা মিল্কব্যাংকের বিপক্ষে অভিমত দিয়েছেন।

> ২০১১ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর মালয়েশিয়ার জাতীয় ফতওয়া কমিটির ৯৭তম বৈঠকে মিল্কব্যাংক বিষয়ে অবিধানিক ফতওয়া এসেছে। বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম ইলমী ব্যক্তিত্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট ফকীহ জাস্টিস মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহকে বাংলাদেশে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এক অডিও বার্তায় বলেছেন যে, তা কোনোভাবেই জায়েয নয়। এ ব্যাংক চালু হলে নানান ফেতনা সৃষ্টি হবে। (আলকাউসার; ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা ৮)

(ঙ) 'দুগ্ধপানকারী শিশু ও দুগ্ধদানকারিণী নারীদের পরিচয় ও ডাটা সংরক্ষণে সফটওয়্যার ও আর্কাইভ সিস্টেম চালুর মাধ্যমে পারস্পরিক ডাটা সংরক্ষণের জটিলতা খুব সহজেই কাটিয়ে উঠা সম্ভব।'

পর্যালোচনা

আমাদের কথা হলো, এটা বাংলাদেশ। অভিমত দিতে হলে সমগ্র বাংলাদেশকে সামনে রেখে দিতে হবে। এখানকার স্বাক্ষরতা হার সম্বন্ধে সকলেই অবগত। সফটওয়্যার পদ্ধতির মাধ্যমে কত পার্সেন্ট পরিবার পারস্পরিক পরিচিতির বিষয়টাকে সংরক্ষণ করতে পারবে কিংবা এ পদ্ধতির মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে সেটা নির্ণয় করা প্রয়োজন। সবাই কি এ সফওটয়্যার গ্রহণ করবে? গ্রহণ করলেও কি সকলে এ সফটওয়্যারকে বিবাহের সময় কাজে লাগাবে? তারা ধর্মীয় অনুশাসন পালনে কতোটা যত্নবান যে তারা এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিবাহের পথে আগাবে? এটা সাধারণ কথা, এদেশের সাধারণ মানুষের ধর্মীয় রীতি পালনের মান এতোটা উন্নত নয় যে তারা পরিচিতি কার্ড কিংবা সফটওয়ার বা আর্কাইভ ব্যবস্থাকে ফলো করে ছেলে সন্তানের বিবাহের পথে অগ্রসর হবে। মিল্কব্যাংকের মাধ্যমে এ যে তারা হারাম ও অবৈধ সম্পর্কের পথে অগ্রসর হবে এর দায় কি কর্তৃপক্ষ নিবে না? তারা হারামের উন্মুক্ত পথ তৈরি করে দিয়ে নিজেদেরকে দায়মুক্ত ভাববে এর তো কোনো সুযোগ নেই। উপরন্তু তাদের মূল এজেন্ডাই হলো স্বজন পরিত্যাক্ত, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া, ছিন্নমূল অভিভাবকহীন পথশিশুকে দুগ্ধদান করা। তো এসব শিশুদের ক্ষেত্রে সফটওয়্যার ব্যবস্থা কী কাজে আসবে? কে সংরক্ষণ করবে এ সফটওয়্যার? কে দেখবে এ ডাটা সংরক্ষণের উন্নত ব্যবস্থা? তো এসব ডাটাবেস কতোটা আস্থার কাজ দিবে তা নিয়ে আমাদের ভাবার প্রয়োজন আছে।

(চ) 'আরবে তো স্তন্যদানের প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিলো। বর্তমান মিল্কব্যাংক তো আরবের সে প্রথারই উন্নত সংস্করণ। সুতরাং সেটা বৈধ হলে এটা বৈধ হবে না কেন?'

পর্যালোচনা

মিল্কব্যাংক বৈধতায় আরবের স্তন্যদান প্রথাকে টেনে আনার কোনো প্রয়োজন নেই। স্তন্যদান তো বৈধ। এর জন্য আরব্য রীতিকে টেনে আনতে হবে কেন? স্বয়ং কুরআনেই এর বৈধতা বিদ্যমান। মিল্কব্যাংক ব্যবস্থায় পারস্পরিক পরিচয় সঙ্কটের যে প্রবল আশঙ্কা রয়েছে তা আরব্য রীতিতে ছিলো না। কারণ সে

রীতিতে দুগ্ধ সম্পর্কের কারণে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যেতো। পরস্পরের মাঝে যাতায়াতও হতো। ফলে পরিচয় সঙ্কটের কোনো সুযোগ ছিলো না। আরব্য রীতিকে টেনে এনে প্রচলিত মিল্কব্যাংক ব্যবস্থাকে বৈধতা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ দুই ব্যবস্থার মাঝে আকাশ পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান।

(ছ) 'দেশে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে বছরে হাজার হাজার মায়ের মৃত্যু হয়। এসব মায়েদের সন্তান ও কুড়িয়ে পাওয়া পথ শিশুদের জীবন বাঁচাতে মাতৃদুগ্ধের ভাণ্ডার গড়ে তোলা তো একটি মানবিকতার কাজ। কোনো কোনো দেশে মিল্কব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে হাজার হাজার শিশু প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। এত বড় একটি মানবিক কাজকে ইসলাম কিভাবে নেতিবাচক হিসেবে দেখতে পারে?'

পর্যালোচনা

ইসলাম কোনো ধরনের মানবিকতাকেই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে না। ইসলামিক বিধি বিধানের চেয়ে বড় কোনো মানবিকতা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তৈরি হয়নি। এর চেয়ে বড় কোনো মানবিকতা কেউ দেখাতেও পারবে না। সত্যিকার মানবিকতা ইসলামী বিধি বিধানের মাঝেই বিদ্যমান। ইসলামী শরীয়াতে দুগ্ধদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি মাতৃদুগ্ধের অভাবে যদি কোনো শিশু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে নিকটবর্তী দুগ্ধবতী নারীর উপর আবশ্যক হয়ে যায় উক্ত শিশুকে দুগ্ধদান করা। আর এ যে পরিসংখ্যান টানা হয়েছে যে, একমাত্র মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমেই হাজার হাজার শিশুকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে- এ পরিসংখ্যান সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবসম্মত নয়। মায়ের দুধ অবশ্যই অশেষ পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। পুষ্টিগুণের দিক থেকে এর কোনো বিকল্প হয় না। তাই বলে কি শিশুখাদ্য হিসেবে এর কোনো বিকল্প নেই? অবশ্যই আছে। হয়তো মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমে হাজার হাজার শিশুকে বাঁচানো গেছে। এর অর্থ এই নয় যে মাতৃদুগ্ধ না থাকলে বিকল্প শিশুখাদ্যের মাধ্যমে ওই সকল শিশুকে বাঁচানো যেতো না। সুতরাং পরিসংখ্যানের একচেটিয়া বক্তব্য বাস্তবতা পরিপন্থী। অসুস্থ শিশুদের দুগ্ধদান অবশ্যই একটি মহৎ ও মানবিক কাজ। কিন্তু এ মানবিক কাজের নীতিমালাও ইসলামী শরীয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে। মানবিক কাজ করতে হবে বৈধ ও রীতিসম্মত পন্থায়। এ ধরনের মানবিক কাজ করতে গিয়ে অবৈধ ও হারাম কোন কর্ম সৃষ্টি হয় এমন পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ ইসলামী শরীয়াতে নেই। ইসলাম ভালো কাজ করতে গিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ পথ উন্মুক্ত করাকে সমর্থন করে না।

সুতরাং ইসলামী রীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগী হোন। সকল মানবিকতা অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে।

(জ) মিল্কব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলেছেন, 'গার্মেন্টসে কর্মরত মায়েরা ও অন্যান্য চাকুরীজীবী মায়েরাও মিল্কব্যাংকে দুধ জমা করতে পারবেন।'

পর্যালোচনা

মিল্কব্যাংক কর্তৃপক্ষ মূলত মানবিকতার বিষয়টিকে বিস্তৃত করতে গিয়ে কর্মরত নারীদের প্রসঙ্গ এনেছেন। প্রশ্ন হলো, তারা কেন দুধ জমা রাখবে? সন্তানকে খাওয়ানোর জন্য? সন্তানকে দুধ পান করানোর সময়ই তো তাদের নেই। তারা কখন আবার মিল্কব্যাংকে যাবে দুধ সংরক্ষণ করতে? শিশুকে খাওয়াতে হলে মিল্কব্যাংকে তাদের যাতায়াতের প্রয়োজন পড়বে। এত সময় তাদের কোথায়? এ জটিল ব্যবস্থায় না গিয়ে বরং কর্মস্থলে বেবি কেয়ারের ব্যবস্থা করলেই না ভালো হতো। দেশের প্রথিতযশা একজন মুফতী কত চমৎকারই না বলেছেন, 'আমরা আগে সমস্যা তৈরি করে পরে উল্টো পথে তার সমাধান তৈরি করি।' আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা এরকম হলো কেন যে এখানে মায়েরা চাকুরীজীবী হওয়ার কারণে তাদের সন্তানকে দুগ্ধদান করতে পারে না। কোনোভাবে কি চাকুরীজীবী মায়েদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা যায় না যেখানে তারা মাতৃত্বকালীন শিশুকে স্তন্যদানের পূর্ণ সুযোগ পাবে? মিল্কব্যাংক কর্তৃপক্ষের এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে তার সমাধান করা উচিত। মাঝে হাত দিলে তো মৌলিক সমাধান হবে না। মূল সমাধানের জন্য গোড়ায় হাত দিতে হবে। স্বজন পরিত্যাক্ত শিশু কেন তৈরি হচ্ছে? মায়েরা কেন স্তন্যদানে অনাগ্রহী হয়ে উঠছে? এসব মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধান করা প্রয়োজন।

শেষকথা

একজন আরব গবেষক মিল্কব্যাংক বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, মিল্কব্যাংক ব্যবস্থাপনা এমন একটি নব উদ্যোগ যা কুমারী নারীকে দুগ্ধবতী গাভীতে রূপান্তরিত করে দিবে! আরেকজন গবেষক একটু রসিকতার ছলে লিখেছেন, যেসব নারী মিল্কব্যাংকে দুগ্ধ দান করে তাদের পরিচয়পত্রে লেখা উচিত, 'পেশা : গাভী!' গবেষকদ্বয়ের বক্তব্যকে বাহ্য দৃষ্টিতে একটু কৌতুককর মনে হলেও তার বাস্তবতা আছে। কারণ মানুষ সৃষ্টির সেরা। মিল্কব্যাংক ব্যবস্থায় বংশীয় ধারা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বও চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়। একজন মানুষ নেমে আসে প্রাণীর কাতারে। মানুষের যাবতীয় আচরণ পাশবিকতা মুক্ত হওয়া চাই। আমরা অনেক দিক থেকেই

পাশবিকতাকে বরণ করে নিচ্ছি। মিল্কব্যাংকের ক্ষেত্রে পাশবিকতাকে একটু বেশি বরণ করে নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। কারণ একটি দুগ্ধবতী গাভীর দুধকে যে প্রক্রিয়ায় দোহন করে তা বাজারজাত করা হয় তদ্রূপ একজন নারীর দুধকেও বিশেষ প্রক্রিয়ায় দোহন করে বাজারজাত করার মত করে ব্যবহার করা হয়। এ ধারা চলমান হলে একসময় প্যাকেটজাত মাতৃদুগ্ধও মার্কেটে চলে আসবে। যেমনটি কোনো কোনো রাষ্ট্রে চলে এসেছে। এগুলো একজন মানুষের মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে যায় না। আল্লাহ আমাদের সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছ নীতি ও বিধান মেনে চলার তাওফীক দান করুন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত অধ্যয়ন

সঠিক ও স্বচ্ছ উৎসের প্রয়োজনীয়তা

মাওলানা ইরফান জিয়া*

আমাদের জীবন যাপনের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন। কুরআনে কারীমের ভাষ্যও এটাই। নবীজীর জীবন থেকে আলো গ্রহণ করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দ্বারস্থ হতে হয় সীরাত গ্রন্থের। সীরাত পাঠই হলো নবীজীর জীবন ও আদর্শ জানার সহজ ও সুন্দর একটি মাধ্যম।

ইসলামের শুরু সময় থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য সীরাত গ্রন্থ লেখা হয়েছে। হাদীস সংকলনের পাশাপাশি স্বতন্ত্র সীরাত গ্রন্থ লেখার ধারাও শুরু হয়ে গিয়েছিলো হিজরী প্রথম শতকের ভেতরেই। হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (৯২ হি.), হযরত আবান ইবনে উসমান (১০৫ হি.), হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (১১০ হি.) প্রমুখ মনীষী ছিলেন একেবারে প্রথম দিককার সীরাতগ্রন্থ প্রণেতা।

পরবর্তীতে ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের মতো সীরাত প্রণেতারা এসে এ ধারাটিকে আরো মজবুত করে তোলেন। এরপর হাজার বছরের পথ পাড়ি দিয়ে সীরাত প্রণয়নের ইতিহাসের সাথে যুক্ত হয়েছে আস-সীরাতুল হালবিয়্যাহ, সীরাতে ইবনু সাইয়্যিদিন নাস এবং যাদুল মা'আদের মতো সাবলীল ও চমৎকার সব গ্রন্থ।

ইসলামের ইতিহাসে হাজার বছরেরও অধিককাল ধরে লেখা এসব সীরাতগ্রন্থের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে দরকার পড়বে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনার। শুধু তালিকা পেশ করলেও সেটা হবে অনেক লম্বা। তবে আমাদের বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটি লেখার উদ্দেশ্য সেটা নয়। বরং এ নিবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে সীরাত পাঠের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সীরাত পাঠের আগ্রহের পাশাপাশি এর উৎস সম্পর্কে আমাদের কতটুকু

---

* মুদাররিস, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, ঢাকা

সচেতন হওয়া প্রয়োজন সে ব্যাপারে পাঠককে কিছুটা ধারণা দেওয়া। সচেতনতার অভাবে সীরাত বিষয়ে অবচেতনভাবেই আমাদের মধ্যে কীভাবে প্রবেশ করছে নানা সংশয় ও আপত্তিকর বিষয়– এ লেখাতে সে ধরনের কিছু দৃষ্টান্তও পেশ করা হবে।

উৎসের স্বচ্ছতা

সীরাত বিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে সবি কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীসের মধ্যে যেমন বর্ণনাসূত্রের বিচারে গ্রহণযোগ্যতার বিভিন্ন স্তর রয়েছে, তেমনি সীরাত গ্রন্থগুলোর মধ্যেও গ্রহণযোগ্য বর্ণনার পাশাপাশি অসংখ্য পরিত্যাজ্য বর্ণনাও পাওয়া যায়। সীরাতগ্রন্থে উল্লেখ থাকলেও যেগুলোর উপর বিশ্বাস করার বা সেগুলো দিয়ে দলীল উপস্থাপনের কোনো সুযোগ নেই।

এসব পরিত্যাজ্য বর্ণনাগুলো সীরাতগ্রন্থগুলোতে নানা কারণে এসেছে। কোন সীরাত লেখক এসব বর্ণনা এনেছেন নিতান্তই অসতর্কতা বা অজ্ঞাতসারে। কেউবা আবার জেনেশুনেই এসব বর্ণনা একত্র করেছেন। উদ্দেশ্য ছিলো, সীরাত বিষয়ক সবধরনের বর্ণনাকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। এদের মধ্যে কেউ তো নিজ কিতাবের গ্রহণযোগ্য আর অগ্রহণযোগ্য বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ এর ভার অন্যদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

সুতরাং সব ধরনের সীরাত গ্রন্থ সবার জন্য উপযোগী হওয়ার স্বাভাবিক সুযোগ আর থাকছে না; বরং অধ্যয়নের আগে জানতে হবে গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে। সেই সাথে লেখকের পরিচয় এবং গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ও মূলনীতি কী ছিলো, তাও জেনে নেওয়া আবশ্যক। এমনকি লেখক যদি কোনো ঐতিহাসিক মুসলিম ব্যক্তিত্ব হোন, তবু তার গ্রন্থ সম্পর্কে অন্যান্য মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মতামত জেনেই অধ্যয়ন শুরু করা উচিৎ।

অমুসলিমদের লেখা সীরাত

এ তো গেলো মুসলমান লেখকদের লেখা সীরাত অধ্যয়ন সম্পর্কে সতর্কতা। এর বিপরীতে সীরাত গ্রন্থগুলোর বিরাট একটা অংশের লেখক রয়েছেন অমুসলিম। অমুসলিম লেখকদের সীরাতগ্রন্থগুলোকে সাধারণ দৃষ্টিতে খুব গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। এটাকে ইসলামের নবীর মহত্ত্বের দলীল হিসেবে পেশ করা হয়। মুসলিম না হয়েও নবীজীর পক্ষে কলম ধরার বিষয়টাকে বিরাট কিছু ভাবা হয়। স্বাভাবিকভাবে বিষয়টা সত্যিই অবাক করার মতো। মুসলিম না হয়েও কিছু কিছু লেখক নবীজীর ব্যাপারে যতোটা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন সেটা থেকে আমাদেরও শেখার বিষয় আছে।

তবে সকল অমুসলিম লেখকই যদি সীরাত লেখার ক্ষেত্রে শতভাগ সততার আশ্রয় নিতেন তাহলে চিন্তার কিছু ছিলো না। কিন্তু বাস্তবতা হলো তাদের মধ্যে অনেকেই এক্ষেত্রে সততার পরিচয় দিতে পারেননি। কী মূল লেখা কী অনুবাদ সবক্ষেত্রেই প্রাচ্যবিদ অমুসলিম লেখকদের পক্ষ থেকে অসংখ্য বেইনসাফীর প্রমাণ রয়েছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, দুয়েক ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তবে জেনে বুঝে অগ্রহণযোগ্য তথ্য বা মতামত নিজ গ্রন্থে এনে কোনো মনগড়া ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া লেখকের সংখ্যাও কম নয়। দু'জন লেখক ও তাদের লিখিত গ্রন্থ সম্পর্কে সামান্য আলোচনার মাধ্যমে আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

আলফ্রেড গিয়োম ও তার অনূদিত সীরাতে ইবনে হিশাম

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে সীরাতে ইবনে হিশামের ইংরেজি অনুবাদ। অনুবাদক আলফ্রেড গিয়োম এ কিতাব অনুবাদের ক্ষেত্রে খুবই অবিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছেন। তার অবিশ্বস্ততার প্রথম প্রমাণ হলো তিনি বইয়ের প্রচ্ছদে ইবনে ইসহাকের নাম উল্লেখ করছেন। অথচ সীরাতে ইবনে ইসহাকের পূর্ণাঙ্গ কোনো পাণ্ডুলিপি বর্তমানে পাওয়াই যায় না। আর ইবনে হিশাম হলেন ইবনে ইসহাকের প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরের । ইবনে ইসহাকের কিতাবুস সীরাত কে ইবনে হিশাম সংযোজন ও পরিমার্জন করেছেন। যেটি বর্তমানে সীরাতে ইবনে হিশাম নামে পরিচিত। আলফ্রেড গিয়োম এই কিতাবেরই অনুবাদ করেছেন। তিনি এ ব্যাপারটি গ্রন্থের ভূমিকার মধ্যে স্বীকার করলেও প্রচ্ছদে সরাসরি ইবনে ইসহাকের নাম ব্যবহার করে অবিশ্বস্ততার বীজ বপন করেছেন।

এখানেই শেষ নয়। আলফ্রেড গিয়োম কিতাবটি অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক বিষয় সংযোজন করেছেন। এ সংযোজনের ক্ষেত্রেও তিনি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে পারেননি। উদাহরণ হিসেবে আমরা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে ২০০৬ সালে ছাপা কপির ৫৫২ নম্বর পৃষ্ঠার একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে পারি।

> I. I. From Hakim b.`Abbad b. Hanif and other traditionists : Quraysh had put picturers in the Ka'ba including two of Jesus son of Mary and Mary (on both of whom be peace!) 1. Shihab said : Asma' b. Shaqr said that a woman of Ghassan joined in the pilgrimage of the Arabs and when she saw the picture of Mary in the Ka'ba she said, `My father and my mother be your ransom! You are surely an Arab woman!' The apostle ordered that the pictures should be erased except those of Jesus and Mary.

'এই বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, কুরাইশরা কা'বা গৃহে স্থাপিত অন্যান্য ছবির সাথে মারইয়াম এবং ঈসা আ. -এর দু'টি ছবিও স্থাপন করেছিলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারাইয়াম আ. এবং ঈসা আ. -এর ছবি ছাড়া অন্য ছবিগুলো মুছে দিতে বলেছেন।'

আলফ্রেড গিয়োম -এর উদ্ধৃত এই বক্তব্য মানতে গেলে ছবিকে এক প্রকার বৈধতা দেওয়া হয়। এবং সেটা খোদ কা'বার অভ্যন্তরে। অথচ ছবি, মূর্তি এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্পষ্ট। তাই এ বর্ণনা চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশ্লেষণের দাবী রাখে। তবে সেই বিশ্লেষণের আগে আমরা ছবির ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে জেনে নেব।

ইসলামের দৃষ্টিতে ছবি

ইসলামের আগমনই হয়েছে মূর্তি এবং এ জাতীয় সকল কিছু বিনষ্ট করার জন্যে। এ বিষয়ে কিছু বর্ণনা লক্ষ করা যেতে পারে।

১. হযরত আমর ইবনে আবাসা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রেরণ করেছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার, মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে ফেলার এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার ও তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক না করার বিধান দিয়ে।' (সহীহ মুসলিম; হাদীস ৮৩২)

২. হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

> لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أوتصاوير
>
> অর্থ : ফেরেশতারা ওই ঘরে প্রবেশ করেন না যাতে মূর্তি বা ছবি রয়েছে। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ২১)

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

> إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم.

অর্থ : যারা এই সব প্রতিকৃতি প্রস্তুত করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার করো। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৯৫১, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২১০৭)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন-

سمعت مُحَّدا ﷺ يقول : من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ الروح وليس بنافخ.

অর্থ : আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কেউ দুনিয়াতে কোনো প্রতিকৃতি তৈরি করবে তাকে কিয়ামতের দিন বাধ্য করা হবে যেন সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে, অথচ সে তা করতে সক্ষম হবে না। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৯৬৩, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২১১০)

৫. আবূ হুরাইরা রাযি. বলেন-

استأذن جبريل عليه السلام على النبي ﷺ فقال : كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا في تصاوير.

অর্থ : একদিন জিবরীল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভিতরে আসুন। জিব্রীল আ. বললেন, কীভাবে আসব, আপনার গৃহে ছবিযুক্ত পর্দা রয়েছে। আপনি হয় এই ছবিগুলোর মাথা কেটে ফেলুন কিংবা সেটাকে বিছানা বানিয়ে ফেলুন, যা পদদলিত হবে। কেননা, আমরা ফেরেশতারা ওই গৃহে প্রবেশ করি না যাতে ছবি থাকে।' (সুনানে নাসায়ী; হাদীস ৫৩৬৫, সহীহ ইবনে হিব্বান; হাদীস ৫৮৫৩)

এতো গেলো ছবির ব্যাপারে ইসলাম ও নবীজীর মৌখিক দৃষ্টিভঙ্গি। এরকম আরো অগণন বর্ণনা পেশ করা যাবে। এসব মৌখিক বর্ণনা ছাড়াও আমরা যদি নবীজীর আমল এবং ছবির ব্যাপারে নেওয়া বিভিন্ন সময়ের পদক্ষেপের দিকে তাকাই তাহলেও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে ছবির ব্যাপারে ইসলাম কতোটা কঠোর অবস্থানে রয়েছে!

১. হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

لم يكن يترك في بيته شيئا فيه التصاليب إلا نقضه، وفي نسخة : تصاوير

অর্থ : নবীজী তাঁর ঘরে ছবি অঙ্কিত কিছু দেখলে তা বিনষ্ট করে দিতেন। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৯৫২)

২. আলী ইবনে আবী তালেব রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন বললেন-

أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে মদীনায় যাবে এবং যেখানেই কোনো মূর্তি পাবে তা ভেঙ্গে ফেলবে, যেখানেই কোনো সমাধি-সৌধ পাবে তা ভূমিসাৎ করে দিবে এবং যেখানেই কোনো চিত্র পাবে তা মুছে দিবে? আলী রাযি. এই দায়িত্ব পালন করলেন। ফিরে আসার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على مُحَّد.

অর্থ : যে কেউ পুনরায় ওই সব বস্তু তৈরি করবে সে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রতি নাযিলকৃত দীনকে অস্বীকারকারী। (মুসনাদে আহমদ; হাদীস ৬৫৯)

৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন-

قدم رسول الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله ﷺ هتكه، وقال : أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، قالت : فقطعناه فجعلناه وسادة أو وسادتين.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর থেকে ফিরলেন। আমি কক্ষের দ্বারে একটি পর্দা ঝুলিয়েছিলাম, যাতে ছবি অঙ্কিত ছিল। তিনি তা খুলে ফেললেন এবং বললেন, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন আযাব দেওয়া হবে যারা আল্লাহর সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।' উম্মুল মু'মিনীন বলেন, তখন আমরা তা কেটে ফেললাম এবং একটি বা দু'টি বালিশ বানালাম। (সহীহ বুখারী; হাদীস ৫৯৫৪, সহীহ মুসলিম; হাদীস ২১০৭)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস এবং তার পদক্ষেপ দুটো থেকেই স্পষ্ট যে, প্রাণীর প্রতিকৃতি প্রস্তুত করা এবং এর মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার

সবই শরীয়তে নিষিদ্ধ ও হারাম। এ প্রসঙ্গে যে হাদীসগুলো এসেছে তা অকাট্য ও মুতাওয়াতির। ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঐকমত্য রয়েছে।

আলফ্রেড গিয়োমের উদ্ধৃতির বিশ্লেষণ

এবার আসি এ বিষয়ে আলফ্রেড গিয়োম যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন তার বিশ্লেষণে। আমরা এ বর্ণনাটির ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি কথা আরজ করছি।

এক.

প্রথম কথা হলো, এ বর্ণনাটি সীরাতে ইবনে ইসহাকে নেই। আলফ্রেড গিয়োম এটি এনেছেন আযরাকীকৃত 'আখবারু মক্কা' নামক গ্রন্থ থেকে। আযরাকী নিজেও কিন্তু একথা বলেননি যে, এই বর্ণনা সীরাতে ইবনে ইসহাকে রয়েছে। হ্যাঁ, আযরাকীর সনদে ইবনে ইসহাক একজন বর্ণনাকারী হিসেবে রয়েছেন।

দুই.

আযরাকী ইবনে ইসহাকের ছাত্র ছিলেন না; বরং তার অনেক পরের ছিলেন। আযরাকী সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান করেও তার সম্পর্কে আলোচনা খুব অল্প গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তদুপরি যারা তার সম্পর্কে লিখেছেন তারা তার সততা ও সত্যবাদিতা এবং তার স্মৃতিশক্তি ও ধীশক্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ইমামদের কোনো মন্তব্য আনতে সক্ষম হননি। এজন্য খোদ আযরাকীর সততা ও বিশ্বস্ততাই অজ্ঞাত।

তিন.

আযরাকী ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইবনে ইসহাক এই বর্ণনার কিছু অংশ হাকীম ইবনে আব্বাদ ইবনে হানীফ ও জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তির উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন, আর কিছু কথা ইবনে শিহাবের উদ্ধৃতিতে। ইবনে শিহাব সম্পর্কে দাবি করা হয়েছে যে, তিনি কিছু কথা আসমা বিনতে শাকার এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন এবং কিছু কথা উদ্ধৃতি ছাড়া।

চার.

সনদে একটি নাম আসমা বিনতে শাকার। তিনি অজ্ঞাতপরিচয়। আসমাউর রিজালের গ্রন্থে তার নাম পাওয়া যায় না। তদুপরি কোন সূত্রে সে গাসসানের ওই আগন্তুক মহিলার কথা জানতে পেরেছে তারও কোনো উল্লেখ নেই। ইবনে ইসহাককে স্বয়ং ইবনে শিহাব এই তথ্য দিয়েছেন, এটা তিনি বলেননি। যদি

ভিন্ন কোনো সূত্রে ইবনে শিহাবের বর্ণনা তিনি পেয়ে থাকেন তবে সেই মাঝের সূত্রটি কে, তা ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেননি।

মোটকথা, সনদে যেমন শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তদ্রূপ উল্লিখিত রাবীদের পরিচয়ও অজ্ঞাত। এধরনের বিচ্ছিন্ন ও অজ্ঞাত সূত্রে প্রাপ্ত একটি বিবরণ সীরাতে ইবনে হিশামের মধ্যে প্রক্ষেপন করা হয়েছে।

এ বর্ণনার ভিত্তিহীনতা আলফ্রেড গিয়োমের অজানা থাকার কথা না। তার এও অজানা থাকার কথা নয় যে, এটি বিচ্ছিন্ন ও অজ্ঞাত সূত্র সম্বলিত হওয়ার পাশাপাশি ইসলামের অকাট্য ও ঐকমত্যপূর্ণ বক্তব্যের বিরোধী। এরপরও বর্ণনাটিকে সংযুক্ত করার আসল কারণ তো তিনিই ভালো বলতে পারতেন। আমাদের জন্য তার এই সংযুক্তিকে উদ্দেশ্যমূলক বলা ছাড়া উপায় নেই। আর সেই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, মুসলমানদের অকাট্য ও ঐকমত্যপূর্ণ একটি বিষয়ে সন্দেহের বীজ বপন করা।

সত্যি কথা বলতে কি, তিনি তার এই উদ্দেশ্যে অনেকাংশেই সফল। আলফ্রেড গিয়োম কৃত সীরাতে ইবনে হিশামের অনুবাদ থেকে মারইয়াম ও ঈসা আ. -এর ছবি সম্পর্কিত এ বর্ণনাটি মুসলিম অমুসলিম অনেক লেখকই পেশ করছেন। উদ্দেশ্য, ছবিকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা। ২০০৮ সালে এয়ারপোর্টের কাছাকাছি হাজী ক্যাম্পের সামনে স্থাপিত ভাস্কর্যকে বৈধতা দেওয়ার জন্যে এ বর্ণনাটিকেও অবলম্বন করা হয়েছিলো।

আলফ্রেড গিয়োমের ছড়িয়ে দেওয়া এই বিপদ বাংলা ভাষাতেও সংক্রমিত হয়েছে। শহীদ আখন্দ কর্তৃক সীরাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামে অনূদিত হয়ে এটি প্রথমা প্রকাশনী থেকে প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে খোদ সীরাতে ইবনে ইসহাকের ব্যাপারেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো,

> এটি সীরাতের কিতাব হিসেবে মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য হলেও এতে বেশ কিছু মুনকার বিষয়ও বিদ্যমান রয়েছে। (মীযানুল ই'তিদাল ৩/৪৬৯)

সেখানে বাংলাতে সীরাতে ইবনে ইসহাকের নামে আলফ্রেড গিয়োমের এই সংকলন প্রকাশ পাওয়াটা কতটা শঙ্কার বিষয় তা সহজেই অনুমেয়।

সীরাতে ইবনে ইসহাক বিশ্বব্যাপী পঠিত ও সমাদৃত একটি গ্রন্থ। কিন্তু বাংলাতে সেটির অনুবাদ আলফ্রেড গিয়োম কৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে করে পাঠককে কতটা ধোঁকায় ফেলা হচ্ছে তা এতক্ষণে সবার বুঝে ফেলার কথা।

সীরাতে ইবনে ইসহাকের নামে পাঠক পাচ্ছেন আলফ্রেড গিয়োমের স্বেচ্ছাচারযুক্ত একটি সংকলন। সীরাত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে উৎস সম্পর্কে সতর্কতা না থাকায় এর মাধ্যমে বাংলাভাষী পাঠকের মধ্যে নানা রকম সন্দেহ, সংশয় ও অগ্রহণযোগ্য বিষয় প্রবেশ করার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

মুহাম্মাদ : আ বায়োগ্রাফি অব দ্য প্রফেট

এ ধরনের আরেকটি গ্রন্থ হলো, ক্যারেন আর্মস্ট্রং লিখিত 'মুহাম্মাদ : আ বায়োগ্রাফি অব দ্য প্রফেট'। বাংলায় এটি শওকত হোসেন কর্তৃক 'মুহাম্মাদ : মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনী' নামে অনূদিত হয়ে সন্দেশ প্রকাশনী থেকে বের হয়েছে। এ বইটির ব্যাপারে আলোচনা শুরু করার আগে বইটির ভূমিকা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হচ্ছে।

> 'আমরা যখন বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এগিয়ে যাচ্ছি ঠিক সে সময় ধর্মবিশ্বাস আবার এক শক্তিশালী বিষয় বলে পরিগণিত হচ্ছে। ... সোভিয়েত ইউনিয়নে বেশ কয়েক দশকব্যাপী রাষ্ট্রীয় নাস্তিকতার পর্যায় অতিক্রম করার পর সেখানকার নারী পুরুষ এখন ধর্ম অনুসরণের অধিকার দাবী করছে। পশ্চিমা বিশ্বে, যেখানকার জনগণ এতদিন যাবত প্রচলিত বিশ্বাস ও ধর্মানুসরণে খুব একটা আগ্রহী ছিলো না, তারাও ইদানীং আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্গত জীবন সম্পর্কে নতুন করে সচেতন হয়ে উঠছে।' (পৃষ্ঠা ১১)

> 'ইসলাম জন্মগতভাবে ধ্বংসাত্মক বা অন্ধবিশ্বাস, এমনটি ভাবা ঠিক নয়, যেমনটি মাঝে মাঝে বলা হয়ে থাকে। ইসলাম একটি সর্বজনীন (য. প্রা.) ধর্ম বিশ্বাস এবং এর মাঝে উগ্র প্রাচ্যবাদিতা বা পাশ্চাত্য বিরোধিতা বলে কিছু নেই।' (পৃষ্ঠা ১৪)

লেখকের এ দুটি বক্তব্যের প্রথমটি থেকে মনে হচ্ছে যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয়টি তিনি ইতিবাচকভাবে দেখছেন। দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তিনি ধর্ম হিসেবে ইসলাম ধর্মের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। এ সম্পর্কে তার ধারনাও ইতিবাচক। সুতরাং ভূমিকাটি পাঠ করে একজন পাঠকের জন্য বইটিকে বাহ্যদৃষ্টিতে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষের মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

কিন্তু এসব কথার বিপরীতে তার এ গ্রন্থে এমন সব কথাই বেশি, যেগুলো ইসলামের মৌলিক বিষয়ে আঘাত করছে। গ্রন্থকার এক্ষেত্রে খুবই চাতুর্যের সাহায্য নিয়েছেন। তিনি সরাসরি আক্রমণ না করে যুক্তি ও ইনসাফপূর্ণ সরল

মন্তব্যের পোষাকে সন্দেহের বীজগুলোকে পাঠকের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ থেকে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১. ওহীর স্বরূপ বিকৃতি

গারে হেরায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম ওহী প্রাপ্তির ঘটনা উল্লেখ করে লেখক বলেছেন,

> 'এই অভিজ্ঞতার প্রকৃতি বোঝার জন্যে আমাদের একটু বিরতি দিতে হবে। আমরা এখন আর এ ধরনের সকল অভিজ্ঞতাকে সরাসরি হিস্টেরিয়া বা ভুল বিশ্বাস বলে বাতিল করে দিই না। সকল ধর্মীয় সংস্কৃতিতেই অনুপ্রেরণাকে শুভ ক্ষমতা হিসেবে দেখা হয়– শিল্প ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকেই। কবিতা বা বাণী যেন এর রচয়িতার সঙ্গে আদেশের সুরে কথা বলে এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। বরাবর একজন সৃজনশীল চিন্তাবিদ এও অনুভব করেন যে তিনি এভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন : তিনি কোনোও না কোনোওভাবে এক অনির্মিত বাস্তবতাকে স্পর্শ বা আবিস্কার করেছেন যার স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে। এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ আর্কিমিডিস, তাঁর সুবিখ্যাত সূত্র আবিষ্কারের পর 'ইউরেকা! আমি পেয়ে গেছি!' বলে চৌবাচ্চা থেকে লাফিয়ে উঠেছিলেন তিনি।' (পৃষ্ঠা ৯৭)

ওহী প্রাপ্তির বিষয়ে লেখকের উপর্যুক্ত বক্তব্যের দিকে যদি তাকাই, তাহলে দেখব লেখক প্রথমে একথা বললেন যে– 'আমরা এখন আর এধরনের সকল অভিজ্ঞতাকে সরাসরি হিস্টেরিয়া বা ভুল বিশ্বাস বলে বাতিল করে দিই না।' একথা দ্বারা মূলত লেখক নিজেকে প্রথমে একজন পক্ষপাতমুক্ত মানুষ হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এরপরই শুরু করেছেন ওহীর স্বরূপ বিকৃতির ধারাবাহিক প্রচেষ্টা। পরবর্তী বাক্যগুলো লক্ষ করুন।

'সকল ধর্মীয় সংস্কৃতিতেই অনুপ্রেরণাকে শুভ ক্ষমতা হিসেবে দেখা হয়– শিল্প ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকেই।'

লেখকের এই কথার মানে হলো, ওহী নবীজীর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আসতো না। বরং এটা ছিলো তার ভেতরকার একটি শুভ অনুপ্রেরণা। লেখকের পরবর্তী কথা লক্ষ করুন। 'কবিতা বা বাণী যেন এর রচয়িতার সঙ্গে আদেশের সুরে কথা বলে এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে।' এখানে ওহী প্রেরণকারী বা প্রত্যাদেশকারী হিসেবে স্বয়ং কবিতা এবং বাণীকেই সাব্যস্ত করা হচ্ছে।

সবশেষে লেখক ওহীকে আর্কিমিডিসের সূত্র পাওয়ার সাথে তুলনা করছেন। ‘এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ আর্কিমিডিস, তাঁর সুবিখ্যাত সূত্র আবিষ্কারের পর ‘ইউরেকা! আমি পেয়ে গেছি!’ বলে চৌবাচ্চা থেকে লাফিয়ে উঠেছিলেন তিনি।’

এধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি প্রত্যাদেশ হওয়ার সম্ভাব্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। তার দাবী অনুযায়ী শুধু আমাদের নবীজীর ওহী কেনো, সকল নবীর ওহীই ছিলো তাদের ভেতরকার শুভ অনুপ্রেরণা থেকে উদ্ভূত! কেউ কেউ হয়তো ভাববেন, লেখক আসলে এমন একটা ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যেটা সাধারণভাবে সকলের কাছে গ্রাহ্য হবে। আস্তিক-নাস্তিক সবার কাছেই কথাটা গ্রহণযোগ্য হবে। সে হিসেবে তো কথাটা ঠিকই আছে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ ধরনের একটা দাবী ধর্মের ভিত্তিকে সম্পূর্ণ নড়বড়ে করে দেয়। অনুপ্রেরণা যতোই শুভ হোক না কেনো, সেটা যদি সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে না হয় তাহলে সেটাকে ধর্ম বলে প্রকাশ করাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত। এরকম শুভ অনুপ্রেরণা তো সকল মানুষের ভেতরই উদয় হওয়া সম্ভব। সবার ভাবনাকেই কি তাহলে আলাদা আলাদা ধর্ম বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে? লেখক আর্কিমিডিসের যেই বিখ্যাত উদাহরণ পেশ করেছেন সেটাকেও তো তাহলে একটা ধর্মীয় আবরণ দেওয়া সম্ভব। লেখক ওহীর উৎস হিসেবে অনুপ্রেরণাকে সাব্যস্ত করে হয়তো ভাবছেন, এতে করে মানুষের কাছে ওহীর বিষয়টা হৃদয়গ্রাহ্য হবে এবং মানুষ খুব সহজেই ওহীকে মেনে নেবে। কিন্তু তার সামনে কি এটা লক্ষ করার মতো মেধা ছিলো না যে, এতে করে তিনি যেই ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রমাণিত করতে চাইছেন তার মৌলিকত্বই নষ্ট হয়ে যায়! ক্যারেন আর্মস্ট্রংয়ের বাহ্যিক জ্ঞান ও কাজের পরিধি দেখে তো এটা মনে না করে উপায় নেই যে, তিনি এসব বিষয় বুঝেও ইচ্ছাকৃতভাবেই নতুন কোনো বিতর্কের জন্ম দেওয়ার জন্য এমন অযৌক্তিক কথার অবতারণা করেছেন।

এর বিপরীতে লেখকের নিজেরেই আরেকটি বক্তব্য লক্ষ করুন–

> ‘মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আধ্যাত্মিক প্রতিভা দেখে কেবল চমকিত হতে হয়, তাঁর সঙ্গে ধর্মাচারী ইহুদী বা ক্রিশ্চানদের কোনও যোগাযোগ ছিলো না এবং এসব আদি প্রত্যাদেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ছিলো একেবারে এবং অনিবার্যভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের; কিন্তু তিনি একেশ্বরবাদী চেতনার মর্মমূলে পৌঁছতে পেরেছেন।’ (পৃষ্ঠা ১১৩)

দেখুন, লেখক নিজেই বলছেন, নবীজীর সঙ্গে ধর্মাচারী ইহুদী বা ক্রিশ্চানদের কোনও যোগাযোগ ছিলো না। কোনো ধরনের যোগাযোগ ছাড়া এমনকি পূর্ববর্তী ধর্ম সম্পর্কে পূর্ব ধারণা ছাড়া শুধু নিজের অনুপ্রেরণা থেকে নতুন একটা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা কি আদৌ সম্ভব? লেখকের বক্তব্য অনুযায়ীই ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মগুলোর মৌলিকভাবে মিল আছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত না হয়ে শুধু নিজের অনুপ্রেরণার মাধ্যমে আহৃত ধর্ম কিভাবে অন্যান্য ধর্মের সাথে সাযুজ্য লাভ করলো?

আরো কথা আছে। কুরআনে পূর্ববতীদের অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর বাস্তবতা ঐতিহাসিকভাবেও স্বীকৃত। শুধু নিজের অনুপ্রেরণা থেকে কি এতো নিখুঁত ইতিহাস বর্ণনা সম্ভব? শুধু ইতিহাসের বিষয়ই নয়, নবীজী ভবিষ্যতের অনেক কথাও বলেছেন। যেগুলো পরবর্তীতে শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। মক্কা বিজয়ের কথাই ধরি। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর সূরা ফাতহে বলা হলো,

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا.

> অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। তোমাদের কেউ কেউ থাকবে মাথা মুণ্ডানো অবস্থায় আর কেউ থাকবে চুল কর্তিত অবস্থায়। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না। তোমরা যা জানো না আল্লাহ তা জানেন। এছাড়াও তিনি তোমাদের দান করেছেন এক সদ্যবিজয়। (সূরা ফাতহ; আয়াত ২৭)

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে মুসলমানদের বাহ্যিক অবস্থা যাদের জানা আছে তাদের কাছে এটা অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, তখন মুসলমানদের বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্য ও লোকবল হিসেবে নিজের পক্ষ থেকে এমন একটা ভবিষ্যতবাণী করা শুধু ঝুঁকিপূর্ণই নয়, ছিলো দূরদর্শীতারও বিপরীত। মক্কা বিজয়ের ঘোষণা শুধু মক্কার লোকদের বিরুদ্ধে ছিলো না। ছিলো সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। কারণ, কা'বা ঘর শুধু মক্কাবাসীদের জন্য নয়, সমগ্র আরবের জন্যই সম্মানের পাত্র ছিলো। একজন দূরদর্শী মানুষ নিশ্চিত না হয়ে এতো বড়ো ঝুঁকি নিতে পারেন না।

ওহীর উৎসমূল সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলার স্পষ্ট বাণী হলো,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى.

> অর্থ : এবং তিনি (নবীজী) প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে কোনো কথা বলেন না। নিশ্চয়ই তিনি যা বলেন তা ওহী– যা তার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা নাজম; আয়াত ৩-৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

> অর্থ : আর এইভাবে আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি রূহ (কুরআন) আমার নির্দেশে; আপনি তো জানতেন না কিতাব কী ও ঈমান কী। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো, যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি। আর আপনি অবশ্যই সরল-সঠিক পথে মানুষকে আহ্বান করতেই থাকবেন। (সূরা শূরা; আয়াত ৫২)

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা আরো স্পষ্ট করে বলছেন, ওহী সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নির্দেশনাধীন। নবীজীকে প্রদত্ত কিতাব ও ঈমান সম্পর্কিত সবটুকু জ্ঞানই এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে।

লেখক একদিকে নবীজীর ভেতরের অনুপ্রেরণাকে ওহীর উৎস সাব্যস্ত করেছেন। অন্যদিকে ওহীর পক্ষে সাফাই গেয়েছেন বলে দাবী করছেন। তিনি বলছেন, ‘এ ধরনের সকল অভিজ্ঞতাকে সরাসরি হিস্টেরিয়া বা ভুল বিশ্বাস বলে বাতিল করে দিই না।’ কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ সকল আয়াতও তো নবীজীর ওহী ছিলো। কুরআনে কারীমের এ সকল আয়াতে তো লেখকের দাবীর সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলা হয়েছে। যদি ওহীকে লেখক বাতিল সাব্যস্ত নাই করেন, তাহলে তাকে এসব আয়াতও মানতে হবে। কারণ, একজন মানুষের কথা মানা হবে আবার অস্বীকার করা হবে এটা তো যৌক্তিক নয়। সে হিসেবে ওহীর উৎস হিসেবে কুরআনের বক্তব্য, নবীজীর বক্তব্যকেই চূড়ান্ত মনে করতে হবে।

আর যদি লেখক বলতে চান যে, মৌলিকভাবে ওহীকে তিনি বাতিল সাব্যস্ত না করলেও ওহীর উৎসের ব্যাপারে তার দাবীই সঠিক। তাহলে দেখা যাচ্ছে,

নবীজী এর বিপরীত বলছেন। সে হিসেবে তো নবীজীর সাব্যস্ত করা উৎস ভুল ছিলো (নাউযুবিল্লাহ)। তাহলেতো নবীজী আর অনুসরণযোগ্য থাকছেন না। কারণ, নতুন একটি ধর্ম নিয়ে আগমনকারী একজন মানুষ যদি ওহীর মতো মৌলিক একটি বিষয়ের উৎসের ব্যাপারেই ভুল তথ্য দেন তাহলে তিনি আর কিভাবে অনুসরণযোগ্য থাকেন!

২. নবুওয়াতের স্বরূপ বিকৃতি

লেখক বলেন,

> ‘মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মিশন শুরু করার জন্যে প্রস্তুত। আপন অভিজ্ঞতার ওপর আস্থা রাখতে শিখেছেন তিনি, এখন তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে যে এই বাণী সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত। তিনি পথভ্রান্ত কাহিন (ভবিষ্যদ্বক্তা) নন। এই বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে সাহস প্রয়োজন, কিন্তু এবার এমন এক পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন যার জন্যে দৃঢ় সংকল্পের চেয়েও বাড়তি কিছু প্রয়োজন হবে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা হিসেবে ওয়ারাকার মতামতকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁকে ‘কুরাইশদের পয়গম্বর’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।’ (পৃষ্ঠা ১০২)

লেখক এখানে দাবী করেছেন যে, নবীজী তার দাওয়াতী কাজ শুরু করার ব্যাপারে ওয়ারাকার মতামতকে ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অথচ এই উদ্ধৃতিরই প্রথম দিকে লেখক স্বীকার করছেন যে, ‘প্রাপ্ত বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার ব্যাপারে নবীজীর বিশ্বাস জন্মেছিলো। দৃঢ় সংকল্পও ছিলো।’ তাহলে প্রশ্ন হলো, সে বাণীকে প্রচার করার জন্যে ওয়ারাকার মতামতের কেনোই বা প্রয়োজন পড়লো। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাণী প্রচার করার জন্যে একজন মানুষের শরণাপন্ন হওয়াটা কি বিবেচনাপ্রসূত কোনো কাজ?

নবীজী নিজের নবুওয়াত প্রাপ্তি নিয়ে কখনই সন্দিহান ছিলেন না যে সেই সন্দেহ দূর করার জন্য ওয়ারাকার শরণাপন্ন হতে হবে। নবুওয়াতের বাণী প্রচারের ব্যাপারেও তার নিজের সংকল্পের বাইরে আর কিছু প্রয়োজন ছিলো না। তিনি ওয়ারাকার কাছে গিয়েছেন শুধুই নিজের নবুওয়াত প্রাপ্তির বিষয়টি জানাতে। ওয়ারাকা এ বিষয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন সত্য, কিন্তু নবুওয়াত প্রাপ্তি ও প্রচারের ব্যাপারে তার এ কথাকে সিদ্ধান্ত হিসেবে নেওয়ার কোনো কারণ ছিলো না।

৩. ইসলামের স্বরূপ বিকৃতি

এ গ্রন্থে লেখক এও দাবী করেছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মটা সারা বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য ছিলো না। বরং বিশেষত আরবের জন্য অনুসরণীয় ছিলো। দেখুন– 'কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও কল্পনা করেননি যে তিনি একটা নতুন বিশ্বধর্ম প্রতিষ্ঠা করছেন। এটা আরবদের ধর্ম হওয়ার কথা ছিল, যারা ইশ্বরের মহাপরিকল্পনার আওতার বাইরে পড়ে গেছে বলে মনে করা হয়েছিলো।' (পৃষ্ঠা ৯৮)

লেখকের এই দাবী কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণার বিপরীত। ইরশাদ হয়েছে-

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا۔

> অর্থ : মহান ঐ সত্তা যিনি তার বান্দার উপর (হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী) ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তিনি বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। (সূরা ফুরকান; আয়াত ১)

সূরা কলমের ৫২ নম্বর আয়াত এবং সূরা তাকবীরের ২৭ নম্বর আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে– 'কুরআন হলো সারা বিশ্বের জন্য যিকর (উপদেশ)।'

৪. কুরআনের স্বরূপ বিকৃতি

লেখক যেহেতু ইতোপূর্বে ওহীকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ বলে মানতে চাননি, সে হিসেবে তার মতে তো কুরআনও আল্লাহর কালাম হওয়ার কথা নয়। সেজন্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকার করতে চাননি।

কিন্তু বিষয়টা তিনি এতটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, কুরআনের উৎসমূলকে বিকৃত করার পাশাপাশি তিনি কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলীর বাস্তবতাও অস্বীকার করেছেন।

> 'কোরানের আলোচনার পুরো ধরনটাই প্রতীকাশ্রয়ী; বারবার এতে মুসলিমদের ভাববার জন্য রাখা অসংখ্য উদহারণের কথা বলা হয়েছে। ... কোরানের ধর্মতত্ত্বের রূপকাশ্রয়ী প্রকৃতি প্রায়শই পাশ্চাত্যবাদীরা ভুল বুঝে থাকে... বরং কোরানে বর্ণিত কিছু কিছু বিষয়– পয়গম্বরদের জীবন বা অত্যাসন্ন শেষ বিচার– একেবারেই স্বর্গীয় সত্যের প্রতীকী উপস্থাপন, এগুলোকে আক্ষরিক অর্থে বোঝার চেষ্টা করা উচিৎ নয়।' (পৃষ্ঠা ১১৩)

লেখক এখানে অন্যান্য পাশ্চাত্যবাদীর ভুল ধরতে গিয়ে নিজেই ভুলে পতিত হয়েছেন এবং অন্যদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছেন। কুরআনের বর্ণনা যদি নিছক প্রতীকীই হয়, বাস্তবতার সাথে এর কোনো সম্পর্কই না থাকে, তাহলে ইহজগত সম্পর্কে কুরআনের অসংখ্য বক্তব্যের কী অর্থ হবে? কুরআনে আছে পাহাড় ও সমুদ্রের কথা। আছে জীব-জন্তুর কথা। আছে আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন নিয়ামত, ফলমূল শস্যরাজির কথা– সবই কি প্রতীকাশ্রয়ী। এগুলোকে যদি বাস্তব বর্ণনা বলা হয় তাহলে পয়গম্বদের জীবন বা শেষ বিচারকে অথবা পরকালের বর্ণনাকে কোন প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতীকাশ্রয়ী বক্তব্য বলা হবে? কুরআনে বর্ণিত নবীগণের জীবনীর তো ঐতিহাসিক বাস্তবতাও আছে। এগুলোকে লেখক কিভাবে প্রতীকাশ্রয়ী বলতে পারলেন?

৫. আকিদা ও ইবাদতের ব্যাপারে বিভ্রান্তি

লেখকের দাবী অনুযায়ী সালাত তথা নামায ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইসলাম ধর্মের মৌলিক ইবাদত নয়। এগুলোকে অন্য ধর্ম হতে আনা হয়েছে। লক্ষ করুন–

> 'এই অনুশীলন সম্ভবত সিরিয় মরুভূমির ক্রিশ্চান মঙ্কদের উপাসনা থেকে গৃহীত, তাঁরা মাঝরাতে উঠে বাইবেলের শ্লোক পাঠ করতেন।' (পৃষ্ঠা ১১৬)
>
> 'কোরান থেকে এটা মনে হয় যে গোড়ার দিকে সমালোচনার মূল কেন্দ্র ছিলো শেষ বিচারের ধারণা, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা ইহুদী-ক্রিশ্চান ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন।' (পৃষ্ঠা ১২২)

অন্যান্য ধর্মে সালাত বা এ জাতীয় কিছু কিংবা শেষ বিচারের ধারণা কোনো না কোনোভাবে থাকতেই পারে, কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসকল বিষয় অন্য ধর্ম থেকে এনেছেন, এ দাবী করতে হলে বা ধারণা প্রকাশ করতে হলেও অবশ্যই প্রমাণ পেশ করতে হবে।

এক্ষেত্রে লেখকের নিজের কথাই তার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে– 'মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আধ্যাত্মিক প্রতিভা দেখে কেবল চমকিত হতে হয়, তাঁর সঙ্গে ধর্মাচারী ইহুদী বা ক্রিশ্চানদের কোনও যোগাযোগ ছিলো না...।' (পৃষ্ঠা ১১৩)

উপর্যুক্ত বিষয়ের মধ্যে প্রত্যেকটাই এমন ধরনের বিকৃতি যেটা ইসলামের মূলে আঘাত হেনেছে। এ ধরনের মৌলিক বিকৃতি ছাড়াও লেখক নবীজীবনের হিলফুল ফুযূল, বক্ষ বিদারণ, তাঁর স্বপ্ন আরো অনেক বিষয়েই তথ্য বিভ্রাট এবং বিকৃতি ঘটিয়েছেন। লেখার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে না। ক্যারেন আর্মস্ট্রংয়ের এ বইটি বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদেরকে অনেক বড়ো বিপদে ফেলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অনলাইনে সর্বাধিক পঠিত ও বিক্রিত নবীজীর জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের তালিকার প্রথম দিকে রয়েছে এটি। এ থেকেই বোঝা যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে কত দ্রুত এ গ্রন্থের বিকৃতিগুলো প্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন। আমীন।

পরিশিষ্ট

আলোচ্য দু'টি গ্রন্থের অবস্থা দেখে পাঠকের নিশ্চয় আর বুঝতে বাকী নেই যে, পক্ষপাতমুক্ততার দাবীদার পাশ্চাত্যের লেখকরা নবীজীর সীরাতের নামে কতটা সুকৌশলে ইসলাম ও নবীজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোতে কালিমা লেপনের চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে তাদের আক্রমণটা সরাসরি আক্রমণের চাইতেও সুগভীর ও মারাত্মক। সেজন্যে এ লেখার পরিসমাপ্তিতে এসে আমরা শুরুর কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করছি।

সীরাত অধ্যয়ন এবং তা থেকে আলো গ্রহণ অবশ্যই আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। মুসলমানদের জন্য এ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। তবে অধ্যয়নের আগে অবশ্যই জানতে হবে গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে। সেই সাথে লেখকের পরিচয় এবং গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ও মূলনীতি কী ছিলো– তাও জেনে নেওয়া আবশ্যক। গ্রন্থটি সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মতামত কী তাও জানতে হবে। অন্যথায় অবচেতনভাবেই আমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে ভুল তথ্য, গলত ব্যাখ্যা, নানা সন্দেহ-সংশয়। আমাদের ভেতর সীরাতের আলোর পরিবর্তে প্রবেশ করবে বিকৃতির অন্ধকার। সীরাত পাঠের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজে যেটি কখনই কাম্য হতে পারে না।

তথ্যসূত্র:

১. *আল-কুরআনুল কারীম।*

২. *সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসায়ী, সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসনাদে আহমদ, মীযানুল ই'তিদাল।*

৩. *দ্য লাইফ অফ মুহাম্মাদ, আলফ্রেড গিয়োম, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।*

৪. *মুহাম্মাদ : মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনী, ক্যারেন আর্মস্ট্রং, অনুবাদ : শওকত হোসেন, সন্দেশ প্রকাশনী, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।*

৫. *মাসিক আলকাউসার, ডিসেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী।*

৬. *محاضرة حول "السيرة المطهرة، شبهات وافتراءات"* মাওলানা যাকারিয়া আব্দুল্লাহ দা.বা., দাওয়াহ *বিভাগ, মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-১৭।*

ঈসালে সওয়াব নিয়ে দু’টি কথা

মাওলানা সাঈদুর রহমান*

কোন মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তিনি দু‘আ ও সওয়াবের মুখাপেক্ষী থাকেন। মৃত ব্যক্তির জন্য দু‘আ করলে তা তার উপকারে আসে এ ব্যাপারে সকল উলামায়ে কেরাম একমত। কুরআন-হাদীসের অসংখ্য দলীলে দু‘আর বিষয়টি বর্ণিত আছে। অনুরূপভাবে আর্থিক ইবাদাত তথা দান–সাদাকা ও হজ্বের সওয়াব মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে এ বিষয়ে চার মাযহাবের বক্তব্যে ঐকমত্য আছে। এছাড়া শারীরিক ইবাদাত তথা নামায, রোযা ইত্যাদির সওয়াবও হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের বক্তব্য অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে। এই সকল উলামায়ে কেরামের বিপরীতে ভিন্ন একটি মত বর্তমানে কতক গবেষক এবং তাদের অনুসরণে আহলে হাদীস ধারার অনেকে পোষণ করেন। তারা বলেন, জীবিতদের নেক আমল মৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে না। শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তি যে সকল আমলের সবব বা কারণ হয়েছে সেগুলোই শুধু তার নিকট পৌঁছবে। যেহেতু সেগুলোও গোড়াতে তার নিজের কামাই। মৃত ব্যক্তির সন্তানও যেহেতু তার কামাই (দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হাদীস ২৩১৪৫) তাই শুধু সন্তানের পাঠানো সওয়াব তার নিকট পৌঁছবে। এছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে তার নিকট সওয়াব পৌঁছবে না।

এ ধরনের বক্তব্য এ বিষয়ে নতুন ধরনের বিভ্রান্তি তৈরী করছে। এই মতের পূর্বসূরী মূলত মু’তাযিলারা। এ বিষয়ে তারা প্রথম এ ধরনের মতামত প্রদান করেছে যে, কোনো ইবাদাতের সওয়াব মৃত ব্যক্তিদের পাঠালে পৌঁছবে না। সুতরাং এ বিষয়ে জুমহুর উলামায়ে কেরামের উপস্থাপিত দলীলসমূহ সামনে আনা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ লেখায় খুব সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়টির কয়েকটি দিক নিয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে।

---

* মুদাররিস, মা’হাদুল বুহূসিল ইসলামিয়া, ঢাকা

যে কোনো নেক আমলের সওয়াব মায়্যিতের নিকট পৌঁছার দলীল

(১)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ» ، ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ» ، فَفَعَلَتْ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ».

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর উদ্দেশ্যে একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা আনার নির্দেশ দিলেন। যে দুম্বা কালোতে হাঁটে, কালোতে বসে, কালোতে দেখে (অর্থাৎ দুম্বাটির হাত-পা, পশ্চাদ্দেশ এবং চোখের রং কালো)। এরপর কুরবানীর জন্য সেটিকে নিয়ে আসা হলো। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! ছুরি আনো। এরপর বললেন, এটিকে পাথরে ধার দাও। তিনি তা করলেন। এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরি হাতে নিলেন এবং দুম্বাটিকে ধরে শোয়ালেন। তারপর জবাই করতে উদ্যত হলেন এবং বললেন, (অর্থ) আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! তুমি কবুল করো মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে, মুহাম্মাদের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং মুহাম্মাদের উম্মতের পক্ষ থেকে। এরপর তিনি কুরবানী সম্পন্ন করলেন। (সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৯৬৭)

লক্ষণীয় যে, এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের পক্ষ থেকেও কুরবানী করেছেন। কুরবানীর এই ঘটনাটি মদীনায় ঘটেছে। অর্থাৎ এর পূর্বেই অনেক মুসলমানের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তারাও উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত মুসলমানগণও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীটি করেছেন।

(২)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমার আম্মা হঠাৎ ইন্তিকাল করেছেন। আমার ধারণা, তিনি যদি কথা বলার সুযোগ পেতেন, তাহলে সাদাকা করতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সাদাকা করি, তাহলে কি তিনি সওয়াব পাবেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। (সহীহ বুখারী; হাদীস ১০০৪, সহীহ মুসলিম; হাদীস ১৩৮৮)

(৩) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার একটি বর্ণনায় আছে,

নিশ্চয় মা-বাবার জীবদ্দশায় সদাচরণের পর মৃতাবস্থায় সদাচরণের অংশ এই যে, তুমি তোমার নামাযের সাথে তাদের পক্ষ থেকেও নামায পড়বে, তোমার রোযার সাথে তাদের পক্ষ থেকেও রোযা রাখবে, তোমার সদকায় তাদের পক্ষ থেকেও সদকা করবে। (হাদীস ১২০৮৪)

(৪) সুনানে আবূ দাউদের একটি বর্ণনায় আছে,

তোমরা মৃতদের জন্য সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করো। (হাদীস ৩১২১)

বর্ণনা দু'টির সনদ দুর্বল। তবে এখানে সমর্থক বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করা হলো।

(৫) তাবারানী কাবীরে (১৯/২২০) হযরত আলা ইবনু লাজলাজ রাযি. সূত্রে দাফনের পর মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে সূরা বাকারার শুরু অংশ আর পায়ের দিকে সূরা বাকারার শেষাংশ পাঠ করার বর্ণনা উল্লিখিত হয়েছে। এ বর্ণনা সম্পর্কে আল্লামা হাইসামী রহ. বলেন, এর বর্ণনাকারীগণকে সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এসব বর্ণনা এবং এ জাতীয় বহু বর্ণনাকে সামনে রেখে আল্লামা কামাল ইবনুল হুমাম রহ. বলেন,

فهذه الأثار وما قبلها وما في السنة أيضا من نحوهما عن كثير قد تركناه لحال الطول يبلغ القدر المشترك بين الكل وهو أن من جعل شيئا من الصالحات لغيره نفعه الله به مبلغ التواتر

অর্থ : এ সকল বর্ণনা এবং এ জাতীয় বহু বর্ণনার থেকে বের হওয়া সারাংশ তথা 'যে ব্যক্তি নিজের কোনো নেক আমল অন্যের জন্য দান করে, আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে তাকে

উপকৃত করেন' এ বিষয়টি মুতাওয়াতির (বহুসূত্রতার কারণে অকাট্যভাবে প্রমাণিত) পর্যায়ে পৌঁছে যায়। (ফাতহুল ক্বদীর ৩/১৪২)

সব ধরনের আমল চাই শারীরিক হোক বা আর্থিক মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হবে

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মালেক ও শাফেয়ী রহ. এর মতানুযায়ী ঈসালে সওয়াবের বৈধতা শুধুমাত্র আর্থিক ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন- সাদাকা, হজ্ব। শারীরিক ইবাদাত যথা, নামায-রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না।

এ বিষয়ে হানাফী উলামায়ে কেরাম বলেন, ঈসালে সওয়াবের মূল দলীল এটিই যে, একজনের নেক আমল অন্য জনকে দেওয়া যায়। বিষয়টি যখন মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, তখন নামায, রোযা, হজ্ব, সাদাকাসহ অন্যান্য নেক আমল সবই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। কারণ আমলনামায় নেকি জমা হওয়ার বিচারে শারীরিক বা আর্থিক আমলসমূহের পার্থক্য নেই।

এখানে লক্ষণীয় হলো, কারও উপর ফরয বা ওয়াজিব হয়ে যাওয়া ইবাদাত অন্য কেউ নায়েব বা প্রতিনিধি হয়ে আদায় করতে পারবে কি না- সেক্ষেত্রে দুই ধরনের ইবাদাতে পার্থক্য আছে। যে কারণে একজনের উপর ফরয হওয়া নামায-রোযা অন্য কেউ আদায় করে দিলে তা উলামায়ে কেরাম বৈধ বলেন না। তবে যাকাত বা সাদাকা অথবা (অক্ষমতার ক্ষেত্রে) হজ্ব অন্যের পক্ষ থেকে আদায় করাকে তাঁরা বৈধ বলেন। কিন্তু ঈসালে সওয়াবের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ এখানে অন্যের দায়িত্ব আদায় করার জন্য নয়, বরং শুধু সওয়াব প্রেরণের জন্য অন্যের নিয়ত করে আমল করা হয়। আর সওয়াব অর্জনের দিক থেকে আর্থিক ও শারীরিক আমলসমূহের মধ্যে পার্থক্য নেই।

যে কারণে সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইগণের কাছেও পছন্দনীয় আলেম আল্লামা আমীর সান'আনী রহ. তাঁর গ্রন্থ 'সুবুলুস সালামে' (১/৫০৯) বলেন,

وذهب جماعة من أهل السنة والحنفية إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو أي أنواع القرب وهذا هو القول الأرجح دليلا

অর্থ : আহলুস সুন্নাহের একদল এবং হানাফী উলামায়ে কেরাম যেটা বলেন তথা মানুষ তার নেক আমল অন্যকে পৌঁছাতে পারে চাই আমলটি নামায হোক, রোযা হোক, হজ্ব হোক, সাদাকা হোক, তিলাওয়াতে কুরআন হোক, যিকির হোক কিংবা অন্য যে

কোনো নেক আমল হোক। এ বক্তব্যই দলীলের বিচারে অধিক অগ্রগণ্য।

শুধু সন্তান নয় যে কেউ ঈসালে সওয়াব করলে তা মৃত ব্যক্তিকে উপকৃত করবে

আমাদের উল্লিখিত প্রথম হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই পুরো উম্মতের জন্য ঈসালে সওয়াব করেছেন। এর মাধ্যমে যারা পূর্ব যুগে ঈসালে সওয়াবকে অস্বীকার করত তথা মু'তাযিলা এবং পরবর্তী যুগে যারা ঈসালে সওয়াবের বিষয়টি শুধু সন্তানের সাথে সীমাবদ্ধ করেন (অর্থাৎ সন্তানই শুধু ঈসালে সওয়াব করতে পারবে; অন্য কেউ নয়, তাঁদের বক্তব্যের জন্য দেখুন, আলবানী, আহকামুল জানায়িয; পৃষ্ঠা ১৭৩) তথা আল্লামা শাওকানী, আল-মানার সম্পাদক শাইখ রশীদ রেযা, শাইখ আলবানী রহ. প্রমুখ সকলের বক্তব্য খণ্ডন হয়ে গেল। উপরোক্ত হাদীসে যাদের জন্য ঈসালে সওয়াব করা হয়েছে, তাদের মধ্যে আছে পুরো উম্মত। শুধু বাবা-মা নয়।

ঈসালে সওয়াব সালাফের যুগে ছিল না মর্মে শাইখ আলবানী রহ. এর বক্তব্য

শাইখ আলবানী রহ. বলেন, ঈসালে সওয়াবের আমল সালাফের যুগে ছিলো না। সুতরাং তা পরিহার্য। (আহকামুল জানায়িয)

আমাদের আলোচ্য প্রথম হাদীসটিতে খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের আমল পাওয়ার পর এ কথাটিরও যৌক্তিকতা থাকে না।

এ বিষয়ে ষষ্ঠ শতাব্দির বরেণ্য আলেম আল্লামা কাসানী রহ. (মৃত্যু ৫৮৭ হি.) বলেন,

> وعليه عمل المسلمين من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من زيارة القبور وقراءة القرآن عليها والتكفين والصدقات والصوم والصلاة وجعل ثوابها للأموات
>
> অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের আমল চলে আসছে যে, তারা কবর যিয়ারত করে কুরআন পাঠ করেন এবং কাফন ও অন্যান্য জিনিসের সদকা, রোযা ও নামায পড়ে মৃতদের জন্য সওয়াব বখশে দেন। (বাদায়িউস সানায়ে' ২/২১২)

এছাড়া মৌলিকভাবে মৃত ব্যক্তিকে যে ঈসালে সওয়াব করা যায় এ বিষয়ে ইমাম নববী রহ. ইজমা উল্লেখ করেছেন। (শরহে নববী আলা সহীহি মুসলিম, ১৬৩১নং হাদীসের অধীনে)

ঈসালে সওয়াব অস্বীকারকারীদের আরো কিছু দলীলের খণ্ডন

কেউ কেউ কুরআনের আয়াত وأن ليس للإنسان إلا ما سعى এবং সহীহ মুসলিমের হাদীস إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلث اه সহ আরো কিছু নসকে ঈসালে সওয়াবের বিরুদ্ধে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা যৌক্তিক নয়। কারণ, আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে যে, 'মানুষের জন্য তাই শুধু হবে যা সে নিজে চেষ্টা করে কামাই করেছে' এটি ব্যাপক নয়। বরং মুকাইয়াদ বা সীমাযুক্ত। অর্থাৎ মানুষের জন্য শুধু তাই হবে যা সে নিজে চেষ্টা করে কামাই করেছে বা অন্য কেউ তাকে হাদিয়া দিয়েছে তথা পাঠিয়েছে। এই সীমাযুক্ত করা জরুরী। কারণ অনেক আয়াত ও হাদীসে স্পষ্ট আছে যে, একজন অন্যজনের জন্য দু'আ-ইস্তিগফার করতে পারে। তাতে তার উপকারও হয়। অনুরূপভাবে নবীজীর উম্মতের জন্য কুরবানী করার বিষয়টি বহুসূত্রে প্রমাণিত। যা দিয়ে উপরের আয়াতের ব্যাপকতা সীমাযুক্ত হয়ে যায়।

এমনিভাবে উপরের হাদীসের মধ্যে যে কথা বলা হয়েছে যে, 'মানুষের মৃত্যুর পর তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে তিনটি ছাড়া। সাদাকায়ে জারিয়া, তার ইলম যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।' এই হাদীসের মধ্যেই উপরের দাবীর খণ্ডন রয়েছে। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে তার নিজের আমল বন্ধ হয়ে যাবে শুধু তিনটি ছাড়া। এই তিনটিও তার নিজেরই আমল। কারণ সে এগুলোর কারণ বা মাধ্যম হয়েছে। তার নিজের আমল না হয়ে যদি অন্য কেউ হাদিয়া পাঠায় তবে সেটা পৌঁছবে না– তা এই হাদীস বলছে না। সুতরাং এই হাদীসের ব্যাপকতাও অন্যান্য বহু বর্ণনা দ্বারা সীমাযুক্ত। অর্থাৎ এই তিনটি ছাড়া তার নিজের আমল বন্ধ হয়ে যাবে। অন্য কেউ যদি তাকে হাদিয়া পাঠায় তাহলে তা বন্ধ হবে না। সেক্ষেত্রে সে তার দ্বারা উপকৃত হবে। যা অন্যান্য বহু আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত খণ্ডনের জন্য দেখুন ইবনুল কায়্যিম রহ. এর রচিত 'কিতাবুর রূহ' (পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭০), ফাতহুল কদীর, বাদায়িউস সানায়ে'সহ ফিকহে হানাফীর অন্যান্য কিতাবের বদলী হজ্ব সংক্রান্ত আলোচনা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে মা'হাদের ইলমী সফর

সূর্যাস্তের দেশে

মুহাম্মাদ উমর ফারূক*

সফর আরবী শব্দ। অর্থ পর্যটন। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ। যে পর্যটনের সাথে মিশে থাকে জানার আগ্রহ, সেটাকে বলে শিক্ষাসফর। সফর শব্দের পাশাপাশি শিক্ষা শব্দটাকেও আরবী করলে হয় 'ইলমী সফর'।

ফিকহ-ফাতাওয়া অনুশীলনের জন্য আমার ভর্তি হওয়া প্রতিষ্ঠান মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া দু'বছর অন্তর ইলমী সফরের আয়োজন করে থাকে। বিষয়টি জানার পর থেকেই সফরের প্রতীক্ষায় ছিলাম। সহপাঠীরা প্রায়ই আলোচনায় মেতে উঠত, কবে যাওয়া হবে সফরে, কোথায়ই বা যাওয়া হবে ইত্যকার আনন্দঘন নানা প্রশ্নে। আমি সফরের অজানা শিহরণে শিহরিত হই।

দেখতে দেখতে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার বিরতি শেষ। মাদরাসায় ফিরলাম। দরস হচ্ছে, দরস করছি। কিন্তু সফরের কোন আলোচনাই হয় না। শেষ পর্যন্ত আমরাই বলে ফেললাম– আমাদের প্রাণপ্রিয় উস্তাদ মাওলানা আরিফ স্যারকে। স্যার বললেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো নয়, আপাতত সফর হচ্ছে না। দু'আ করতে থাকেন, পরিস্থিতি ঠিক হলে যাওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ। তবে এর আগে পরামর্শ দিয়ে রাখতে পারেন, আপনারা কোথায় যেতে পছন্দ করেন। সাথী ভাইয়েরা তাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গাগুলো মনের পাতায় আঁকতে শুরু করলো। কারো পছন্দের জায়গা সুন্দরবন হয়ে হিরণ পয়েন্ট, কারো বান্দরবান, আবার কারো বা নারিকেল জিঞ্জিরা। অনেকের পছন্দের জায়গা হলো কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত আর হিমছড়ি পাহাড়।

কিছুদিন পর। হঠাৎ মুদীর সাহেব হুযূর সফর নিয়ে আলোচনায় বসলেন। বললেন, সবার আবেদন তো আর রক্ষা করা সম্ভব নয়, তবে যেটি মশওয়ারার মাধ্যমে চূড়ান্ত হয়েছে সেটা তোমরা সানন্দে গ্রহণ করবে তো? আমরা সমস্বরে বললাম– জি। হুযূর বললেন, সুন্দরবন হিরণ পয়েন্ট গেলে লম্বা সময় নিয়ে যেতে হবে– কিছুটা ব্যায়বহুলও বটে। আর বান্দরবান যাওয়ার যুৎসই সময় হলো বর্ষাকাল। এজন্য আমাদের ইলমী সফর ইনশাআল্লাহ চট্টগ্রামের বড় বড়

* ইফতা কোর্স সমাপনকারী শিক্ষার্থী-১৪৪০-৪১ হিজরী শিক্ষাবর্ষ; মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, ঢাকা

মাদরাসা এবং কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে হবে। যাওয়ার তারিখ পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে। নতুন করে মনে মনে জল্পনা কল্পনা করতে লাগলাম আর অপেক্ষার তাসবীহ-দানা গুণতে লাগলাম।

ইতোমধ্যে একদিন মুদীর সাহেব হুযূর সবাইকে বসতে বললেন। আমাদের চেহারায় আনন্দের ছাপ। হুযূরের ঠোঁটের কোণেও এক চিলতে হাসি। সফরের সময়টি জানিয়ে দিলেন– ইনশাআল্লাহ আমাদের ইলমী সফর ২৫ মার্চ রোজ সোমবার হবে। বৈঠক শেষে মুতালা'আ সেরে সময়মতো শুয়ে পড়লাম। আসন্ন সফরের নানা দিক নিয়ে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

২৫ মার্চ সোমবার। আসরের পর সফরের হিদায়াতী বয়ান করলেন মুদীর সাহেব হুযূর। আলোচনার বিষয়বস্তু সফরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, করণীয় ও সফর সংক্রান্ত কিছু আমল। হুযূরের বিশেষ কয়েকটি নসীহত নিম্নরূপ-

১. সফরের সুন্নাহ সম্পর্কে অবগত হওয়া।
২. পাহাড় ও সমুদ্র সম্পর্কিত আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে রাখা এবং সময়মত তা পাঠ করা।
৩. ইফতা বিভাগের দুই বর্ষ থেকে দু'জন আমীর নিযুক্ত করা।
৪. সাথী ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা। নিজের প্রয়োজনের চাইতে অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
৫. কাফেলার মুরব্বীদের তা'যীম ও খিদমতের ফিকির করা।
৬. নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখা।
৭. প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে সুন্নাত অনুযায়ী আমল করতে থাকা।
৮. আমীরের পূর্ণ আনুগত্য করা।
৯. কখনও দলচ্যুত না হওয়া।

হিদায়াতী বৈঠক চলাকালীনই মুদীর সাহেব হুযূর যাকারিয়া ভাই ও নিয়ামাতুল্লাহ ভাইকে সদরঘাটে পাঠিয়ে দিলেন। তারা গিয়ে আমাদের জন্য লঞ্চে জায়গা নির্দিষ্ট করে পরিপাটি করে রাখবেন। হুযূরদের জন্য কেবিনও ভাড়া করবেন।

হিদায়াতী বয়ান শেষ। আমরা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বাদ মাগরিব মুদীর সাহেব হুযূর আমাকে জামি'আ রাহমানিয়ার উস্তাদ মুফতী আহমাদুল্লাহ সাহেব হুযূরকে নিয়ে আসতে বলে নিজের কাজে মনোযোগী হলেন।

হুযূরকে আনতে জামি'আতুল আবরারে পৌঁছলাম। হুযূর মেইন গেটে অপেক্ষা করছিলেন। অল্প সময়ের ভেতরেই হুযূরকে মা'হাদে নিয়ে এলাম। কিছুক্ষণের

মধ্যেই আমীরে সফর জামি'আ রাহমানিয়ার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস ও নায়েবে মুহতামিম হযরতুল আল্লাম ইবরাহীম হিলাল সাহেবকে দেখতে পেলাম। যিনি আমাদের মাঝে 'বাবা' নামে পরিচিত। 'বাবা' আদরের সময় আদর করেন অতুলনীয়, আর শাসনের সময় করেন প্রজ্ঞাপূর্ণ শাসন। হুযূরের কোমল ও অনুপম চরিত্র মাধুরীর কারণে সব ছাত্রের হৃদয়ে হুযূরের প্রতি অগাধ ভালোবাসা বিদ্যমান। প্রাণপ্রিয় মুরুব্বীদ্বয়কে পেয়ে আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে গেল।

ইলমী সফরের মূল আকর্ষণ আল্লাহ ওয়ালাগণের সান্নিধ্য লাভ। মা'হাদের মুরুব্বীগণের মধ্য হতে দুইজন মহান বুযুর্গের সোহবত আমরা এই সফরে লাভ করছি। প্রথমজন হলেন জামি'আ রাহমানিয়ার নায়েবে মুহতামিম হযরত মাওলানা ইবরাহীম হিলাল সাহেব দা.বা.। অন্যজন জামি'আ রহমানিয়ার মুহাদ্দিস মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব দা.বা.। মা'হাদের আসাতিযায়ে কেরামের মধ্যে থাকছেন মুদীরে মা'হাদ হযরত মুফতী মাহমূদুল আমীন সাহেব, নাযেমে দারুল ইকামাহ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান খুলনাবী সাহেব, মাওলানা আমীরুল ইসলাম সাহেব, মাওলানা সুহাইল আহমাদ সাহেব। মা'হাদের কলমারচর শাখার জমিদাতা জনাব সিফাতুল্লাহ সাহেবও সহযাত্রী হয়ে এই সফরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

আমরা মোট সতেরজন। ইশার নামায আদায়ান্তে بِسۡمِ اللّٰهِ تَوَكَّلۡتُ عَلَى اللّٰهِ বলে মা'হাদ থেকে বের হলাম। বসিলা বড় মসজিদ ঘাটে সদরঘাট যাওয়ার জন্য ভাড়া করা ট্রলারটি আগে থেকেই উপস্থিত ছিল। আমরা গিয়ে ট্রলারে চড়ে বসলাম। নদী পথে সফরের মাসনূন দু'আ بِسۡمِ اللّٰهِ مَجۡرٖىهَا وَمُرۡسٰىهَا اِنَّ رَبِّیۡ لَغَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ পাঠ করলাম। সশব্দে একরাশ বাষ্প উদ্গীরণ করে ট্রলারটি চলা শুরু করল। গন্তব্য সদরঘাট। জল ছুঁই ছুঁই আনন্দে আমাদের সকলের চোখমুখে মুগ্ধতার আভা ফুটে উঠলো। আমরা নদীর দু' পাশে চোখ বুলাতে লাগলাম আর পরস্পর মতবিনিময় করতে লাগলাম। নতুন নতুন অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো।

সদরঘাট থেকে চাঁদপুরের লঞ্চে

সদরঘাটের লালকুঠি ঘাট। আমরা 'রফরফ-২' নামক লঞ্চে চাঁদপুরের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমাদের জন্য আগে থেকেই লঞ্চের পিছনের দিকে জায়গা নির্ধারণ করেছিলেন সহযাত্রী মাওলানা নিয়ামাতুল্লাহ ও মাওলানা যাকরিয়া। মুরুব্বী উস্তাদদ্বয়ের জন্য কেবিন নেওয়া হয়েছে।

ইচ্ছে করছে লঞ্চটাকে ঘুরে ফিরে দেখি। হুযূরের অনুমতি পেয়ে দেখতে গেলাম। বিরাট লঞ্চ। মনে হচ্ছে তিন তলা বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং পানির উপর ভেসে চলছে। দেখছি আর ভাবছি, পানির স্বাভাবিক রীতি হলো ভারি জিনিসকে গ্রাস করা। কিন্তু টনকে টন ওজনের লঞ্চটি কী স্বাচ্ছন্দেই না পানিতে ভেসে চলছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– 'আর আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হলো পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ।' (সূরা শূরা; আয়াত ৩২)

আল্লাহ তা'আলা সমুদ্র এবং নৌযানের প্রসঙ্গ তুলে বারবার মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন। বলেছেন– 'তিনিই আল্লাহ, (যিনি তোমাদের জন্য) সমুদ্রকে বশীভূত করে দিয়েছেন। যেন তার আদেশে তাতে নৌকাসমূহ চলাচল করতে পারে এবং তোমরা তার প্রদত্ত রিযিক অন্বেষণ করো আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।' (সূরা জাসিয়া; আয়াত ১২)

লঞ্চ পরিদর্শনের এক পর্যায়ে দেখলাম অনেকেই বিভিন্নভাবে নিজেদের মহামূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করছে, কেউ টিভির সামনে, কেউ হেডফোন কানে দিয়ে মেতে আছে সিনেমা-গানে। কিছু মানুষ আবার তাশ খেলায় মত্ত। বিষয়টা দেখে খুবই খারাপ লাগলো। মনে পড়ছিলো কুরআনে কারীমের সেই আয়াত– 'তিনিই তোমাদেরকে স্থল পথে নৌপথে পরিভ্রমণ করান। এমনকি যখন তোমরা নৌকায় আরোহী হও এবং নৌযানগুলো আরোহীদেরকে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে বয়ে নিয়ে চলে এবং এতে তারা আনন্দিত হয়, তখন তাদের উপর এক প্রচণ্ড বায়ু এসে হামলে পড়ে এবং সর্বদিক থেকে তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে। আর আরোহীরা মনে করে যে, তারা বিপদে বেষ্টিত হয়ে পড়েছে। তখন সবাই আল্লাহর ইবাদতে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডেকে বলে, আপনি যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দেন, আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাবো। (সূরা ইউনুস; আয়াত ২২)

আমাদের সাথীদের মধ্যে কেউ নামায পড়ছে। কেউ বই হাতে অধ্যয়ন করছে। কেউবা তাসবীহ হাতে যিকির করছে। আবার অনেকেই শেষ রাতে তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে জাগ্রত হওয়ার আশায় বিছানায় গা এলিয়েছে। রজনী তার আঁধার গুটিয়ে বিদায় নিচ্ছে। সুবহে সাদিকের সময় লঞ্চ চাঁদপুরের ঘাটে ভিড়ল। আমরা সফর সামগ্রী গুছিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে একটি নিস্তব্ধ পরিবেশ পেলাম। অটোরিক্সায় রওনা হলাম রেলওয়ে মদীনাতুল উলূমের উদ্দেশ্যে। রাস্তার দু'পাশে অল্প জনবসতি। চারদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার। আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে মাদরাসার গেইটের সামনে উপস্থিত পেলাম যাকারিয়া ভাইকে। তার বাড়ি সেখানেই। তিনি আগেই চলে এসেছেন।

বিশ্রামের জন্য মাদরাসার মেহমানখানা পরিপাটি করে রাখা ছিলো। কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই মাদরাসার এক ছাত্র এসে গেইট খুলল এবং আমাদের পথ দেখিয়ে মেহমানখানায় নিয়ে গেল। আমরা দ্রুত উযূ-ইস্তিঞ্জা সেরে তাহাজ্জুদে দাঁড়ালাম। পাশের রুমে হিফয বিভাগের ছাত্ররা কুরআন তিলাওয়াত করছে। কি এক নূরানী পরিবেশ। ফজরের আযান হলো। মাদরাসার পক্ষ থেকে হালকা কিছু আপ্যায়ন হল। এরপর আমীরে সফর আমাদের কিছু নসীহত করলেন। বললেন, মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের সূরা আনকাবূতে বলেছেন পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করতে। মূলত এ আয়াতের মর্মবাণীকে সামনে রেখেই মা'হাদ থেকে ইলমী সফরের আয়োজন করা হয়। সে হিসেবে আমরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে বের হয়েছি। এতদিন আমরা ইলমী পরিবেশে ছিলাম। এখন সফরের পরিবেশে বেরিয়েছি। তাই সফরের আদবের ব্যাপারে সবিশেষ যত্নবান হবো। পরস্পরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করবো। পরিবেশের সাথে একেবারে মিশে না গিয়ে নিজেদের আমলে মগ্ন থাকব। প্রত্যেক কাজে সুন্নাতকে প্রাধান্য দিবো। মোটকথা আমাদের সফরটা যাতে এ বার্তা বহন করে যে, বর্তমানেও সুন্নাতের সাথে ইলমী সফর করা সম্ভব।

মুদীর সাহেবের কথা শেষ হলো। ফজরের নামায শুরু ওয়াক্তে আদায় করে নিলাম। মুদীর সাহেব হিফয বিভাগের হুযূরকে মা'হাদ থেকে প্রকাশিত সাময়িকী 'বাতায়ন' ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার হাদিয়া দিয়ে বিদায় নিলেন। মাসনূন আমল করতে করতে রেলস্টেশনে উপস্থিত হলাম। যাকারিয়া ভাই পূর্ব থেকেই ট্রেনের টিকিট কেটে রেখেছিলেন। টিকিটগুলো খুলনার হুযূরকে বুঝিয়ে দিয়ে হুযূরদের থেকে বিদায় নিলেন। যাকারিয়া ভাই মূলত আমাদের সফরসঙ্গী নয়। যদিও তাকে আমাদের সাথে পূর্ণ সফর করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু মাদরাসা খোলা থাকার কারণে চাঁদপুর পর্যন্ত রাহবারী করার জন্য আমাদের সাথে এসেছিলেন। শেষবেলা যাকারিয়া ভাই আমাদের মেজবান হলেন– নিজের বাড়ি থেকে হালুয়া-রুটি, ডিম ভাজি তৈরি করে আনলেন। জাযাকাল্লাহু আহসানাল জাযা।

ভোর পাঁচটা। সকলেই ট্রেনে চড়লাম। উদ্দেশ্য আপাতত চট্টগ্রাম। ট্রেন আপন গতিতে চলতে লাগল। আমরা সূরা ইয়াসীনসহ অন্যান্য মা'মূলাত শেষ করে হালুয়া, রুটি দিয়ে সকালের নাস্তা করলাম। চারদিকে সকালের রঙ ছড়াতে লাগল। ট্রেন চলছে দ্রুত গতিতে। দু'পাশে ধান ক্ষেত। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি গাছ। মনোমুগ্ধকর গ্রামীণ দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম।

মুদীর সাহেবের নির্দেশে আলী আহমদ শের পাঠ করতে লাগলো। তার কণ্ঠ বগিতে ছড়িয়ে পড়তেই ভিন্ন এক পরিবেশ তৈরি হল। কেউ চোখ বুজে মাথা দোলাচ্ছে, কেউ আবার হেড়ে গলায় সুর মেলাচ্ছে।

লাকসামে ছোট্ট বিরতি হলো। খুলনার হুযূর আমাদের জন্য রুটি-কলা নিয়ে এলেন। বিরতি শেষ। ট্রেন ছুটছে। ক্লান্ত শরীর। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ লাল করছি। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর মুদীর সাহেব হুযূরের কণ্ঠ শোনা গেলো– ঐ যে পাহাড় দেখা যায়। নড়েচড়ে বসে ডানে বামে পাহাড় খুঁজতে লাগলাম। দূরে পাহাড়ের সারি নজরে এলো। প্রথম পাহাড় দেখা আমার। ট্রেন ছুটছে পাহাড়ের পথে। রাস্তার দুই পাশে বড় বড় গাছগুলো প্রাকৃতিক তোরণ সেজে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরপরই এই দৃশ্যের দেখা মিলল। কোনো কোনো পাহাড় রাস্তার একেবারে নিকটে। সবুজ শ্যামলে সুশোভিত পাহাড়ের দৃশ্য যত দেখি ততই দেখার আগ্রহ বাড়ে।

মনোমুগ্ধকর দৃশ্যগুলোকে সিফাতুল্লাহ ভাই ক্যামেরাবন্দী করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। আর আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের এ সৃষ্টি সৌন্দের্যের শোভা মনভরে উপলব্ধি করলাম এবং হৃদয় ক্যানভাসে এঁকে নিলাম।

দীর্ঘ সফর শেষে দুপুরের আগেই আমরা চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুদীর সাহেবের চাচা আব্দুর রাযযাক সাহেব চলে এলেন। তার নিজস্ব ভবন রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে। তিনি আমাদের জন্য মিনিবাস নিয়ে এলেন। পুরো চট্টগ্রাম সফরে তার মেহমানদারী আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। মুদীর সাহেব ও মুরুব্বীদ্বয়ের সাথে হুযূরের চাচার মুসাফাহা ও মুআনাকা হল। সকলেই দু'আ পাঠ করে গাড়িতে উঠলাম।

মেখল মাদরাসা

এবার আমাদের গন্তব্য মেখল মাদরাসা। রাহবার বড় ভাই মা'সূম যিনি একসময় মেখলেই অধ্যয়ন করেছেন। সফরসঙ্গী আলী আহমাদও মেখলে পড়াশুনা করেছে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চললাম মেখলের পথে। দুপুর ১২টার দিকে মেখল মাদরাসায় প্রবেশ করলাম। বড় মাদরাসা তবে কোথাও কোন ছাত্র দেখা যাচ্ছে না। মনে মনে ভাবছিলাম মাদরাসা হয়তো বন্ধ। একটু সামনেই ছিলো মসজিদ। মসজিদে উঁকি দিতেই থমকে দাঁড়ালাম। একী? বহু ছাত্র নীরবে মুতালা'আ করছে। পরিবেশটা খুবই চমৎকার লাগলো। প্রথমে আমরা মুফতীয়ে আযম আল্লামা ফয়জুল্লাহ রহ. এর নাতী মেখল মাদরাসার নাযেমে দারুল ইকামা মাওলানা ফুরকান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাদের দেখে অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত হলেন। মেহমানদারী করলেন।

তার অমায়িক আচার ব্যবহারে প্রীত হলাম। কথা প্রসঙ্গে ইবরাহীম হেলাল সাহেব মাওলানা ফুরকান সাহেবেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা দাওরায়ে হাদীস খুলেন না কেন? উত্তরে তিনি যা বললেন তাতে রীতিমতো থ' বনে গেলাম। বললেন, পাশেই হাটহাজারী মাদরাসা– এজন্য। এতো বড় মাদরাসা, হাজার হাজার ছাত্র, যোগ্য যোগ্য উস্তাদ তারপরও শুধু পাশের মাদরাসার প্রতি লক্ষ্য করে দাওরায়ে হাদীস খুলছেন না। বিষয়টি সত্যিই শিক্ষণীয়।

মুদীর সাহেব হুযূর কিছু নসীহত করার আবেদন করলেন। তিনি নসীহত করলেন, (ক) উস্তাদদের সম্মান করা, তাদের সাথে খারাপ আচরণ না করা এবং তাদের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা। (খ) একাগ্রতার সাথে মুতালাআ করা। (গ) যিম্মাদারী পালনার্থে বেশি বেশি তাবলীগের কাজ করা। (ঘ) সর্বপোরি সাহাবায়ে কেরামের মতো বেশি বেশি ইলম অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল করা এবং অন্যের কাছে পৌঁছানো।

মুহতামিম সাহেবের ছেলে মুফতী হাসান সাহেব বললেন, আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে আমাদের এখানে তাবলীগের কাজ শুরু হয়েছে। মজবুতভাবে তাবলীগের কাজ ও লেখাপড়া ছাড়া এখানে অন্য কোন শোগল নেই। চব্বিশ ঘণ্টার জামাআত বের হয় প্রতি সপ্তাহে। মুফতীয়ে আযমের ব্যাপারে বললেন, তিনি ভারসাম্যপূর্ণ মেযাজের মানুষ ছিলেন। মুফতী সাহেবের বড় হওয়ার দু'টি কারণ ছিলো। এক. আত্মসম্মানবোধ। হুযূরের বংশে টাকাওয়ালা ও বড় বড় ডিগ্রীধারী লোক ছিলেন। কিন্তু কোন সময় কারো কাছে মাদরাসার জন্য দান-সদকা, মান্নত, যাকাত, ইত্যাদি চাইতেন না; শুধু উদ্বুদ্ধ করতেন– যার ইচ্ছা হতো দিত। দুই. ইত্তিবায়ে সুন্নাত। ছোট থেকে ছোট সুন্নাতও তিনি আদায় করতেন। অসুস্থ অবস্থায় যখন তিনি নিজে মসজিদে যেতে পারতেন না, সাথীদেরকে বলতেন 'মসজিদে যাওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। তোমরা মসজিদে যাও। আমি অসুস্থ হওয়ার কারণে আমার থেকে মুয়াক্কাদার হুকুম সাকেত হয়ে গেছে। তোমাদের থেকে সাকেত হয়নি।' চমৎকার কিছু কারগুযারী শুনে মা'হাদ থেকে প্রকাশিত বাতায়ন ও স্থায়ী ক্যালেন্ডার হাদিয়া দিয়ে আমরা বিদায় হলাম।

মাদরাসা থেকে আনুমানিক ১০০ গজ উত্তরে মুফতীয়ে আযম রহ. এর নামে নির্মিত গ্রামের মসজিদের পাশে তার মাকবারা যিয়ারত করলাম। যিয়ারত শেষে মা'সূম ভাই বললেন, আমি যখন এই মাদরাসায় কাফিয়া বা শরহেজামী পড়ি তখন একবার হুযূরের কবর থেকে ঘ্রাণ বের হতে লাগলো। এ খবর আগে পাশে ছড়িয়ে পড়লো। এক পর্যায়ে আশঙ্কা হতে লাগলো, মানুষ এখান

থেকে মাটি নিয়ে যাবে। তাই সিদ্ধান্তক্রমে ছাত্ররা পাহারা দিতে লাগলো। যাতে বিদ'আত চালু না হয়ে যায়। এক পর্যায়ে কবর থেকে ঘ্রাণ বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেলো।

হাটহাজারী মাদরাসায়

গাড়ি চলছে হাটহাজারী মাদরাসা অভিমুখে। অল্প সময়ের ভিতরে আমরা মাদরাসার গেইটে পা রাখলাম। মুদীর সাহেব হুযূর প্রয়োজনীয় হাজত সেরে আমীরে হেফাযতে ইসলাম শাইখুল ইসলাম শাহ আহমদ শফী সাহেবের খানকায় একত্র হতে বললেন। এই সুযোগে আমি, মুফাসসাল ভাইসহ আরো অনেকেই দাওরায়ে হাদীসের কক্ষে ঢু দিলাম। যেখানে একসাথে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার তালিবুল ইলম একত্রে দরসে বসতে পারে। হাদীসের দরসগাহ দেখে মনটা ভরে গেলো। হুযূরদের বসার জন্য বিরাট এক শাহী আসন।

ঘুরে ঘুরে দেখছি। এরই মধ্যে দেখি যুবায়ের, মুশাররফ ও আমীর হুসাইন ভাই ইফতা বিভাগে ঢুকে কিতাবাদি পরিদর্শন করছে। ঠিক সময়ে আমরা হযরতের খানকাতে একত্র হয়ে যোহর নামায আদায় করলাম। নামায আদায়ান্তে মুদীর সাহেব আমাদেরকে আহমদ শফী সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য একত্র করলেন। কিছু সাথী দলচ্যুত হয়ে এখনো মাদরাসা পরিদর্শন করছে। হুযূর ধমকের স্বরে বললেন, দলচ্যুত হলে বরকত থেকে এভাবেই বঞ্চিত হতে হয়।

হুযূর আমাদেরকে আল্লামা আহমাদ শফী সাহেব হুযূরের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। শাইখের অনুমতি নিয়ে খাস রুমে প্রবেশ করলাম। হুযূরকে দেখামাত্র ভক্তি শ্রদ্ধায় অন্তর কানায় কানায় পূর্ণ হলো। হুযূর শারীরিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল। তার পরেও আমাদের সাথে একের পর এক মুসাফাহা ও মু'আনাকা করছেন। সামনে রাজবাড়ীর হুযূর মুআনাকা করছেন। একজনের পরেই আমি। আনন্দের ক্ষণ সমাগত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, রাজবাড়ী হুযূর পর্যন্ত মুআনাকার ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেল। এখন হুযূর শুধু মুসাফাহা করবেন। এ আফসোস কখনো শেষ হবার নয়। হুযূরের নির্দেশে আমরা অপূর্ণতা ও অতৃপ্তির অনুভূতি নিয়ে বের হলাম। আল্লাহ তা'আলা হুযূরকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন।

মুদীর সাহেব আমাদেরকে আরেক প্রবীণ মুরুব্বী মুফতীয়ে আযম আল্লামা আব্দুস সালাম চাটগামী সাহেব দা.বা. এর মুলাকাতের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। মা'হাদের প্রধান মুফতী মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা. চাটগামী সাহেবের অন্যতম ছাত্র। চাটগামী সাহেবের অনেক নাম শুনেছি, অধ্যয়ন

করেছি তার লিখিত অনেক কিতাব। বুকভরা আনন্দ নিয়ে হুযূরের কক্ষে প্রবেশ করলাম। হুযূর অসুস্থ, তার পরও মুখভরা হাসি নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের সাথে মুসাফাহা করলেন। হুযূরের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, অমায়িক হৃদ্যতা, সরল আলাপচারিতা প্রথম সাক্ষাতেই আমাদেরকে তার ভালবাসার ডোরে বেঁধে ফেলল। চাটগামী সাহেব সবাইকে তার লিখিত কিতাব কুরবানির মাসায়েল এবং ইফতা বিভাগের জন্য একসেট জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া হাদিয়া দিলেন। হুযূর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তবুও ক্ষীণ আওয়াযে আসাতিযায়ে কেরামের সাথে মতবিনিময় করলেন। হুযূরের নেক দু'আ নিয়ে বিদায় নিলাম। আল্লাহ তা'আলা হুযূরকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে আরো দীর্ঘ দিন দীনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমরা সকলেই মাদরাসার সামনের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছি। মুদীর সাহেব আমাদেরকে নিয়ে আশে পাশে ঘুরিয়ে দেখালেন। মাদরাসার পশ্চিম বিল্ডিংয়ের পেছনে কবরস্থানে মুফতী হারুন সাহেব রহ.-সহ প্রবীণ উলামায়ে কেরাম আরামের নিদ্রায় শায়িত আছেন। আল্লাহওয়ালাদের সমাধি যিয়ারত করে আমরা পেছনের গেইট দিয়ে বের হলাম। গেটের পাশেই আমাদের বাস দাঁড়িয়ে আছে। রওয়ানা হলাম চট্টগাম ইউনিভার্সিটির উদ্দেশে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এখন রাহবার মুদীর সাহেবের চাচা জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব। ড্রাইভার অনেক দ্রুত গাড়ি হাঁকাতে চেয়েও ব্যর্থ হলেন। কারণ, সব ড্রাইভারই চায় একই সঙ্গে আগে যেতে। তাতেই বাধে এত যানজট। একপা সামনে দু'পা পিছনে করে করে অবশেষে জ্যামের হাত থেকে রক্ষা হলো। গাড়ি এখন দুর্দান্ত গতিতে ছুটছে। আর চারদিকের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যগুলো অবলোকন করছি আমরা। গাড়ি ইউনিভার্সিটির এরিয়াতে প্রবেশ করলো। ভার্সিটির শিক্ষার্থী মুদীর সাহেবের ভাগিনা আবূ সাঈদ মারজান দু'জন সহপাঠি সমেত আমাদের অভ্যর্থনায় উপস্থিত। কুশলাদি শেষে আমাদেরকে সোজা ভার্সিটির আভ্যন্তরীণ খাবারের ক্যান্টিনে নিয়ে যাওয়া হলো।

ভার্সিটির নিরিবিলি ক্যান্টিন। শুধু আমরাই খাচ্ছি। পরিবেশ ও পরিবেশন বেশ চমৎকার। সবাই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে আল্লাহর শুকর আদায় করলাম– আলহামদুলিল্লাহ। মুদীর সাহেব তার ভাগিনাকে নায়েব সাহেবের কাছে নিয়ে এলেন দু'আ নেওয়ার জন্য। নায়েব সাহেব তাকে সংক্ষিপ্ত নসিহত করে দু'আ করে দিলেন। হুযূরের চাচা আমাদেরকে ভার্সিটির পুরো এরিয়া বাস যোগে ঘুরিয়ে দেখালেন। অনেক বড় এরিয়া। রাস্তা অনেক আঁকাবাঁকা এবং উচুঁনিচু।

রাস্তার দুই ধারের বড় বড় বৃক্ষের অভিভাবকত্বে ছোট ছোট অনেক গাছ-গাছালি। মাঝে মাঝে দৃষ্টিনন্দন লতাপাতার অনেক ঝোপঝাড় দেখা যায়। বেশ খানিক পরে খেলার বিশাল মাঠ। আবার শুরু হয় পাহাড়ের সবুজ শ্যামল দৃশ্য। যতই দেখি ততই দেখার আগ্রহ বাড়ে। প্রত্যেক দৃষ্টিতে নতুন কিছু খুঁজি আর নতুনত্ব অনুভব করি। মাঝে মধ্যেই পাহাড়ের দৃশ্য। যার বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধ গাছ। রাস্তার ধারে হঠাৎ পড়ল আব্দুল আযীয সাহেবের মনোহরি দোকান। গাড়ি থামানো হলো। প্রচণ্ড গরমের ভিতরে কোল্ড-ড্রিংক আপ্যায়নে আমাদের অন্তর প্রশান্ত হলো। এখান থেকেই তিনি আমাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ইউনিভার্সিটির সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বরোডে উঠলাম।

পটিয়া মাদরাসায় হাযিরি

এখন গাড়ী চলবে বিরতিহীন। উদ্দেশ্যে পটিয়া মাদরাসা। বাস আপন গতিতে চলছে। কিছুক্ষণ পর থামল। ভিতরে বাস যাবে না– মূল রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল। আমরা হাঁটতে লাগলাম। দশ পনের মিনিট হাঁটার পরেই পাঁচটা তিন মিনিটে পটিয়া মাদরাসার মূল ফটকে পা রাখলাম। এতক্ষণে আসরের নামায শেষ হয়ে গেছে। ছাত্ররা মসজিদ থেকে বের হচ্ছে। হঠাৎ একজন নূরানী চেহারার অধিকারী মুরুব্বী হুযূরকে দেখতে পেলাম। ইফতা বিভাগের মুশরিফ মুফতী মুজাফফর আহমদ সাহেব। মুফতী সাহেবের সাথে আমরা সকলেই মুসাফাহা করলাম। আমাদের পরিচয় পেশ করলাম। হুযুর আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন।

আমাদের এখনো আসরের নামায পড়া হয়নি। তাই হুযূরের কাছ থেকে দ্রুত বিদায় নিয়ে জরুরত সারলাম। মাঠের দক্ষিণ পাশের লাইব্রেরী ভবনের পেছনে একটি বিশাল পুকুর। চমৎকার শান বাঁধানো ঘাট। আমরা দু' পায়ের গোড়ালী ডুবিয়ে উযূ করলাম। শীতল পানির ছোঁয়ায় ক্লান্তি কেটে গেল। এরপর জামিয়ার মসজিদে নামায আদায় করলাম।

১৩৫৭ হিজরীতে মুফতী আজীজুল হক রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামি'আ কাসিমুল উলূম পটিয়ার বর্তমান মুহতামিম হলেন মাওলানা আব্দুল হালীম দা.বা.। বর্তমানে এই জামিয়া দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষা-দীক্ষার বহুমুখি কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক, সেবামূলক, জনকল্যাণমূলক ও অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে অবদান রেখে যাচ্ছে। এ জামি'আর কথা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু দেখার সৌভাগ্য হয়নি। মনভরে উপভোগ করছি। মাদ্রাসার মাঠটি বেশ প্রশস্ত। দু'পাশে বিশাল বিশাল ভবন। উত্তর পাশে মসজিদ। মাদরাসার দক্ষিণ দিকের ভবনের দেয়ালে দুটি শের লেখা দেখলাম–

تجلت رياض العلم دام بقاءها — وضا ءت وما زالت تزيد ضياءها

وقد شادها الشيخ البخاري ساعيا — فطابت جهود الشيخ طاب جزاءها

জামিয়া পটিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, একাত্তরে ছাব্বিশে মার্চ চট্টগ্রামে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পর তা হানাদার বাহিনীর আক্রমণের ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। তখন নিরাপত্তার কথা ভেবে মেজর জিয়াউর রহমান বেতারের যন্ত্রপাতি ও সৈন্যদের নিয়ে এই জামিয়ায় চলে আসেন। ফলে জামিয়া হানাদার বাহিনীর রোষানালে পড়ে যায়। তাদের আক্রমণে সেদিন শহীদ হন জামিয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা দানিশ রহ. এবং আহত হন কয়েকজন উস্তাদ। সাংবাদিক শাকের হুসাইন শিবলি তার 'আলেম মুক্তিযোদ্ধার সন্ধানে' বইতে এসব তথ্য উল্লেখ করেছেন।

কক্সবাজার অভিমুখে

মাগরিবের আগেই পটিয়া মাদরাসা থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ির মুক্ত গতি এখন কক্সবাজার অভিমুখে। মাগরিবের নামায মসজিদুশ শুহাদা কেরানীহাটে আদায় করলাম। নামায আদায়ান্তে গাড়ি চলছে। আমরা মাসনূন আ'মাল আদায় করছি। ক্লান্তিতে অনেকেরই চোখ ঢুলু ঢুলু। আমাদের কয়েকজনের এক প্রস্থ ঘুমও হয়েছে। গাড়ি ততক্ষণে কক্সবাজারে প্রবেশ করলো।

রাত ১০টা। গাড়ি থামলো শামস প্লাজার সামনে। ঢাকা থেকেই আমাদের রুম বুকিং দেওয়া হয়েছে শামস প্লাজায়। সাত তলা দালান। মুদীর সাহেব হুযূর নেমে রিসিপশনে গিয়ে কর্তব্যরত ভদ্রলোকের সাথে আলাপ করলেন। হোটেল মালিক জনাব শাহিন পারভেজ সাহেব। ঢাকার শাহজাহানপুর ঝিল মসজিদ এলাকার বাসিন্দা। মুদীর সাহেব হুযূরের তারাবীহর মুসল্লী। সে থেকে হুযূরের সাথে ঘনিষ্টতা। আমরা গাড়ি থেকে নেমে রিসিপশনে বসলাম। একটুপর এক ভদ্রলোক আমাদেরকে হোটেলের ভেতরে নিয়ে চললেন। মুরুব্বী উস্তাদগণ হোটেল মালিকের একটি নতুন হোটেল 'সিলভার বে'-তে অবস্থান করলেন। মালিক চাচ্ছিলেন বুযুর্গদের দ্বারা তার হোটেলটি বরকতময় হয়ে যাক। আমরা নিজ নিজ কামরায় জামাআতের সাথে ইশার নামায আদায় করে সকলেই নিচ তলায় একত্র হয়ে রাতের খাবারের জন্য হোটেলে প্রবেশ করলাম।

তাজা সামুদ্রিক কোরাল মাছ, সবজি, ডাল দিয়ে বেশ ভালো একটা খানা হলো। খাবার শেষে যার যার কক্ষে ফিরে গেলাম। আমি বাইরের দৃশ্য দেখার জন্য বেলকনিতে গেলাম। সমুদ্রের শো শো গর্জন শোনা যাচ্ছে। মন চাইল

উঁকি দিয়ে সাগর দেখি। কিন্তু অনেক চেষ্টার পরও দেখতে পেলাম না। অবশেষে সকালে দেখার ইচ্ছা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম।

স্বপ্নের সমুদ্র সৈকত

ফজরের নামায শেষে নিচ তলায় এলাম। সমুদ্র সৈকতে যাওয়া হবে। সমুদ্র থেকে আধা কি.মি. থেকেও কম দূরত্বে আমাদের হোটেল। পায়ে হেঁটেই চলছি। রাস্তার বাম পাশে বেশ কিছু নতুন স্থাপনা। দূর থেকেই সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন শুনতে পেলাম। আমাদের ভিতরেও আনন্দের ঢেউ বইতে লাগলো। বড় বড় পা ফেলে সবাই একদম সাগরের তীরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাগরের গর্জন আর ঊর্মিমালার সাথে এই প্রথম পরিচয়। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ঢেউ আর ঢেউ। তবে দূরের ঢেউগুলো সরাসরি কিনারায় আসে না। কিছুদূর এগিয়ে এসে ভেঙ্গে পড়ে। আবার নতুন উদ্যমে ফুসে ওঠে। এক সময় এসে আছড়ে পড়ে কূলে। চোখের পাতা খুলে দিয়ে যতোটা সম্ভব বড় করে সাগরের শেষ সীমানা দেখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম।

মুদীর সাহেব মোবাইলে সমুদ্র সংক্রান্ত আয়াত বের করে বড় ভাই মা'সূমকে দিলেন। তিনি সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত শুরু করলেন। আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি। হাজার বছর পরেও এতো বাস্তব, এতো জীবন্ত, এতো মর্মস্পর্শী– মহামহিম খোদার বাণী!

পর্যটকদের আনাগোনা ধীরে ধীরে বেড়েই চলছে। সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আমাদের মতো সাগরের অপরূপ কুদরতী শোভার দিকেই দর্শনার্থীরা তাকিয়ে আছে। কুদরত এবং কৃত্রিমতার মধ্যকার এই বিস্তর ফারাক সত্যান্বেষীদের সত্যের সন্ধান দেয়, জ্ঞানীদের আরো জ্ঞানী করে তোলে। কৃত্রিম সৃষ্টির সৌন্দর্য শোভা এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু কুদরতী সৃষ্টির রূপ-লাবণ্যের শেষ নেই। ১৫৫ কি.মি. দৈর্ঘ্য বিশ্বের সর্ববৃহৎ সমুদ্র সৈকতের কুদরতী সৌন্দর্য দেখার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক পর্যটকের আগমন ঘটে শীতকালে। তখন বেলাভূমি থাকে অনেক বিস্তৃত। সাগরের মেজায থাকে প্রশান্ত। পানিও থাকে স্বচ্ছ।

এখন সাগর অশান্ত, অস্থির ও উন্মাদ। কোন বাধা মানতে চায় না, সব গ্রাস করে নিতে চায়। এই সমুদ্রের সোজা দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। এখানে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ নামে কিছু দ্বীপ রয়েছে। এখানে অল্প হলেও বসতি রয়েছে। এই দ্বীপেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের লড়াকু সৈনিক উলামায়ে কেরামকে বন্দি করে রাখা হয়েছিলো। এ দ্বীপপুঞ্জের পরে রয়েছে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ভারত মহাসাগরের পর দক্ষিণ মহাসাগরের পর রয়েছে এন্টার্কটিকা মহাদেশ।

সোজাসোজি পশ্চিমে বরিশাল ভোলা, বরগুনা, খুলনা ঘেঁসে ভারত এবং বামে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ঘেঁষে মায়ানমারের অবস্থান।

কিছুক্ষণ সাগর তীরের কুদরতী সৌন্দর্য অবলোকন করে হোটেলের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। তবে মন সেই সাগর তীরেই পড়ে রইল। মুদীর সাহেব আমীরে সফরের সাথে পরামর্শ করলেন। এখন যদি আমরা পাহাড়ে যাই তাহলে সেখানকার পরিবেশ কিছুটা গুনাহমুক্ত পাবো বলে আশা করা যায়। হুযূর বললেন– ঠিক আছে, নাস্তার পরে যাওয়া যায়।

সাগরের তীরে অবস্থিত বৈশাখী হোটেলে সাতটা পাঁচ মিনিটে নাস্তা করলাম। নাস্তার শুরুতে মুদীর সাহেব নিয়ামাতুল্লাহকে পাহাড় সংক্রান্ত আয়াত তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিলেন। আমরা নাস্তার পরেই হিমছড়ি পাহাড়ে যাবো।

হিমছড়ির উচ্চতায়

হিমছড়ি। কক্সবাজার থেকে বারো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি পর্যটন স্থল। দেশের একমাত্র শীতল পানির ঝরণা এখানেই আছে। নামকরণ থেকেও বিষয়টি আঁচ করা যায়। হিম মানে শীতল আর ছড়ি মানে ঝরণা।

দু'টি লেগুনা ভাড়া করা হলো। উঠে বসলাম। গাড়ি দু'টি দ্রুত চলতে লাগল পাহাড় কাটা রাস্তার বুকের উপর দিয়ে। রাস্তার ডানে সমুদ্র আর বামে পাহাড়গুলো একদম খাড়া প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে একটু পরপর। সমুদ্র থেকে বয়ে আসা বাতাস আমাদের ক্লান্তি মুছে দিচ্ছিল। সাগরের নীল পানি ও শুভ্র ফেনা গাড়ির জানালা দিয়ে সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

হিমছড়ি পাহাড় ঘেষে অবস্থিত মসজিদে একটি চিল্লার জামাআত ছিলো। জামাআতটি ময়মনসিংহের এইচ.এস.সি. সমাপনকারী ছাত্রদের। মা'হাদের উস্তাদ রাজশাহীর হুযূর আমীরে সফরকে নিয়ে সেখানে গেলেন। সেখানে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু নসীহত করা হলো।

পাহাড়ের চূড়া ও ঝর্ণায় প্রবেশের জন্য টিকিট গ্রহণ করতে হয়। মূল্য বিশ টাকা। মুদীর সাহেব হুযূর সকলের জন্য টিকিট গ্রহণ করলেন। আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। উপরে চড়ার জন্য সিঁড়ি তৈরি করা আছে। কৃত্রিম আঁকাবাঁকা সিড়ি। মুরুব্বিগণ সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। কয়েক ধাপ উঠতেই মুরুব্বিদের ভিতর ক্লান্তি ভাব দেখা যাচ্ছে। আমীরে সফর মুশার্‌রফ হুসাইনকে ভর করে করে উঠছেন আর বলছেন 'এবারই মনে হয় শেষ পাহাড়ে ওঠা'।

আমরা কিছু তরুণ অন্যদের আগেই পাহাড়ে উঠে গেছি। বসে বসে ক্লান্তি দূর করছি। ইতোমধ্যেই কয়েকজন দ্বিতীয় পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছে। একদম খাড়া

রাস্তা। তরুণদের জন্য এই রাস্তা বেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতেই যেন আনন্দ। আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে কে কত আগে উঠতে পারে। অসতর্কতায় পা পিছলে গেলে আহত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা। হঠাৎ মুশাররফ দ্বিতীয় পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল। তবে আল্লাহর মেহেরবানীতে কোন ক্ষতি হয়নি। একেকটি পাহাড় অপরটার তুলনায় অনেক উঁচু। দেখতে দেখতে তৃতীয় পহাড়ের চূড়ায় আমি, হুসাইন, আব্দুল হালীম, মুফাস্‌সাল, নূরে আলম সহ আরো অনেকে উঠে গেলাম। এদিকে আমীর হুসাইন আমাদের পেরিয়ে চতুর্থ পাহাড়ে উঠা শুরু করেছেন। ইতোমধ্যেই রাজবাড়ী হুযূর সকলকেই প্রথম পাহাড়ে একত্র হওয়ার ধ্বনি ছাড়লেন। এবার আমাদের ছোটার পালা। আমরা পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে একটি সরু পথে চললাম। উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা এই রাস্তায় লোকজন কম। আশেপাশে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। কিছুটা ভয় অনুভব করছিলাম। এক পর্যায়ে প্রথম পাহাড়ে পৌঁছে গেলাম।

প্রথম পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছি। মুহিব্বুল্লাহর বাইনোকুলার সাথীদের হাতে হাতে ফিরছে। বাইনোকুলারের মাধ্যমে আরো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, ঢেউগুলো উঁচু হয়ে তীরে এসে একরাশ ফেনা ছড়িয়ে সশব্দে ভেঙ্গে পড়ছে।

যতক্ষণ সুযোগ হলো সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই রইলাম। হঠাৎ মুদীর সাহেব বললেন, সবাই একত্র হও। হুযূরের আদেশ পালনার্থে সবাই প্রথম পাহাড়ের চূড়ার এক জীর্ণ বৈঠকখানায় একত্র হলাম।

খুলনাবী হুযূর মোবাইল থেকে পাহাড় সংক্রান্ত আয়াত বের করে বড় ভাই রাইহান মাহফুজকে তিলাওয়াত করার জন্য দিলেন। সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করছেন আর অর্থ বলছেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছি। তিলাওয়াতের পর নসীহত করলেন আহমাদুল্লাহ সাহেব ও মুদীর সাহেব। যার সারমর্ম হলো-

হামদ সালাতের পর...। আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃজনের মাঝে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান; আয়াত ১৯০)

তাইতো বলা হয়, সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টার সন্ধান মেলে। প্রতিটি বস্তুতে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়। তারা এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহই। কবি কতইনা সুন্দর বলেছেন–

حجر میں شجر میں تیرے رنگ و بو ہے،

جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔

আল্লাহ তা'আলা এই সকল পাহাড়গুলোকে যমীনে পেরেক স্বরূপ সৃজন করেছেন। যদি এই সকল পাহাড় না থাকত তাহলে যমীন নড়াচড়া করত। পাহাড়ের মাধ্যমে যমীন স্থির রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন–

> 'এবং পর্বতসমূহকে সৃজন করেছি পেরেক স্বরূপ।' (সূরা নাবা; আয়াত ৯)

আমরা যে সমুদ্র দেখছি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার উপর অনেক বড় নিয়ামত। যদি কৃত্রিম উপায়ে লবণাক্ত করতে হতো, তাহলে তা কত ব্যয়বহুল হতো? আদৌ কি এরকম সমুদ্র বানানো সম্ভব হতো? সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়াতে যত ময়লা আবর্জনা তাতে পতিত হয় সেটাকে লবণ গ্রাস করে ক্ষতিকর ধাতুকে নিচে নিক্ষপ করে পানিকে স্বচ্ছ রাখে। আল্লাহ তা'আলা সেই স্বচ্ছ পানি বাষ্পের মাধ্যমে উঠিয়ে নিয়ে যেখানে যতটুকু প্রয়োজন বৃষ্টির আকারে দিচ্ছেন। এগুলো দেখলে একদিকে যেমন আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব অন্তরে জাগ্রত হয়, তেমনি কিয়ামতের ভয়াবহতা চোখের সামনে ফুটে ওঠে। আশ্চর্য মনে হয় যে, এত বিশাল পাহাড় কীভাবে ধূনিত তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন–

> 'যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়বে, ফলে তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়।' (সূরা ওয়াকিয়া; আয়াত ৪-৬)

কতইনা ভয়াবহ হবে সেই দৃশ্য। হে আল্লাহ! সেদিন আসার পূর্বেই আমাদের সকলকে প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফীক দান করুন।

পরিশেষে আমীরে সফর দু'হাত উঠালেন। আমরাও হাত উঠালাম। কেঁদে কেঁদে পুরো জগতবাসীর জন্য দু'আ করলাম। দু'আ শেষে পাহাড় চূড়া থেকে সুবহানাল্লাহ বলতে বলতে নামছি। হযরত আহমাদুল্লাহ সাহেব হুযূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে পাঠ করলেন–

> 'পাথরও কতক এমন যে, উহা হইতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এইরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর উহা হইতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন যাহা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে।' (সূরা বাকারা; আয়াত ৭৪)

ঝর্ণার কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম কিছু লোক ঝর্ণার পানি নিয়ে খেলা করছে। প্রায় পনেরো ফুট উপর থেকে ঝর্ণার পানি সানন্দে তাদের হাতের উপর লাফিয়ে পড়ছে। জামার হাতা গুটিয়ে ঝর্ণার দিকে গেলাম। দূর থেকে হাত বাড়িয়ে অল্প কিছু পানি ছুঁয়ে দেখলাম। সকলেই খুব আনন্দিত হলো।

কয়েকজন সাথী কিছু কেনাকাটা করলেন। এরপর সবাই লেগুনায় উঠে বসলাম। রাস্তায় আগের তুলনায় জ্যাম। পর্যটকদের আনাগোনা। পাহাড়, সাগর, ঝর্ণাধারার মাঝ দিয়ে ফিরে চললাম হোটেলের দিকে।

সমুদ্র সৈকতে গোসল

মুদীর সাহেব আমাদের একত্র করে রাজবাড়ী হুযূরকে আমীর নিযুক্ত করে সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। মুদীর সাহেব সাবধান করলেন– 'কারো নাম যেন ইতিহাসের পাতায় না ওঠে, সাগরের ঢেউ অনেক মায়ের কোল খালি করেছে। এজন্য সাগরের পানিতে যারা নামতে চাও তাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। তীরের ঢেউ যখন সাগরের গর্ভে ফিরে যায় তখন পায়ের নিচের বালুও সরে যায়। তখন অসতর্ক থাকলে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। পায়ের নিচের বালু সরে যাওয়ার সাথে সাথে ঢেউয়ের সাথে চলে যায়।'

ছুটলাম দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশিত সমুদ্র সৈকতে গোসলের জন্য। সাগর তীরে গিয়ে দেখি, দ্বিতীয় বর্ষের বড় ভায়েরা আগেই চলে এসেছেন। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে চশমাটি না খুলেই সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঢেউয়ের সাথে তাল মিলিয়ে দ্বিতীয় বার লাফ দিয়ে দেখি আমার চশমাটি আর নেই। মনে মনে ভাবলাম, ইতিহাসের পাতায় আমার নাম না উঠলেও হৃদয় ক্যানভাসে চশমাটি লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে। এই সান্ত্বনা নিয়ে সাথীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করছি। সাগরের তীরে হাঁটু পানিতেই নিয়ামাতুল্লাহ একা একা হাঁটছে আর আমাদের দেখে মজা নিচ্ছে। শুনেছিলাম, সমুদ্রের পানি নাকি ভীষণ লবণাক্ত। একটু চেখে দেখলাম। আসলেই অসম্ভব রকম নোনা। দীর্ঘ সময় গোসল করার পর অতৃপ্ত থেকেই গোসল শেষ করলাম।

আমাদের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ। সাগরের তীর ঘেষে হাঁটছি হোটেলের দিকে। সাগরের তীরে পড়ে থাকা ছোট ছোট শামুক আর পাথর বেশ চমৎকার। অনেকেই তা কুড়াচ্ছে। অনেকের জন্য এই পড়ে থাকা শামুকই রিযিকের মাধ্যম। হোটেলে এসে ফ্রেশ হলাম। যোহরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করলাম।

বার্মিজ শুটকি মার্কেট

দুপুরের খানার পর্ব শেষ। মুদীর সাহেব বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছে হলে শুটকি মার্কেটে যেতে পার। তবে আসরের নামায হোটেল সিলভার বে'র নামায ঘরে অবশ্যই আদায় করতে হবে। আসরের পর সাগরের তীরে সূর্যাস্ত দেখতে যাব। সাগরের সান্ধ্যকালীন দৃশ্য সবচে' আকর্ষণীয় ও চমৎকার। সূর্যাস্তের সময়

অনেক মানুষের সমাগম হয় সমুদ্র সৈকতে। অস্তগামী সূর্যের প্রতিচ্ছবি সাগর বক্ষে পতিত হয়ে গোটা জলরাশিকে রক্তিম করে তোলে। এ দৃশ্য হারানো যাবে না।'

আমি, মুশাররফ, যুবায়ের সহ আরো অনেকেই শুটকি মার্কেটে গেলাম। শুটকি মার্কেটের দোকানগুলো খুব আকর্ষণীয়। চট্টগ্রাম বিশেষ করে কক্সবাজারের একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য হলো শুটকি মাছ। ছোট ছোট কাচকি মাছ থেকে শুরু করে নানা জাতের বিশাল বিশাল মাছের শুটকি প্যাকেটে সংরক্ষণ করা আছে। দেখতে বেশ চমৎকার লাগছিলো। রাজশাহী হুযূর বললেন, আমি হুযূরদের সাথে যখন শুটকি মার্কেটে পৌঁছলাম, তখন শুটকির ঘ্রাণ সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ ঘৃণার শব্দ মুখ ফসকে বের হয়ে গেলো। মুদীর সাহেব হুযূর আমার ইসলাহ করলেন। বললেন, 'খাবারের ক্ষেত্রে এরকম শব্দ ব্যবহার করতে নেই। এটা একটি আল্লাহর নিয়ামত যা অনেকের কাছেই প্রিয়।' নায়েব সাহেবসহ অন্যান্য হুযূররাও বাসার জন্য শুটকি ক্রয় করলেন। আমাদের মধ্যে যুবায়ের ও মুশাররফ বাড়ির জন্য শুটকি ক্রয় করল। এরপর আমরা আচারের মার্কেটে এলাম। বিভিন্ন ধরনের আচার, কাঁঠবাদাম, চকোলেট নিত্য নতুন খাবার দেখে কেনার আগ্রহ হলো। আমরা নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী কচিকাঁচাদের জন্য কয়েক পদের আঁচার, কাঁঠবাদাম, চকোলেট ইত্যাদি ক্রয় করলাম। আসরের সময় নিকটবর্তী। আমরা সেখান থেকে সরাসরি সিলভার বে-তে চলে এলাম।

সিলভার বে'র নামায ঘরে আসরের নামায আদায় করলাম। হোটেলের মালিকও আমাদের সাথে ছিলেন। হোটেলের মালিক পারভেজ সাহেবের ইচ্ছা ছিলো, আমাদের মাধ্যমে নামায ঘর উদ্বোধন করবেন।

নামায শেষে মুদীর সাহেব পারভেজ সাহেবের অনুরোধে কিছু নসীহত করলেন। এরপর দু'আর মাধ্যমে বৈঠক শেষ হলো। ইতোমধ্যেই পারভেজ সাহেবের পক্ষ থেকে মিষ্টি দ্বারা সকলকেই আপ্যায়ন করা হলো।

সূর্যাস্তের দৃশ্য

কিছুক্ষণের মধ্যেই দিগন্ত জোড়া আকাশে বিরাট কুসুমের মত সূর্য চারদিকে লালিমা ছড়িয়ে অস্ত যাবে। সেই অপরূপ মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখার জন্য সাগর তীরে ছুটলাম। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় এখনো বাকি। আমাদের অনেকেই সামুদ্রিক অলঙ্কার দিয়ে সাজানো দোকানগুলো পরিদর্শন করছে। এসব দোকানে আছে শামুক আর ঝিনুকের তৈরী মালা। মেয়েদের চুলের খোপা, চুড়িসহ আরো অনেক কিছু।

আহমুদুল্লাহ সাহেব, খুলনা হুযূরসহ অন্যান্য হুযূররাও নিজেদের কঁচিকাচাদের নাম শামুকের উপর অঙ্কিত করলেন। আমরাও অনেকে নিজেদের আপনজনদের নাম অঙ্কিত করে স্মৃতি স্বরূপ রেখে দিলাম। এরপর কাঙ্ক্ষিত সূর্যাস্ত দেখে ফিরে এলাম হোটেলে।

ফেরার পালা

ইশার নামাযের পূর্বেই ফেরার প্রস্তুতি শেষ। জামাআতের সাথে ইশার নামায আদায় করে নিচতলায় একত্র হলাম। রিসিপশনে চাবি জমা দিয়ে বিদায় নিলাম। বাসস্ট্যান্ডে এসে শ্যামলী এসি বাসে পৌনে নয়টায় সিট নিলাম।

গাড়ি ছুটছে দ্রুত বেগে। দু'দিনের সফরে ক্লান্ত শরীর সীটের সাথে এলিয়ে দিতেই অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ভাবছি, জীবনের অনেক পাতা ঝরেছে। কিন্তু দেখা হয়নি দুর্গম গিরিপথ, আকাশছোঁয়া পাহাড়, পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়া অবিরাম ঝর্ণাধারা, সাগর পাড়ের ভেজা সৈকত, সমুদ্রের শোঁ শোঁ গর্জন। হৃদয়ে স্বপ্ন ছিলো পাহাড়ী পৃথিবীটাকে হেঁটে দেখার। সে স্বপ্ন রবের অনুগ্রহে পূরণ হলো। আলহামদুলিল্লাহ। তিন রাত দু'দিনের এই আনন্দপূর্ণ রোমাঞ্চকর ইলমী সফরের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা কখনো ভুলবার নয়। ভ্রমণ যে কতটা গুনাহমুক্ত হতে পারে বরং সওয়াবের হতে পারে; এই ইলমী সফর তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাতের খাবার এখনো হয়নি। রাস্তার পাশে এক হোটেলে মুদীর সাহেব গাড়ি থামালেন। খাবারের পর প্রায় সকলেই হোটেলের নিকটস্থ মসজিদে তাহাজ্জুদে দাঁড়াল। তাহাজ্জুদ শেষে আমরা পুনরায় গাড়িতে উঠলাম। ফজরের নামাযের সময় হলো। মুন্সিগঞ্জ কালিমুল্লাহ মাদরাসা মসজিদে ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করলাম। অতঃপর মাসনূন আমল করতে করতে বাসে উঠলাম। কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম টেরই পাইনি।

আমরা আসাদগেট নেমে গেলাম। সেখান থেকে অন্য আরেক গাড়িতে উঠে সোয়া নয়টার দিকে বসিলা গার্ডেন সিটিতে প্রবেশ করলাম। উস্তাদগণ যে যার গন্তব্যে নেমে পড়েছেন। আশেপাশে পরিচিত মুখ, বাড়িঘর, গাছপালা সব কিছুকেই বড় আপন মনে হলো। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা শাহ আলম ভাইয়ের ঝলমলে হাসিটাও মনে হলো অনেকদিন পর দেখছি। আমরা ফিরে এসেছি আপন আলোয় সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায়। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার।

নিকট অতীতে
যেসব বরেণ্য আলেমকে হারালাম

পৃথিবীতে প্রতিদিন কতো মানুষ আসে। আবার কতো মানুষ চলে যায়! পৃথিবী এ আসা-যাওয়ার মিছিল দেখে অভ্যস্ত। তবে কিছু মানুষের বিদায়ে পৃথিবী কেঁদে ওঠে। একজন আলেমের মৃত্যুতে জগতবাসীর হৃদয়ে গভীর রক্তক্ষরণ ঘটে। এজন্যই বলা হয়, একজন আলেমের মৃত্যু মানে একটি পৃথিবীর মৃত্যু! নিকট অতীতে পৃথিবী বারবার সম্মুখীন হয়েছে এমন মৃত্যুর। আমরা হারিয়েছি অনেক আলেমে দীনকে। সদ্য বিদায় নেওয়া সেসব মনীষীর কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে পেশ করা হচ্ছে।

اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واسكنهم بحبوحة جنانك

১. আল্লামা শাহ আহমাদ শফী রহ.

মৃত্যু : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঈসায়ী।

চট্টগ্রামস্থ আলজামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসার দীর্ঘকালের মুহতামিম ছিলেন। হেফাজতে ইসলামের আমীর ছিলেন। ১৯১৬ সালে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানার পাখিয়ারটিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ইলমী সফরগুলোতে মা'হাদের আসাতিযায়ে কেরাম ও ছাত্রগণ হাটহাজারী মাদরাসায় গেলে অবশ্যই হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। হযরতও অত্যন্ত মহব্বতের সাথে তাদেরকে সাক্ষাৎ দিতেন এবং মুসাফাহা-মুআনাকার মাধ্যমে ধন্য করতেন।

২. মাওলানা নূর হুসাইন কাসেমী রহ.

মৃত্যু : ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ঈসায়ী।

ঢাকাস্থ জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা মাদরাসার মুহতামিম। হাজারো উলামায়ে কেরামের উস্তায, আধ্যাত্মিক রাহবার ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব ছিলেন। ১৯৪৫ সালে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ থানার চড্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

৩. মুফতী মাওলানা সাঈদ আহমাদ পালনপুরী রহ.

মৃত্যু : ১৯ মে ২০২০ ঈসায়ী।

দারুল উলূম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসীন।

৪. মাওলানা আব্দুল মুমিন শায়েখে ইমামবাড়ি রহ.

মৃত্যু : ৮ এপ্রিল ২০২০ ঈসায়ী।

জমিয়তের উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সভাপতি ছিলেন। তিনি হুসাইন আহমাদ রহ. এর খলীফা ছিলেন।

৫. মাওলানা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী রহ.

মৃত্যু : ৫ জানুয়ারি ২০২০ ঈসায়ী।

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া আরাবিয়া ইসলামিয়া উমেদ নগর মাদরাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহ-সভাপতি ছিলেন।

৬. মাওলানা আশরাফ আলী রহ.

মৃত্যু : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

আল-হাইআতুল উলইয়া লিলজামি'আতিল কাওমিয়্যাহ কো-চেয়ারম্যান ও জামিয়া শরঈয়্যা মালিবাগ মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল ও শাইখুল হাদীস ছিলেন।

৭. মাওলানা জামিল আহমাদ সাকরোডাবী

মৃত্যু : ৩১ মার্চ ২০১৯ ঈসায়ী।

দারুল উলূম দেওবন্দের সিনিয়র মুহাদ্দিস। বহু গ্রন্থ প্রণেতা। কালজয়ী ভাষ্যকার। বাংলাদেশ সফরে এসে তিনি একাধিকবার মা'হাদে দীর্ঘ সময় সোহবত দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন এবং রাত্রিযাপন করেছেন। মা'হাদের তলাবাদের উদ্দেশে খুসূসী বয়ানও পেশ করেছেন।

৮. মাওলানা জামাল উদ্দীন রহ.

মৃত্যু : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রবীণ মুহাদ্দিস। তাফসীরে জালালাইনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ জামালাইন এর প্রণেতা।

৯. মাওলানা আযহার আলী আনওয়ার শাহ রহ.

মৃত্যু : ২৯ জানুয়ারি ২০২০ ঈসায়ী।

কিশোরগঞ্জের ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদের খতীব ও আলজামিয়াতুল ইমদাদিয়া মাদরাসার মহাপরিচালক ছিলেন। বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের সহ-সভাপতি ছিলেন।

১০. মাওলানা যুবায়ের আহমাদ আনসারী রহ.

মৃত্যু : ১৭ এপ্রিল ২০২০ ঈসায়ী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ বেড়াতলা জামিয়া রাহমানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম। খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমীর। বিশিষ্ট ওয়াজে ও মুফাসসির।

১১. মাওলানা ইমদাদুল হক হবিগঞ্জী রহ.

মৃত্যু : ৬ ডিসেম্বর ২০২০ ঈসায়ী।

তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী রহ. এর ছোটো ভাই। জাতীয় ঈদগাহের সাবেক খতীব। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান জামিয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গা মাদরাসার শাইখুল হাদীস। সহীহ বুখারীর আরবী ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিদাইয়াতুস সারী ইলা সাহীহিল বুখারী এর লেখক।

১২. মাওলানা খলীলুর রহমান হামিদী রহ.

মৃত্যু : ৯ অক্টোবর ২০২০ ঈসায়ী।

আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলামের আমীর, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া সহ-সভাপতি এবং জামিয়া লুতফিয়া আনওয়ারুল উলূম বরুণা মাদরাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস। পীর সাহেব বরুণা।

২০15 ঈসায়ীতে সিলেটে মা'হাদের এক ইলমী সফরে তিনি মা'হাদের আসাতিযা ও তলাবাদেরকে খুব আন্তরিকতার সাথে ইস্তেকবাল ও আপ্যায়ন করেন।

১৩. মাওলানা আব্দুশ শহীদ গলমুকাপনী রহ.

মৃত্যু : ২৫ জুন ২০২০ ঈসায়ী।

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী জামিয়া দারুস সুন্নাহ গলমুকাপন মাদরাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি।

১৪. মাওলানা আব্দুল হাই বংশীবপাশা রহ.

মৃত্যু : ২৮ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী।

তিনি সিলেটের একাধিক মাদরাসার শাইখুল হাদীস ছিলেন। তিনি হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ, বংশীবপাশাস্থ মারকাযু তালীমিন্নিসা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

১৫. মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ তৈয়্যব রহ.

মৃত্যু : ২৪ মে ২০২০ ঈসায়ী।

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া জিরি মাদরাসার সুদীর্ঘকালের মুহতামিম। হেফাজতে ইসলামের সহ-সভাপতি।

১৬. মাওলানা মুনীরুজ্জামান সিরাজী রহ.

মৃত্যু : ৯ আগস্ট ২০২০ ঈসায়ী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় হুযূর নামে পরিচিত। ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ ভাদুঘর জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলূম মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল ও শাইখুল হাদীস।

১৭. মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ ইদরীস রহ.

মৃত্যু : ২৭ মে ২০২০ ঈসায়ী।

চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া নাসিরুল উলূম নাজিরহাট মাদরাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস।

১৮. মাওলানা আব্দুল লতীফ নিজামী রহ.

মৃত্যু : ১১ মে ২০২০ ঈসায়ী।

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ও নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি ছিলেন। সাদামাটা জীবনের অধিকারী ও সহজ-সরল মানুষ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিলো। তিনি দৈনিক সরকার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯. মাওলানা মোজ্জাম্মেল হক রহ.

মৃত্যু : ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঈসায়ী।

তাবলীগ জামাতের প্রবীণ মুরব্বী ও কাকরাইল মারকাযের প্রবীণ শূরা সদস্য ছিলেন। তিনি মুফতিয়ে আযম ফয়জুল্লাহ রহ. এর খলীফা ছিলেন।

২০. মাওলানা আব্দুল আলীম হুসাইনী রহ.

মৃত্যু : ১৮ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী।

নারায়নগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী মারকাযুল উলূম আলইসলামিয়া হাজীপাড়া মাদরাসার শাইখুল হাদীস ছিলেন। তিনি হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর খলীফা ও হেফাজত আমীর আল্লামা আহমাদ শফী রহ. এর সহপাঠী ছিলেন।

২১. মাওলানা ইসহাক নূর রহ.

মৃত্যু : ২৩ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী।

হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। হেফাজত আমীর আল্লামা আহমাদ শফী রহ. এর মেয়ের জামাতা ছিলেন। তিনি রাঙ্গুনিয়ার জামেয়া মেহেরিয়া মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন।

২২. মুফতী ড. আব্দুল্লাহ বিক্রমপুরী রহ.

মৃত্যু : ৮ এপ্রিল ২০২০ ঈসায়ী।

মুন্সিগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী মোস্তফাগঞ্জ মাদরাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস ছিলেন। তিনি ঢাকার ইসলামপুরস্থ তাতিবাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব ছিলেন।

২৩. মাওলানা মুজিবুর রহমান পেশওয়ারী রহ.

মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল ২০২০ ঈসায়ী।

খেলাফত মজলিস ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর শীর্ষ নেতা ছিলেন। তিনি একজন নির্লোভ নিরহঙ্কার আলেম ও বরেণ্য রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি মির্জাপুরের পীর হিসেবেও খ্যাত ছিলেন।

২৪. মাওলানা আব্দুর রহীম বোখারী রহ.

মৃত্যু : ১৬ এপ্রিল ২০২০ ঈসায়ী।

জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া মাদরাসার মুহতামিম আল্লামা আব্দুল হালীম বুখারী এর ছোটো ভাই। চকরিয়াস্থ ইমাম বুখারী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা।

২৫. মাওলানা আব্দুল মুমিত ঢেউপাশী রহ.

মৃত্যু : ২৮ এপ্রিল ২০২০ ঈসায়ী।

তিনি সিলেট বিভাগে শীর্ষ আলেম হিসেবে পরিচিত। একাধিক মাদরাসায় হাদীসের দরস দান করেছেন। তিনি মৌলভীবাজার সদর উপজেলার ঢেউপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করে।

২৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের রহ.

মৃত্যু : ২০ মে ২০২০ ঈসায়ী।

চট্টগ্রামস্থ জামিয়া দারুল মা'আরিফের মুহাদ্দিস ছিলেন। মহেশখালীর কালাগাজির পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। লেখক ও কবি হিসেবে তাঁর বেশ সুনাম ছিলো।

২৭. মাওলানা আনওয়ারুল হক চৌধুরী রহ.

মৃত্যু : ১ জুন ২০২০ ঈসায়ী।

সিলেটের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম। বালাগঞ্জের হযরত শাহ সুলতান রহ. মাদরাসা ও মহিলা মাদরাসার মুহতামিম।

২৮. মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ বাশার রহ.

মৃত্যু : ৮ জুন ২০২০ ঈসায়ী।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ।

২৯. মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ নূর রহ.

মৃত্যু : ১০ জুন ২০২০ ঈসায়ী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুফতী নূরুল্লাহ রহ. এর বড় ছেলে। নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলাস্থ পান্থশালা মাদরাসার মুহতামিম।

৩০. মাওলানা রহীমুল্লাহ কাসেমী রহ.

মৃত্যু : ২৫ নভেম্বর ২০২০ ঈসায়ী।

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সহকারী মহাসচিব, ফেনীর লালপোল সোলতানিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস, গুণকবাবুপুর দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক।

৩১. মাওলানা রশীদ আহমাদ রহ.

মৃত্যু : ২০ ডিসেম্বর ২০২০ ঈসায়ী।

জামিয়া ইসলামিয়া ইবরাহীমিয়া উজানী, কচুয়া, চাঁদপুর মাদরাসার স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস ছিলেন। তিনি লাকসামের হুযূর হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৩২. মাওলানা আবুল কাসেম রহ.

মৃত্যু : ১৮ অক্টোবর ২০২০ ঈসায়ী।

ফেনী জেলা হেফাজতে ইসলামের আমীর ও জহিরিয়া মসজিদের খতীব।

৩৩. মাওলানা আবুল হাসান রহ.

মৃত্যু : ৫ জুলাই ২০২০ ঈসায়ী।

কক্সবাজার জেলা হেফাজতে ইসলামের আমীর ও জোয়ারিয়ানাল মাদরাসার পরিচালক।

৩৪. মুফতী উবাইদুল মতীন রহ.

মৃত্যু : ১২ মে ২০২০ ঈসায়ী।

ঠাকুরগাঁও গোয়াপাড়া জামেয়া ইসলামিয়া ইবরাহীমিয়া দারুস সালাম কওমী মাদরাসার মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস ছিলেন।

৩৫. মাওলানা খলীলুর রহমান হাজী সাহেব হুযূর রহ.

মৃত্যু : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঈসায়ী।

সিলেটের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ মাদরাসার প্রবীণ মুহাদ্দিস। হযরত শাহপরান রহ. মাজার মসজিদের খতীব। সিলেটস্থ ইসলামিক ফিকহ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক।

৩৬. মুফতী আবুল কালাম যাকারিয়া রহ.

মৃত্যু : ১১ মার্চ ২০১৯ ঈসায়ী।

সিলেটের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ মাদরাসার মুহতামিম। সিলেট জেলা দাওয়াতুল হক বাংলাদেশের আমীর।

৩৭. মাওলানা শফীকুল হক আমকুনী রহ.

মৃত্যু : ২০ এপ্রিল ২০১৯ ঈসায়ী।

সিলেটের জামিয়া মাহমুদিয়া ইসলামিয়া সোবহানীঘাট মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম। সোবহানী ঘাট মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও খতীব।

৩৮. আল্লামা শিহাবুদ্দীন রহ.

মৃত্যু : ১ জুন ২০১৯ ঈসায়ী।

সিলেটের প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ জামিয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গা মাদরাসার শাইখুল হাদীস। সিলেটের আঞ্চলিক শিক্ষাবোর্ড আযাদ দীনী এদারার নাযেমে ইমতিহান।

৩৯. মাওলানা ফখরুদ্দীন সাদিক রহ.

মৃত্যু : ২০ জুন ২০১৯ ঈসায়ী।

সিলেট জেলার বরেণ্য আলেমে দীন। সিলেট সদর উপজেলার জামেয়া আরাবিয়া ইসলামিয়া দলুকান্দি মাদরাসার শাইখুল হাদীস।

৪০. নূরুল ইসলাম বিশ্বনাথী রহ.

মৃত্যু : ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

আল্লামা নূরুদ্দীন গওহরপুরী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা। আতাপুর মাদরাসা, কালিগঞ্জ মহিলা মাদরাসা ও বাগিচা বাজার মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন।

৪১. মাওলানা আব্দুল খালিক কিয়ামপুরী রহ.

মৃত্যু : ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

সিলেটের উসমানী নগর থানাধীন জামেয়া দারুস সুন্নাহ গলমুকাপন মাদরাসার প্রাক্তন শিক্ষাসচিব।

৪২. আল্লামা শরীফ শাহজালাল রহ.

মৃত্যু : ৮ জানুয়ারি ২০১৯ ঈসায়ী।

চাঁদপুরস্থ জামেয়া ইসলামিয়া ইবরাহীমিয়া উজানী মাদরাসার শাইখুল হাদীস। কারী ইবরাহীম রহ. এর দৌহিত্র। তিনি হাফিযুল হাদীস হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

৪৩. ড. আহমাদ আলআমরী রহ.

মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি ২০১৯ ঈসায়ী।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিন ছিলেন। তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪৪. মাওলানা উমর ফারুক রহ.

মৃত্যু : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ঈসায়ী।

ঢাকাস্থ বড়কাটা মাদরাসার শিক্ষক। চুরিহাট্টার অগ্নিকাণ্ডে ইন্তেকাল করেন।

৪৫. ড. জসীম উদ্দীন নদবী রহ.

মৃত্যু : ৮ এপ্রিল ২০১৯ ঈসায়ী।

চট্টগ্রামস্থ জামিয়া দারুল মা'আরিফের সহকারী পরিচালক ছিলেন। বিশিষ্ট এ আরবী সাহিত্যিক সুলতান যওক নদভী দা.বা. এর মেয়ের জামাতা ছিলেন।

৪৬. মাওলানা আবুল ফাত্তাহ রহ.

মৃত্যু : ৩ জুলাই ২০১৯ ঈসায়ী।

বুয়েট সেন্ট্রাল মসজিদের প্রাক্তন ইমাম ও খতীব ছিলেন। এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া বড় হুযূর সিরাজুল ইসলাম সাহেবের মেয়ের জামাতা ছিলেন।

৪৭. মাওলানা রহমতুল্লাহ কাউসার নিজামী রহ.

মৃত্যু : ১৩ আগস্ট ২০১৯ ঈসায়ী।

আলজামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া মাদরাসা প্রবীণ মুহাদ্দিস ছিলেন। বহুগ্রন্থ প্রণেতা এ মনীষী জামিয়ার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পরিচালক ছিলেন।

৪৮. মাওলানা আব্দুস সালাম রহ.

মৃত্যু : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

সিলেটের ছড়ারপার মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন। তিনি তাবলীগ জামাতের একজন মুরব্বী ও দীনের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন।

৪৯. এ.টি.এম হাফেয হেমায়েত উদ্দীন রহ.

মৃত্যু : ১১ অক্টোবর ২০১৯ ঈসায়ী।

ইসলামী আন্দোলন এর যুগ্ম মহাসচিব। বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

৫০. মাওলানা সালাহ উদ্দীন লাহোরী রহ.

মৃত্যু : ১৭ অক্টোবর ২০১৯ ঈসায়ী।

কিশোরগঞ্জের আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া মাদরাসার প্রবীণ মুহাদ্দিস।

৫১. মুফতী মনযুর আহমাদ রহ.

মৃত্যু : ৩ নভেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিশে শূরার অন্যতম সদস্য। তিনি কানপুর শহরের বিচারপতি ছিলেন।

৫২. মাওলানা সারওয়ার আহমাদ কাসেমী রহ.

মৃত্যু : ৪ নভেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

দারুল উলূম দেওবন্দের উচ্চতর ফারসী ভাষা শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন।

৫৩. মুফতী গোলাম নবী কাশ্মীরী রহ.

মৃত্যু : ৭ নভেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

দারুল উলূম (ওয়াকফ) দেওবন্দের সিনিয়র মুহাদ্দিস ছিলেন। আরবী ও উর্দু ভাষার এ সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব নেদায়ে দারুল উলূম ও মাসিক যিকর ও নযর এর আমৃত্যু সম্পাদক ছিলেন।

৫৪. মাওলানা জুনাইদ আহমাদ রহ.

মৃত্যু : ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

তিনি সড়ক দুর্ঘটনায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ঢাকার স্বামীবাগস্থ সুলতানুল উলূম কওমী মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন।

৫৫. আল্লাম রফিক আহমাদ মহল্লী রহ.

মৃত্যু : ৭ নভেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

পিরোজপুরস্থ সাতকাসেমিয়া মাদরাসার শাইখুল হাদীস ছিলেন। এবং জমিয়তের উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সহ-সভাপতি ছিলেন।

৫৬. মুফতী ইদরীস কাসেমী রহ.

মৃত্যু : ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন সহকারী মুফতী। সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ কাশফুল বারীর লেখক। বহুগ্রন্থ প্রণেতা এ আলেম ঢাকার বিভিন্ন মাদরাসায় হাদীসের দরস দান করেছেন।

৫৭. মাওলানা মুজাহিদ আলহুসাইনী রহ.

মৃত্যু : ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী।

তিনি ইয়াদগারে আকাবির হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পাকিস্তানের বিশিষ্ট এ আলেম খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের তাঁর দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেন।

৫৮. মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস রহ.

মৃত্যু :

বিখ্যাত ওয়ায়েজ মাওলানা মুশতাকুন্নবী দা.বা. এর পিতা। টুমচর ফাযিল মাদরাসার সাবেক ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ও লক্ষ্মীপুর চকবাজার জামে মসজিদের সাবেক খতীব।

ফা তা ও য়া মা সা ই ল

ফাতওয়া বিভাগ : মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, ঢাকা

আব্দুর রহমান

ঢাকা

প্রশ্ন : বর্তমানে বইমেলা থেকে বই ক্রয় করে বিকাশ পেমেন্টের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করলে যে ক্যাশব্যাক প্রদান করে, তা গ্রহণ করা বৈধ কী না? জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : কোন পণ্য ক্রয়ের পর বিকাশ পেমেন্টের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যে ক্যাশব্যাক পাওয়া যায় তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ তাতে সুদের প্রবল আশংকা রয়েছে। কেননা পেমেন্ট করতে হলে প্রথমে মোবাইলে ক্যাশইন করা থাকতে হয়। যা শরিয়তে ঋণের অন্তর্ভুক্ত। এর উপর কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত ক্যাশব্যাক গ্রহণ করা ঋণ দিয়ে সুবিধা ভোগ করার নামান্তর। যাকে ইসলামী শরীয়তে সুদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বইমেলা থেকে বই কিনে পেমেন্ট করে যে ক্যাশব্যাক পাওয়া যায় তা গ্রহণ করা ঠিক হবে না। (সূরা বাকারা; আয়াত ২৭৫, ২৭৮, ই'লাউস সুনান ৯/৫১৪, ফাতাওয়া শামী ৫/১৬৬, ৩৫০, আল-হিদায়া ৩/৭৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৪/৪০৪)

আব্দুর সাত্তার

ঢাকা

প্রশ্ন : সুদে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে ঘুষ বা সুদ দেওয়ার বিধান কী?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে সুদ একটি মারাত্মক কবীরা গুনাহ। তবে যদি কেউ সুদ গ্রহণ করে ফেলে তবে তার জন্য করণীয় হলো সুদের টাকা মূল মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া। যদি মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া মালিকের নামে সদকা করে দিবে। সুদের টাকা মালিকের কাছে ফেরত না দিয়ে তা দিয়ে ঘুষ বা সুদ দেওয়া জায়েয হবে না। (সূরা বাকারা; আয়াত ২৭৫, ফাতাওয়া শামী ৫/৯৯, ৬/৩৮৫, আল-বাহরুর রায়িক ৬/৪৪১, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৪/৪৮৯, ৪৯২)

আব্দুল্লাহ

ঢাকা

প্রশ্ন : অনেক সময় গরু জবাই করার পূর্বেই তার চামড়া, কলিজা ইত্যাদি অগ্রিম বিক্রি করে দেওয়া হয়। আমার জানার বিষয় হলো, এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ কী না?

উত্তর : পশু জবাই করার পূর্বে তার চামড়া কলিজা ইত্যাদি বিক্রয় করা জায়েয নেই। তবে কেউ যদি এরকম ক্রয়-বিক্রয় করে ফেলে তবে তার জন্য আবশ্যক হলো উক্ত ক্রয়-বিক্রয় রহিত করে দেওয়া। (সুনানে বাইহাকী; হাদীস ১১১৭৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩/১৩০, ফাতাওয়া শামী ৫/৫৪, আল-বাহরুর রায়িক ৬/১২৩, ফাতহুল কাদীর ৬/৩৭৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৪৩২, ফাতাওয়া হাক্কানিয়া ৬/১৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৪/১২০)

মাওলানা আবূ হুরাইরা

নূরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

প্রশ্ন : আমি একজন ইটের ভাটার মালিক। লোকজন আমার ভাটায় টাকা বিনিয়োগ করে। সেটার পদ্ধতি হলো, তারা মৌসুমের শুরুতে টাকা বিনিয়োগ করে এবং মৌসুমের শেষে ইট বুঝে নেয়। কিছু গ্রাহক এমন আছে যারা আমাকে বলে যে, আপনি আমাদের ইটগুলো বিক্রি করে দিবেন। আমি তাদের পক্ষ থেকে ইটগুলো বিক্রি করে দিই। এক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্য ইট তাদের বুঝানো হয় না; বরং তারা টাকার আনুপাতিক হারে যে পরিমাণ ইট পাবে তা তাদের পক্ষ থেকে বিক্রি করে দিই। এখন জানার বিষয় হলো, তাদের প্রাপ্য ইট তাদের বুঝানোর পূর্বে আমার জন্য তা বিক্রি করা জায়েয হবে কি? তাছাড়া ইট বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বে আমি নিজেই কিনে রাখতে পারব কি না?

উত্তর : আপনি প্রশ্নপত্রে ইটভাটায় টাকা বিনিয়োগের যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন, ইসলামী শরীয়ত মতে ব্যবসায়িক সে পদ্ধতিটি বাইয়ে সালাম (بيع سلم) হিসেবে পরিচিত। ক্রয়-বিক্রয়ের এ পদ্ধতিতে বিক্রেতাকে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হয়। বিক্রেতা পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মানের নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রেতাকে হস্তান্তর করে। ইসলামী শরীয়তে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় একটি রীতি হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রিত পণ্যে ক্রেতার কবজা বা দখলস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন ও শুদ্ধ হবে না। দখলস্বত্ব ক্রেতা কর্তৃক বুঝে না নেওয়া ও বিক্রেতা কর্তৃক হস্তান্তর না করা

পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্যের উপর ক্রেতার দখলস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে ক্রেতা কর্তৃক কোন রকম হস্তক্ষেপ বৈধ নয়।

সুতরাং আপনাদের মধ্যকার লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি সত্যিই ক্রেতাকে ইট বুঝিয়ে দেওয়া না হয় তাহলে ক্রেতা কর্তৃক আপনাকে ইট বিক্রির দায়িত্ব দেওয়া জায়েয হবে না। কারণ ইট না বুঝিয়ে দেওয়ার কারণে তাতে ক্রেতার দখল ও মালিকানাস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাইয়ে সালামের মধ্যে দখল ও মালিকানাস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে তাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা যায় না। কাউকে পণ্য বিক্রির দায়িত্ব দেওয়া এক ধরনের হস্তক্ষেপ। বস্তুত কবজা না করার কারণে বা বুঝিয়ে না দেওয়ার কারণে ইট আপনার মালিকানা থেকে বের হয়নি। এক্ষেত্রে আপনাকে ইট বিক্রির দায়িত্ব দেওয়ার অর্থ হলো, তৃতীয় কেউ আপনাকে আপনার পণ্য বিক্রির দায়িত্ব দিচ্ছে– যা সম্পূর্ণ অনর্থক।

সুতরাং ক্রেতাকে তাদের প্রাপ্য ইট বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বে আপনার জন্য তা বিক্রি করা জায়েয হবে না। তদ্রূপ ক্রেতাকে ইট বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বে আপনি নিজেও তা কিনে রাখতে পারবেন না।

বাইয়ে সালামের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে আপনার ইট বিক্রি করা এবং পরবর্তীতে গ্রাহক কর্তৃক আপনাকে ইট বিক্রির দায়িত্ব দেওয়া স্বতন্ত্র দু'টি লেনদেন। প্রথমটি হলো ক্রয় বিক্রয়ের লেনদেন। আর দ্বিতীয়টি হলো ওকালাত তথা প্রতিনিধি নিয়োগের লেনদেন। প্রথম লেনদেন সম্পন্ন না করে দ্বিতীয় লেনদেন করা জায়েয হবে না। কবযা ও বুঝিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হলেই প্রথম লেনদেন সম্পন্ন হবে। এরপর উক্ত পণ্যের উপর দ্বিতীয় লেনদেন কার্যকর হবে। তবে গ্রাহকের ইটগুলো যদি গ্রাহকের নির্দেশে ইটের স্তুপ থেকে আলাদা করে রাখা হয়, এরপর গ্রাহক নিজে এসে বা কোন প্রতিনিধি পাঠিয়ে তা বুঝে নেয়, অতঃপর স্বতন্ত্র ইজাব-কবুলের মাধ্যমে আপনার কাছে বিক্রি করে দেয় বা আপনাকে বিক্রয়ের জন্য দায়িত্ব দেয় তাহলে আপনার জন্য ক্রয় করা বা বিক্রয় করা জায়েয হবে।

উল্লেখ্য যে, বিনিয়োগকারী ক্রেতা কর্তৃক ইট বুঝে নেওয়ার পর আপনি ক্রয়ের পূর্বে অথবা আপনাকে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করার পর ইট বিক্রি করে গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরের পূর্ববর্তী সময়ে উক্ত ইটের কোন ক্ষতি হলে তার পুরো দায় দায়িত্ব ক্রেতাই বহন করবে।

বি.দ্র. বিক্রেতা কর্তৃক ইট বিক্রি করে দেওয়াটা মূল ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে শর্তযুক্ত হতে পারবে না। শর্তযুক্ত হলে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। (সহীহ

বুখারী; হাদীস ২১৩৫, বাদায়িউস সানায়ি' ৪/৩৯৪, ৪৫১, ৪৯৭, ৫/২১ ফাতাওয়া শামী ৪/৫৬১, ৫/২১৮, আল-বাহরুর রায়িক ৬/১১৪, ১৯৩, ফাতহুল কাদীর ৮/২৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩/১৬, ৪/১৯, আল-মউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আল-কুওয়াইতিয়্যা ৩২/২৬৬, ফিকহুল বুয়ূ' ১/৫৮৪, বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসারাহ ১/২১২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৭০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৪/১০৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৬/৫২২, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৪/৪৩৮)

মাওলানা গোলাম রহমান

খুলনা

প্রশ্ন : বাবা তার বাড়ি তৈরির সময় জমি ক্রয়ের কিছু টাকা তার বড় ছেলের কাছ থেকে তার জমি ক্রয় করার জন্য নেন, বাকি টাকা বাবা নিজের পক্ষ থেকে দেন এবং ঐ জমি বাবা তার দুই ছেলের নামে ক্রয় করেন। বাড়ি তৈরি ও গাছপালা রোপণ করেন পরিবারের সকলে মিলে। প্রায় ২০/২৫ বছর পর বাবা বৃদ্ধ বয়সে বড় সন্তানের উপর নির্ভরশীল হন। বর্তমান সময়ে বড় সন্তান শহরে বাড়ি তৈরীর সময় বাবার ঐ ভিটা বিক্রয় করতে চান। এখন প্রশ্ন হলো ঐ বাড়ি বিক্রয়ের টাকা তার বোন তথা ঐ বাবার মেয়েরা পাবে কিনা? (কারণ পূর্বে বলা হয়েছে ঐ বাড়িটি ক্রয়ের সময় বড় ছেলে টাকা দিয়েছিল) বর্তমান সরকারী আইনে পাবে না। কারণ ঐ ভিটার রেজিষ্ট্রি হয়েছে বড় ও ছোট ছেলের নামে, বাবার কোন সম্পদ নেই বা বাবা মৃত্যুবরণ করেননি। ইসলামী বিধান মোতাবেক এর সমাধান কী হবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে বড় ছেলে পিতাকে জমি ক্রয় করতে যে পরিমাণ টাকা দিয়েছিল সে পরিমাণ টাকা দিয়ে যদি পিতা বড় ছেলের জন্য জমি ক্রয় করে থাকে এবং জমির দখল বুঝিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে ঐ পরিমাণ জমির মালিক বড় ছেলে নিজেই। পিতা যদি বড় ছেলেকে তার দেওয়া টাকার জমির অংশই শুধু রেজিষ্ট্রি করে দিয়ে থাকে, নিজের পক্ষ থেকে কোন অতিরিক্ত জমি বড় ছেলেকে ও কন্যাদেরকে হেবা বা দান হিসেবে না দিয়ে থাকে বরং সম্পূর্ণ জমি ছোট ছেলেকে দিয়ে থাকে তাহলে পিতা বড় ছেলেকে এবং কন্যাদেরকে তার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার কারণে গুনাহগার হবেন। আর যদি পিতা বড় ছেলেকে তার ক্রয়কৃত জমি দেওয়ার সাথে সাথে নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জমিও দিয়ে থাকেন এবং সেটা ছোট ছেলেকে দেওয়া জমির সমপরিমাণ না হয় এবং এক্ষেত্রে শরীয়ত সম্মত কোন কারণ না থাকে তাহলে পিতার জন্য

এমনটি করা উচিত হয়নি। তবে পিতা সর্বাবস্থায় কন্যাদেরকে বঞ্চিত করার কারণে গুনাহগার হবেন। হেবা বা দানের ক্ষেত্রে পিতা যদি উভয় ছেলেকে দানকৃত জমির দখল ও মালিকানা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়ে দিয়ে থাকেন এবং তারাও যদি বুঝে পেয়ে থাকে তাহলে যাকে যতটুকু অংশ দান করা হয়েছে সে ততটুকু অংশের মালিক হয়ে গেছে। তারা চাইলে সেটা বিক্রয় করে অন্য কাজে ব্যয় করতে পারবে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কন্যারা এ জমিতে কোন অংশ পাবে না। সুতরাং ঐ জমি বিক্রি হলে বিক্রিত টাকা বোনেরা পাবে না।

তবে বাড়ি তৈরী ও গাছ-পালা রোপণে যদি বাড়ির সকল সদস্য অংশগ্রহণ করে থাকে তাহলে অংশ অনুপাতে গাছ ও ঘরের ন্যায্য ভাড়া কেটে রাখতে পারবে। তবে ছেলেদের জন্য উচিৎ হলো পিতাকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে কন্যাদেরকেও সমপরিমাণ সম্পদ দিয়ে দেওয়া। আর যদি পিতার অন্য কোন সম্পদ থাকে তাহলে তার কর্তব্য হলো সেখান থেকে সমপরিমাণ সম্পদ কন্যাদেরকে দিয়ে যাওয়া। (সহীহ বুখারী; হাদীস ২৫৮৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪০০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৩৯৫, ৩৯৬, ফাতাওয়া শামী ৮/৪৯৩, মাজমাউল আনহুর ৩/৪৯১, ৪/৩১৯, আল-হিদায়া ৩/২৮৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৪০০, তাফসীরে বায়যাবী; পৃষ্ঠা ৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৫/৪১০, ৩০/১৫৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৫/২৩০, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/২৫৩, ফাতাওয়া হক্কানিয়া ৬/৩৬৫, ৩৮৯, ৫৩৯, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/৩১২)

এই পাতাটি আপনার

পাঠক এ পাতাটি আপনার জিজ্ঞাসা-জবাবের জন্য বরাদ্দ। এখানে আপনার জীবনঘটিত নানা সমস্যার ইসলামী সমাধান দেওয়া হবে। আপনার নানাবিধ ইসলামী অনুসন্ধিৎসা পূরণে আমরা সচেষ্ট থাকব ইনশাআল্লাহ। তাই যেকোনো বিষয়ে ইসলামী সমাধানের জন্য ই-মেইল করুন, কল করুন কিংবা ডাকযোগে পাঠিয়ে দিন আপনার জিজ্ঞাসাপত্রটি।

উল্লেখ্য, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ও মোবাইলের মাধ্যমেও মা'হাদ ফাতাওয়া-মাসাইল প্রদান করে থাকে।

আমাদের ওয়েবসাইট : www.mahadbd.com

ই-মেইল : mbuhus@gmail.com

মোবাইল : ০১৮১১২২৮৯৯২, ০১৯৪০৩৭৬৭৪০, ০১৮৬৪৬২৩৫৮০

মা'হাদ আঙিনা

জীবন থেকে নেওয়া

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ*

গত ২৯/১০/১৪৪০ হিজরী মোতাবেক ০৩/০৭/২০১৯ তারিখে মা'হাদে আগমন করেছিলেন বর্তমান সময়ের নন্দিত ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট লেখক ও সম্পাদক মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ দা.বা.। বাদ যোহর তিনি মা'হাদের ছাত্রদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। সে আলোচনাটির সারসংক্ষেপ পাঠকের সমীপে পেশ করা হচ্ছে। -দারুত তাসনীফ

আলোচনার সূচনাপর্ব

মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সাহেব মা'হাদের সকল আসাতিযা ও পরিচালনা পরিষদের শোকগুযারী করে আলোচনা শুরু করেন।

কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায়ের বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, "নেক কাজের সবটুকু মানুষের সাধ্যের মধ্যে নেই। সেজন্যে নেক কাজের তাওফীক আল্লাহর কাছ থেকে চাওয়াও অনেক বড় বিষয়। মানুষ তার কাজের ব্যাপারে অবশ্যই দায়বদ্ধ। তবে এ কথাও বাস্তব যে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীকপ্রাপ্ত না হলে সে ভালো কাজ করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং কখনো নেক কাজের তাওফীক পেলে সেটাকে নিজের কৃতিত্ব মনে না করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

দেখুন, শুকরিয়ার দু'টি দিক আছে। প্রথম দিকটি হলো, মুখে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। আরেকটি দিক হলো, নিজের কাজে সেটিকে ফুটিয়ে তোলা। কেউ একজন তার বাবাকে মুখে মুখে খুব ভালোবাসার দাবি করে। কিন্তু বাবা কোনো আদেশ করলে বা তার কোনো দরকার এলে পালিয়ে বেড়ায়। তাহলে কিন্তু তার কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে গণ্য হবে। আর যদি সে বাবার যে কোনো প্রয়োজনে লাফিয়ে অগ্রসর হয়, বুঝতে হবে– এর কথা কাজে মিল আছে।

আমরা যারা এ প্রতিষ্ঠানে আছি, তারা যদি সত্যিকারার্থে এর আসাতিযায়ে কিরামের শুকরিয়া আদায় করতে চাই এবং শুকরিয়ার অনুভূতি হৃদয়ে লালন

* সম্পাদক, ইসলামটাইমস টোয়েন্টিফোর ডট কম

করতে চাই, তাহলে আমাদেরও কথা-কাজে মিল থাকতে হবে। শুধু বাহ্যিক কানুন মেনে চললেই হবে না। বরং এসব কানুনের বাইরে উস্তাদদের দিলের ভেতরের যেসব ইচ্ছা ও মানশা লুকায়িত থাকে সেটাকেও বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করতে হবে।

বিশ্বাস করুন, জীবনের আটচল্লিশটি বসন্ত পেরিয়ে আজ আমার একথাই মনে হচ্ছে– হায়! ছাত্রত্বের সময়টা যদি আরো সুন্দর করে কাটাতে পারতাম। উস্তাদগণ আমার কাছ থেকে কানুনের বাইরেও কিছু জিনিস চেয়েছিলেন। আমি কানুন তো ভঙ্গ করিনি কিন্তু তাঁদের মনের চাওয়াটাকে হয়তো পাশ কাটিয়ে গেছি। আফসোস হয়, যদি উস্তাদদের মনের পাতায় লিখিত সে আইনটাও মেনে চলতাম তাহলে আজ জীবনটা অন্যরকম হতে পারতো! আজ আমার জীবন থেকে মূল্যবান সেসব রত্ন হারিয়ে গেছে।

যে কোনো প্রতিষ্ঠানেই শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে আইন করা হয়। এ রীতিটা শুধু আমাদের অঙ্গনে নয়। ক্যাডেট স্কুলে আছে। কলেজে আছে। ঢাকা ভার্সিটিতে আছে। পুলিশ-আর্মিসহ সব জায়গায় আছে। প্রতিষ্ঠানে থাকতে হলে এসব নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ কথা বলা যায় না, শরীয়ত তো এ বিষয়টা আমার ওপর বাধ্য করেনি তাহলে প্রতিষ্ঠান কেন করবে? আমরা যদি নিজেদের জীবন গড়তে চাই তাহলে আত্মসমর্পণের সাথে থাকতে হবে। নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাবার জন্যে সুযোগ খোঁজা যাবে না। এসব নিয়ম ও কঠোরতাকে তারবিয়তের অর্থে গ্রহণ করতে হবে। একটু শাস্তি মনে হলে হোক। এর মধ্যেই স্বাদ ও আনন্দ খুঁজে নিতে হবে।

আপনারা যদি ছাত্রত্ব থেকে পরিপূর্ণ ইস্তিফাদা চান, তাহলে এ বিষয়টার প্রতি লক্ষ রাখুন। লিখিত আইন মানুন। অলিখিত আইনও মানুন। মৌখিক আইন মানুন। মনের ভেতরের সুপ্ত মানশাও মেনে চলার চেষ্টা করুন। আপনাদের জন্যে আজ আমি নিজের জীবন থেকে অভিজ্ঞতার এই বার্তাটা রেখে যাচ্ছি। পরবর্তীতে আফসোস করতে না চাইলে এখন থেকেই আমলের চেষ্টা করুন।

আপনাদের মধ্যে এখন তারুণ্যের উচ্ছ্বাস। এখন অনেক কিছু করতে মনে চাইবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, চাইলেও কিন্তু আপনি দুনিয়ার সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। সব ধরনের জ্ঞান অর্জন করে ফেলতে পারবেন না। সুতরাং এখনই সবকিছুতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে আগে একাডেমিক পড়াশোনা আর সুহবতের মাধ্যমে একটা রুচি গড়ে তুলুন। একটা বাছাই প্রবণতা আপনার মধ্যে আসুক। এটাই আপনাকে বলে দেবে কোনটা ঠিক, কোনটা ঠিক নয়। কোথায় যাবেন আর কোথায় যাবেন না। কী শোনবেন, কী শোনবেন না।

খেদমতের সোনালি উসূল

আপনারা যারা ইফতা পড়ছেন তাদের জন্যে খেদমতের বিশাল এক জগত অপেক্ষা করছে। সামাজিক জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত এ ময়দানের কর্মক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান জানতে মুচি, রিকশাওয়ালা থেকে শুরু করে সচিব, মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি– সবাই আপনার কাছে ফোন করবে। একজন মুফতী শুধু মুফতীই নন। তিনি একজন মনোবিজ্ঞানীও বটে। হাজারো মানুষের ভেতরের গল্প জানেন। সমাধানের পাশাপাশি তিনি সান্ত্বনাও দেন। মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ এ কাজ দীনের সরাসরি একটি খেদমত। সুতরাং নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করুন।

ইফতা'র বিস্তৃত অধ্যয়নের পর উস্তাদদের নির্দেশনায় একেকজন একেক বিষয় নিয়ে পারদর্শিতা অর্জন করুন। ফারেগ হওয়ার পরও এ মেহনত করতে পারেন। কারো মধ্যে হয়তো সংবিধান নিয়ে উৎসাহ আছে। আপনি উপযুক্ত একটা সময় ব্যয় করে সংবিধান নিয়ে তুলনামূলক পড়াশোনা করুন। কেউ নারী বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারেন। নারীদের হিজাব, তালাক, মীরাস, বাইরে কাজ করা ইত্যাদি বিষয়ে যতো রকম আপত্তি উত্থাপন করা হয়, সেগুলোর একটা তালিকা করে অধ্যয়ন শুরু করতে পারেন।

এভাবে একটা সময়ে গিয়ে আপনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞে পরিণত হবেন। আপনার উস্তাদও সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে লোকজনকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। চাইলে আপনি সীরাত বিষয়েও অধ্যয়ন করতে পারেন। একটা সময়ে আপনি সীরাত বিষয়ে সংশয়বাদীদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন এবং এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন। কাজ করতে চাইলে ব্যাংক-বীমা, লেনদেন, ইসলামী লেবাস, ইস্তেশরাকসহ আরো অসংখ্য ক্ষেত্র আপনার সামনে খোলা রয়েছে।'

মান্যতার কিছু কথা

কৃতজ্ঞতার দ্বিতীয় পর্ব শেষে মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সাহেব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করেন। বিষয়টা আজকাল নতুন কিছু তর্কের জন্ম দিয়েছে। তর্কগুলো বড়দের বিষয়ে। তাঁদের কি ভুল হতে পারে না? তাদের ভুল ধরার অধিকার কি আমাদের নেই?' এমন নানা কথা ঘুরপাক খাচ্ছে কিছু মানুষের মনে।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সাহেব মা'হাদের তরুণ আলেমদের উদ্দেশ করে বলেন, 'এখনই এসব তর্ক শুরু করে দেবেন না। আগে শিখুন, পড়ুন।

লম্বা একটা সময় গবেষণার মধ্যে ব্যয় করুন। দু-চার-দশ বছর দেখুন। তারপর যদি আপনার তাহকীকে মনে হয়– বড়দের এ বিষয়টা এমন না হয়ে এমন হবে। ধীরে ধীরে, আদবের সাথে উপস্থাপন করুন। তা না করে এখনি যদি আপনি পরিপক্বতা আর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছাড়া কথা বলা শুরু করেন, একটা সময়ে গিয়ে আপনি নিজেই লজ্জিত হবেন। আমি আমার বয়স থেকেই বলছি। আমার জীবনে বিশ বছরের টগবগে তরুণকে যে মেজাযে দেখেছি, তিরিশ বছর বয়সে যখন তার দু'হাতে ভর করে দু'ছেলে দাঁড়িয়ে আছে তখন তাকে একেবারে বিপরীত চিন্তা লালন করতে দেখেছি। যেই ছেলে তরুণ অবস্থায় কোনো কিছুকেই কিছু মনে করেনি, কর্মজীবনের বারো বছর পার হওয়ার পর তাকে অন্যদের থেকেও নত হয়ে চলতে দেখেছি।

এখন আপনার বেড়ে ওঠার বয়স। এখন মুরব্বীরা যেভাবে সিঞ্চন করতে চাচ্ছেন করতে দিন। যে সার প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন করার সুযোগ দিন। এখন একথা বলবেন না যে, আমার গোড়ায় আমি নাপাক সার প্রয়োগ করতে দেব না। আপনাদের সিঞ্চিত পানি গ্রহণ করার কোনো দরকার আমার নেই। আমি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখন যদি একথা বলেন তাহলে অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যাবেন। চারাগাছ হয়ে বেড়ে ওঠা আপনাকে মুরব্বীরা গবাদি পশু ও কীট-পতঙ্গ থেকে রক্ষা করতে পারবেন না।

সুতরাং এ সময়টায় অন্তত মুরব্বীদের কথার বাইরে না গিয়ে তাদের দেখানো পথে চলুন। তারা যখন কোনো কিছু করতে বলেন, খুব সাহসের সাথে করুন, সময় লাগান। তাদের নাহজ ও ফিকরের বাইরে এমন কিছুতে নিজের জীবনের বাজি লাগিয়ে দেবেন না, যার জন্যে কিছুদিন পর আপনাকেই আফসোস করতে হয় অথবা ঠিক বিপরীত প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে যেতে হয়।'

তলাবাদের উদ্দেশে শেষ কথা

আমরা মজলিসের আলোচনার শেষ দিকে চলে এসেছি। মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সাহেব সেদিনের মজলিসে তলাবাদের উদ্দেশে আরো বিশেষ কয়েকটি নসীহত করে তাঁর আলোচনা শেষ করেন।

নিজেদের মর্যাদার অনুভূতি থাকতে হবে। নিজেদের অবস্থান চিনতে হবে। সমাজের মানুষ না বুঝুক। তারা তো কতো কিছুই বোঝে না। কারো নিজের জমিতে স্বর্ণের খনি থাকলেও সে জমি সামান্য বেশি দাম পেলেই বেচে দেয় শুধুই না জানার কারণে। তাই সমাজের মানুষের বোঝা না বোঝার দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের নিজেদের মাকাম নিজেদেরকেই বুঝতে হবে। এ মর্যাদার অনুভূতি অন্তরে লালন করতে হবে।

সময়কে কাজে লাগাতে হবে। অনেকে সময় ব্যয় হয়ে যাওয়াকে মনে করে সময়কে কাজে লাগানো। অথচ বিষয়টা এমন নয়। সময়কে নষ্ট না করে ইবাদত অথবা আহরণে সময়কে ব্যয় করতে হবে। তাহলেই সময় কাজে লাগবে। মাঝে মাঝে নিজেই নিজের হিসেব নিয়ে দেখতে হবে সময়গুলো কাজে লাগছে কি না।

প্রচুর মেহনত করতে হবে। মেহনত না করলে মানুষ গড়ে ওঠে না। আমরা যখন ছোটবেলায় হাফেজ্জী হুযূর, মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর, শাইখুল হাদীস সাহেব হুযূর, খতীব উবাইদুল হক সাহেবদের মতো বড়দের দেখেছি তখন নিজেদের জ্ঞানস্বল্পতার কারণে মনে করেছি, যোগ্য হতে হলে অনেক বয়স লাগে। অনেক বয়স হলে, অনেক আমল জমা হলে তারপর মানুষ বড় ও যোগ্য হতে পারে। আশি বছরের আগে যে কেউ বড় হতে পারে শৈশবে সেটা আমাদের কল্পনাতেও ছিলো না। তখন তো বুঝিনি কিন্তু এখন দেখছি, যারা বড় হওয়ার ছিলেন তারা ত্রিশ বছরের আগেই বড় হয়ে গেছেন। আগের যামানাতেও হয়েছে, এ যামানাতেও তার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই দীনী আত্মমর্যাদাবোধ থাকতে হবে। ইলমে দীনের ধারক-বাহক হিসেবে কিছুতেই দুনিয়াদারদের থেকে নিজেকে ছোট মনে করা যাবে না। এটা অহঙ্কার নয়। আত্মমর্যাদবোধের সাথে অহঙ্কারের সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। আত্মমর্যাদাবোধের দাবি হলো, তালিবে ইলমী শানের খেলাফ সকল কাজ পরিহার করা। সময়কে কাজে লাগানোর যে মূলনীতি আমি বলেছি আত্মমর্যাদাবোধ থেকেই সেটার তাগিদ অনুভূত হয়ে থাকে।

আমাদের আকাবির ও আসলাফ অনেক মেহনত ও বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে দীন ও শরীয়তকে এত সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে গেছেন। লক্ষ লক্ষ কিতাব লিখে গেছেন। আমরাও যদি মেহনত করি, পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে কিছু রেখে যেতে পারব। এমন যেন না হয় আমরা পৃথিবীর খেলাঘরে এলাম আর কিছুদিন রঙ-তামাশা দেখে চলে গেলাম। আল্লাহ পাক তাওফীক দান করুন। আমীন।

সবক উদ্বোধনী মজলিসে বড়দের নসীহত

গত ১৮ জুন ২০১৯ রোজ মঙ্গলবার মা'হাদের ১৪৪০-৪১ হিজরী শিক্ষাবর্ষের সবক উদ্বোধনী মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। মজলিসে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুহতামিম হযরতুল আল্লাম

মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী হুযূর দা.বা.। মা'হাদের অন্যান্য উস্তাদের পাশাপাশি সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার শাইখে সানী হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব দা.বা.। উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির মজলিসে শূরা প্রধান ও প্রধান মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস, মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা.। আরো উপস্থিত ছিলেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুহাদ্দিস, মা'হাদের মজলিসে শূরা সদস্য মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব দা.বা.।

মজলিসের শুরুতে পবিত্র কালামে পাক থেকে তিলাওয়াতের পর মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা. গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। তিনি বলেন, 'লালবাগের প্রসিদ্ধ উস্তাদ মাওলানা সালাহুদ্দীন সাহেব দা.বা. প্রত্যেক বছরের শুরুতে থানবী রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, ছাত্রদের জন্যে তিনটি কাজ বাধ্যতামূলক- (১) ভালোভাবে মুতালা'আ করা। (২) মনোযোগ দিয়ে সবক শোনা। (৩) তাকরার করা। এগুলোর সাথে সালাহুদ্দীন সাহেব আরেকটি বাড়িয়ে বলতেন, প্রত্যেক ছাত্রের কর্তব্য হচ্ছে, নিজের সারা দিনের আমলসমূহের একটি নিযামুল আওকাত তথা রুটিন তৈরি করা।'

মজলিসের প্রধান মেহমান মাওলানা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী হুযূর দা.বা. সবক উদ্বোধন প্রাক্কালে বলেন, 'হারদুঈ হযরত রহ. বলতেন, পৃথিবীতে চার প্রকার লোক আছে- (১) খারাপ মানুষ। (২) সবচেয়ে খারাপ মানুষ। (৩) ভালো মানুষ। (৪) সবচেয়ে ভালো মানুষ। এই চার প্রকারের মধ্যে চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলো, কুরআনের শিক্ষা অর্জনকারী ও শিক্ষাদানকারী।'

মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব দা.বা. নসীহত করতে গিয়ে বলেন, 'দুনিয়ার কেউ একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে না যে, তার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা কী? কিন্তু তালিবে ইলমের ব্যাপারে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের ফায়সালা করেছেন। কারণ, হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যার ব্যাপারে কল্যাণ চান তাকেই দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।'

মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা. আরো বলেন, 'এখন তোমাদের সামনে সময় এবং উপকরণ দুটোই উপস্থিত। সুতরাং এ সময়টাকে গনীমত মনে করে কাজে লাগাও। কিছুদিনের মধ্যেই তোমরা অনেকে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। তখন তোমরা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সময় কিংবা উপকরণের অভাবে গভীর অধ্যয়ন করতে পারবে না।'

তিনি আরো বলেন, ‘সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের দলে থাকতে হলে আমাদেরকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. একবার গওহরডাঙ্গা মাদরাসার দফতরে বসা ছিলেন। সামনে সরিষার ক্ষেত দেখা যাচ্ছিলো। পুরো ক্ষেতে সরিষা ফুল ফুটে চমৎকার এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিলো। সদর সাহেব রহ. উপস্থিত উলামায়ে কেরামকে বললেন, এই চমৎকার দৃশ্য আমাদের সামনে তখনই এসেছে যখন এর পেছনে কিছু বীজ মাটির সাথে নিজেদের বিলীন করে দিয়েছে এবং আমাদের আনন্দিত করার ব্যবস্থা করেছে। আমরাও যদি এ জগতের বুকে কোন অবদান রাখতে চাই, পৃথিবীবাসীকে আনন্দিত করতে চাই, তাহলে এমনিভাবে নিজেদেরকে বিলীন করে দিতে হবে।’

মূল্যবান এ আলোচনার পর মুমিনপুরী হুযূর দা.বা. সকল বিভাগের ছাত্রদের প্রথম সবক শুনে আনুষ্ঠানিকভাবে সবক ইফতিতাহ করে দেন। এরপর দু‘আর মাধ্যমেই মজলিসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মা’হাদ প্রাঙ্গনে কানুনের মজলিস

১৪৪০-৪১ হিজরী শিক্ষাবর্ষে ছাত্ররা যেন মা’হাদে অবস্থান, দরসগ্রহণ ও আমল-আখলাকসহ সকল বিষয়ে নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হতে পারে, সেজন্যে ভর্তির কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর সব ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের উপস্থিতিতে ১৭ জুন ২০১৯ রোজ সোমবার অনুষ্ঠিত হয় কানুনের মজলিস। মা’হাদের আসাতিযায়ে কেরামের পাশাপাশি এ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার নায়িবে মুফতী ও সিনিয়র শিক্ষক, মা’হাদের ইলমে ইকতিসাদের উস্তাদ মুফতী সাঈদ আহমাদ দা.বা.।

এ মজলিসের উদ্বোধনী আলোচনায় মা’হাদের সম্মানিত মুদীর মুফতী মাহমূদুল আমীন সাহেব ছাত্রদের উদ্দেশ্যে করা মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহ. এর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। নদবী রহ. সেখানে বলেছেন, ‘আমি আল্লাহর ঘর মসজিদের মিম্বারের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, তোমাদের প্রত্যেকে একেকটি হীরকখণ্ডের অধিকারী। আর সেই হীরকখণ্ড হলো, তোমাদের জীবনের সুপ্ত যোগ্যতা। শিক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা, আনুগত্যের যোগ্যতা এবং উত্তম থেকে উত্তম হওয়ার যোগ্যতা।

মুদীর সাহেব আরো বলেন, ‘কেউ যদি সত্যিকারের ছাত্র হতে চায় তাহলে তাকে প্রথম দিন থেকেই নিজেকে ভালো মনে করা ও নিজেকে যোগ্য মনে করার অহমিকা দূর করতে হবে।’

মা’হাদের আমীনুত তা’লীম মুফতী হাফীজুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘আমরা যারা মাদরাসায় পড়াশোনা করতে এসেছি তাদেরকে পুরো পৃথিবীতে চলমান স্রোতের সাথে মোকাবিলা করে আসতে হয়েছে। কারণ, পুরো পৃথিবীতে এখন চলছে অন্যায়ের জয়জয়কার। ভালো এবং ন্যায়নীতি আজ পৃথিবী থেকে বিলুপ্তপ্রায়। এমন সময়ে হক ও হক্কানিয়াতের ঝাণ্ডা উত্তোলন করার জন্যে আমরা মাদরাসায় আসার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের এই আসা যেন গতানুগতিক না হয়। আমাদের হৃদয়ে যেনো এই স্রোতের বিপরীত চলার মূল উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি চিরজাগরুক থাকে।’

মজলিসের সর্বশেষ আলোচনায় হযরত মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব দা.বা. বলেন, আমাদের ভেতর আর বাহির এক রাখতে হবে। কোন কিছু মনে একরকম রেখে মুখে ভিন্নভাবে প্রকাশ করা যাবে না। ঈমানদারের সিফাত হলো তার বহ্যিক অবস্থা আর আভ্যন্তরীণ অবস্থা এক থাকে; বরং ভেতরটা বাহির থেকে উত্তম থাকে। তিনি আরো বলেন, ‘গুনাহ মানুষ সাধারণত চার কারণে করে থাকে। (ক) শয়তানের ধোঁকা। (খ) নফসের প্ররোচনা। (গ) অসৎসঙ্গ। (ঘ) গুনাহের অভ্যাস।

প্রথম তিনটির ব্যাপারে মানুষ সতর্ক থাকলেও শেষোক্তটির ব্যাপারে তারা উদাসীন। অথচ গুনাহ ছাড়তে হলে গুনাহের অভ্যাস ত্যাগ করা খুবই জরুরী। এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত। আমরা মনে করি, মানুষ অভ্যাসের দাস। সুতরাং তার যদি কোন একটা জিনিসের অভ্যাস হয়ে যায়, তাহলে সেটা পরিত্যাগ করা প্রায় অসম্ভব। এই ধারণা দূর করার জন্যেই আল্লাহ তা’আলা রমাযানের রোজাকে ফরজ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন অভ্যাসের দাস না হয়ে অভ্যাসকে নিজের দাস বানাতে সক্ষম হয়।

বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট করে বলছি। আমরা যে রমাযানে রোযা রাখি তা দ্বারা উদ্দেশ্য কি উপবাস? তা কিন্তু নয়। উপবাস থাকাটা রোজার মূল উদ্দেশ্য নয়। উপবাস উদ্দেশ্য হলে বলা হতো, রমাযানের বাইরে তো তিনবার খাওয়া হয়, সুতরাং রমাযানে একবারের বেশি খাওয়া যাবে না। এরকম আদেশ হলে উপবাসকে রমাযানের উদ্দেশ্য বলা যেতো। কিন্তু যেহেতু রোজার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের অভ্যাসকে পরিবর্তন করার সবক দেওয়া এবং মানুষের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনা। সে জন্যে রাতে বান্দা যতোই খাওয়া-দাওয়া করুক না কেন, তাকে কিছুই বলা হবে না।

এ কারণেই দেখা যায়, রমাযান ছাড়া আমরা সাধারণত তিন বেলা খাবার খাই। সকাল, দুপুর, রাত। রমাযানে এসেও দেখা যায় আমরা তিনবেলাই

খাচ্ছি। সাহরী, ইফতার, রাতের খাবার। রমাযান এসে শুধু এতটুকু করছে যে, খাবারের ব্যাপারে আমাদের আগের সময় তথা অভ্যাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। এ পরিবর্তন দ্বারা মানুষকে একথা বোঝানো হচ্ছে যে, খাবারের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে যখন অভ্যাসকে পরিত্যাগ করা সম্ভব, সুতরাং অন্যান্য বিষয়েও অভ্যাসকে পরিত্যাগ করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে যখন সে অভ্যাস হয় মন্দকাজ বা গুনাহের অভ্যাস তখন তো সেটা পরিত্যাগ করা জরুরী হয়ে পড়ে।'

মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেবের আলোচনা শেষে তাঁর দু'আর মাধ্যমে মজলিসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৪৪০-৪১ হিজরী শিক্ষাবর্ষে মা'হাদের বার্ষিক মাহফিল

২০১৯ ঈসায়ীর ১১ নভেম্বর সোমবার মুহাম্মাদপুরস্থ বসিলা গার্ডেন সিটি মসজিদ সংলগ্ন মাঠে এ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বা'দ আসর থেকে শুরু হওয়া এ মাহফিলের সূচনা পর্বের বক্তব্যে মাওলানা আবূ সায়েম সাহেব বলেন, 'এসকল দীনী মাহফিল আয়োজনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে উলামায়ে কেরামের নিকট অর্পিত আমানত জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া। সে আমানত যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্যেই আজকের এই আয়োজন।'

বাদ মাগরিবের বয়ানে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলাম টাইমস টোয়েন্টিফোর ডটকম-এর সম্পাদক মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সাহেব বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মুমিনের সফলতার যেসকল শর্ত উল্লেখ করেছেন আমরা যদি সেগুলো পূরণ করতে পারি, তাহলে আমরা পিতা-মাতা থেকে সম্পদের ওয়ারিস হওয়ার মতোই মজবুতভাবে জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী হবো।'

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার স্বনামধন্য মুহতামিম মাওলানা হিফজুর রহমান (মুমিনপুরী হুযূর) দা.বা. মুসলমানদের জীবনে ঈমান, ইসলাম, আমল ইত্যাদি নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'মুমিনের জীবনের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত হলো ইলমে দীনের নিয়ামত। এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলে মুসলিম জাতির অবস্থা হবে বুখারা-সমরকন্দের মুসলমানদের মতো।'

মাহফিলের প্রধান মেহমান, দেশবরেণ্য আলেমে দীন আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী দা. বা. বলেন, দীনে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দীন। এতে নতুন কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার কোন অবকাশ নেই। করলে সেটা হবে বিদ'আত। বিদ'আত যদি কুফরের পর্যায়ের হয় তাহলে তো এর পরিণাম চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আর কুফরের পর্যায়ের না হলেও সেটা গোমরাহী– এর কারণেও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হবে।'

সভাপতির বক্তব্যে মা'হাদের প্রধান মুফতী জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা. বলেন, 'এখন রবিউল আউয়াল মাস। এ মাসেই আগমন করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর আগমন আমাদের জন্য অবশ্যই খুশির কারণ। তবে এ খুশি প্রকাশ করতে গিয়ে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মর্যাদা দিতে গিয়ে কোনো কুফর-শিরকে লিপ্ত হওয়া যাবে না।'

মা'হাদের আসাতিজা ও মাহফিলে আমন্ত্রিত দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরামের হাতে বিগত দু'বছরের ফারেগীন ছাত্রদের দস্তারে ফযীলত প্রদান করা হয়। এসময় আগত মেহমান ও মাহফিলের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে শুকরিয়া জানান মা'হাদের মুদীর মুফতী মাহমূদুল আমীন সাহেব।

ইন্তেজামিয়া কমিটির ব্যবস্থাপনা ও এলাকাবাসীর সর্বাত্মক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে আরো উপস্থিত ছিলেন মা'হাদের পরিচালনা পর্ষদ, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীগণ। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মাদরাসার উলামা-তলাবাসহ সর্বস্তরের দীনদার মুসলমানগণ।

মা'হাদের কলমারচর শাখার বার্ষিক মাহফিল

রাজধানীর কেরানীগঞ্জের কলমারচরে মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার কলমারচর শাখার বার্ষিক ওয়াজ ও দু'আর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ জানুয়ারি ২০২০ বাদ আসর থেকে মাদরাসা সংলগ্ন মাঠে এ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মাহফিলে বাদ মাগরিবের বয়ানে মাওলানা শাহেদুল ইসলাম সাহেব বলেন, 'আমরা যতগুলো অঙ্গ দ্বারা গুনাহ করি তার মধ্যে অন্যতম হল জিহ্বা। যদি আমরা জিহ্বা নামক অঙ্গটির হিফাযত করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ অনেক বড় বড় গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকতে পারব।'

মা'হাদের সম্মানিত শিক্ষাসচিব মুফতী হাফিজুর রহমান সাহেব বলেন, 'বয়ান শোনা বড় বিষয় নয়; আমল কতটুকু করলাম এটাই বড় বিষয়। আমরা অনেক কিছুই শুনি বুঝি; কিন্তু আমল কতটুকু করি? অথচ আমাদের সফলতা তো আমল করার মধ্যেই।'

বা'দ ইশা জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুহতামিম মাওলানা হিফজুর রহমান (মুমিনপুরী হুযূর) দা.বা. বান্দার প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর দেওয়া এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা বান্দার উপর অপরিহার্য। শুকরিয়া আদায়ের অনুভূতি আমাদের মধ্যে তখনই আসবে, যখন দীনের সহীহ বুঝ আমাদের ভিতর আসবে। আর দীনের সহীহ বুঝ আসবে দীনী মাদারিস দ্বারা। তাই এগুলোর যথাযথ কদর করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।'

মাহফিলের প্রধান মেহমানের বক্তব্যে দেশবরেণ্য আলেমে দীন আল্লামা আব্দুল মতীন বিন হুসাইন সাহেব দা.বা. বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার ইশক-মহব্বত ও ভালোবাসা-ই মানুষের জীবনের একান্ত চাওয়া-পাওয়া হতে হবে। যে আল্লাহকে পেয়ে গেল সে সব পেয়ে গেল, আর যে আল্লাহকে হারাল সে যেন সবই হারাল।' তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ পাকের ইশক ও মহব্বতের স্বাদ দুনয়িার সকল স্বাদের চেয়ে অধিক শ্রেয়। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তার ইশক ও মহব্বতের স্বাদ আস্বাদনের তাওফীক দান করুন।'

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মা'হাদের প্রধান মুফতী মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা. সভাপতির বক্তব্য পেশ করেন। তিনি কলমারচরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আল্লাহর অনেক বড় নিয়ামত যে, এখানে একটি দীনী প্রতিষ্ঠান হয়েছে। এর উসীলায় আল্লাহ তা'আলা এলাকাবাসীর ওপর রহমত বরকত নাযিল করবেন এবং আযাব ও গযব থেকে হিফাযত করবেন ইনশাআল্লাহ।

বাদ ইশা আগত মেহমান ও মাহফিলের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে শুকরিয়া জানান মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার সম্মানিত মুদীর মুফতী মাহমূদুল আমীন। তিনি তার বক্তব্যে মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া ও এর কলমারচর শাখা মাদরাসা দারুল আবরারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও তুলে ধরেন।

ইন্তেজামিয়া কমিটির ব্যবস্থাপনা ও এলাকাবাসীর সর্বাত্মক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে আরো উপস্থিত ছিলেন মাদরাসার পরিচালনা পর্ষদ, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীগণ। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মাদরাসার উলমা-তলাবা সহ সর্বস্তরের দীনদার মুসলমানগণ।

মা'হাদ প্রাঙ্গনে উলামায়ে কেরামের শুভাগমন

মা'হাদের নিয়মতান্ত্রিক তালীম ও তারবিয়াতী প্রোগ্রামের পাশাপাশি প্রায়ই শুভাগমন ঘটে দেশ বরেণ্য উলামা হযরত ও পীর মাশায়েখের। যাদের পদচারণায় ধন্য হয় মা'হাদ। আত্মিকভাবে উৎকর্ষিত হয় উলামা-তলাবা ও আপামর জনসাধারণ। ১৪৪০-৪১ ও ১৪৪১-৪২ হিজরী শিক্ষাবর্ষেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। দারুত তাসনীফ কর্তৃক মজলিসগুলোর খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৪৪১-৪২ হিজরী শিক্ষাবর্ষের মজলিসগুলোর খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন মা'হাদের ইফতা ১ম বর্ষের ছাত্র *মুহাম্মাদ মনসূরুল হক*।

মাওলানা আফজাল হুসাইন কাইমুরী দা.বা.

গত ১৯ মার্চ ২০২০ তারিখে মা'হাদে আগমন করেন মাদারে ইলমী দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষাসচিব মাওলানা আফজালুর রহমান কাইমুরী দা.বা.। বৃহস্পাতবার দিবাগত রাতে আগমন করে তিনি মা'হাদে রাত্রিযাপন করেন। পরদিন শুক্রবার সকাল ৭.৩০ টায় মা'হাদের ছাত্রদের উদ্দেশে ঈমানের পরিপূর্ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমানের দাবী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করেন।

২০ মার্চ তারিখ শুক্রবার তিনি ঢাকার আরো কয়েকটি স্থানেও বয়ান করার জন্য গমন করেন। তবে সেসব বয়ান শেষে বিশ্রামের জন্য তিনি পুনরায় মা'হাদেই আগমন করেন। সে কারণে মা'হাদ শুক্রবার সারাদিনই তার বরকতময় সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়। পুরো একদিন মা'হাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে শুকরিয়া ও সন্তোষ প্রকাশ করে শুক্রবার বিকালে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন।

মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেব দা.বা.

মা'হাদে বরাবরই দেশ-বিদেশের মুরব্বী উলামায়ে কেরাম ও অনুসরণীয় ব্যাক্তিবর্গের আগমনের ধারাবাহিকতা রয়েছে। মা'হাদের বার্ষিক মাহফিল উপলক্ষে গত ১১/১১/২০১৯ তারিখে আগমন করেন বর্তমান সময়ের বিখ্যাত আলেমে দীন, মুনাযিরে যামান, তরজুমানে আহলে হক মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপূরী দা.বা.। মা'হাদের মাহফিলে তিনি বাদ ইশা বয়ান পেশ করেন। বয়ানের আগে ও পরে দীর্ঘ সময় তিনি মা'হাদের উস্তাদ ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামের সাথে গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় করেন।

মুফতী দিলাওয়ার হুসাইন সাহেব দা. বা.

গত ১৩/০২/২০২০ তারিখে মা'হাদে আগমন করেন বাংলাদেশের অন্যতম খ্যাতিসম্পন্ন মুফতী, মুফতী দিলাওয়ার হুসাইন সাহেব দা.বা.। সকাল ১০টা থেকে মা'হাদের ইফতা বিভাগের তালিবে ইলমদের উদ্দেশে তিনি ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ মুহাযারা (আলোচনা) পেশ করেন। মা'হাদের ব্যবস্থাপনা ও তা'লীমী পরিবেশ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ সাহেব দা.বা.

গত ২৯/১০/১৪৪০ হিজরী মোতাবেক ০৩/০৭/২০১৯ ঈসায়ী তারিখে মা'হাদে আগমন করেছিলেন বর্তমান সময়ের নন্দিত আলেমে দীন, বিশিষ্ট লেখক ও সম্পাদক মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ সাহেব দা.বা.। বাদ যোহর তিনি মা'হাদের ছাত্রদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি মা'হাদের উস্তাদ ও ছাত্রদের সাথে নিজের গভীর হৃদ্যতার কথা প্রকাশ করেন।

মাওলানা হাসান জামিল সাহেব দা.বা.

তখন চলছিলো লকডাউন। মাদরাসায় নেই আগের মত ছাত্র-উস্তাদের সেই মুখরিত পরিবেশ। সবাই যার যার বাড়িতে। গুটিকয়েকজন ছাত্র ছিলেন মাদরাসার রক্ষণাবেক্ষণে। দীর্ঘদিন একাকী থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনায় পড়ে গেছে। হঠাৎ এক বিকেলে এলেন প্রখ্যাত ওয়ায়েয, বাইতুল মা'মুর জামে মসজিদের সম্মানিত খতীব মাওলানা হাসান জামিল সাহেব দা.বা.। দারুল ইফতায় কিতাবের সম্ভার দেখে বিমুগ্ধ হলেন তিনি। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কিতাবের প্রতি তার পরম আগ্রহের কথা শোনালেন। অল্প সময়েই তার আগমন সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই জমা হয়ে গেল। সবাইকে নিয়ে বসলেন তিনি। উৎসাহমূলক বক্তব্য পেশ করলেন। তিনি বললেন, সারা দুনিয়া যখন গোমরাহীর জালে ছেয়ে গেছে, তখন কিভাবে এ কওমী দুর্গগুলো আশ্রয়কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করছে। হযরতের বক্তব্যে আমরা সবাই যেন ফিরে পেলাম হারিয়ে যাওয়া উদ্দীপনা। নব উদ্দ্যমে পথচলার প্রেরণা খুঁজে পেলাম।

মাওলানা শামছুল আলম সাহেব দা.বা.

১৮ জানুয়ারি ২০২১ ঈসায়ী। বা'দ ইশা মা'হাদে আগমন করলেন করাচীর হযরত শাহ্ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ.-এর খলীফা হযরত মাওলানা শামছুল আলম (বগুড়ার পীর সাহেব) দামাত বারাকাতুহুম। সাক্ষাত ও আহার পর্ব শেষে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়লেন। শেষরাতে তাহাজ্জুদের জন্য আমরা

প্রায় সবাই উঠে গেলাম। দ্বিতীয় বর্ষের বড় ভাইদের আবেদনে পীর সাহেব এলেন আমাদের মাঝে। যিকির-আযকারের পর হাত তুললেন সবাইকে নিয়ে। সে ছিলো এক যিন্দা মুনাজাত। আহ! কলমের ভাষায় কিভাবে বুঝাব আমি ঐ মাকবুল মুনাজাতের অনুভব ও অনুভূতি? প্রাপ্তির বুকভরা আশা নিয়ে সমাপ্ত হলো মুনাজাত। একটি জীবন্ত মোনাজাতে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য পেয়ে সবাই আবেগ উদ্বেলিত হলো।

ফজরের পর সমবেত হলেন আসাতিযায়ে কেরাম ও তালিবে ইলমগণ। মসজিদ থেকে মুসুল্লী ভাইয়েরা এলেন। জায়গা যেন আর ধরে না। চেপে চেপে বসলেন সবাই। আয়াত, হাদীস, শে'র আশআর, বড়দের কওল-আকওয়ালের উদ্ধৃতিতে প্রায় এক ঘণ্টা বয়ান চলল।

হযরতের পুরো বয়ানই ছিলো কুদৃষ্টির ভয়াবহ পরিণাম বিষয়ে। তিনি বলেন– যখনই আমি কুদৃষ্টি করি, সাথে সাথে আমার নামের পাশে তিন তিনটি উপাধি সেট হয়ে যায়।

এক. নাফরমান। কারণ মহান আল্লাহ তা'আলা হুকুম করেছেন,

> হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখে। (সূরা নূর; আয়াত ৩০)

মাওলা পাকের এ নির্দেশ লঙ্ঘন করে আমি নাফরমানী করেছি।

দুই. যিনাকার বা ব্যভিচারী। কারণ রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> চোখের ব্যভিচার হলো কুদৃষ্টি করা। (সুনানে বাইহাকী; হাদীস ৭০৬০)

তিন. মালউন। কারণ নবী-যবানে উচ্চারিত হয়েছে,

> যে কু-দৃষ্টি করে এবং যার প্রতি কুদৃষ্টি করা হয়, উভয়কেই মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু অভিশাপ করেছেন। (সুনানে বাইহাকী; হাদীস ১৩৯৫০)

হাফেয আব্দুল হক সাহেব দা.বা.

১৮ ই জানুয়ারী ২০২১। সকাল আট ঘটিকার দিকে মা'হাদে আগমন করেন কুরআনের খেদমতে উৎসর্গপ্রাণ বিশ্ববরেণ্য ক্বারী হাফেয আব্দুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। বগুড়ার হযরত আগে থেকেই ছিলেন। দুই বরেণ্য বসে কিছুক্ষণ খোশালাপ করলেন। একত্রে নাস্তায় শরীক হলেন। এরপর ক্বারী সাহেব মা'হাদের তালিবে ইলমদের মশক করালেন। পরিশেষে মা'হাদের আসাতিযা, তলাবা ও শুভাকাঙ্ক্ষী এবং নিজস্ব জমিতে প্রস্তাবিত ভবনের জন্য দিল খুলে দু'আ করে মা'হাদকে বিদায় জানান।

মুফতী নূরুল আমীন সাহেব দা.বা.

এ শিক্ষাবর্ষে সর্বমোট পাঁচবার আগমন করেন খুলনার প্রসিদ্ধ পীর সাহেব, খুলনা দারুল উলূমের সাবেক প্রধান মুফতী, করাচী হযরতের বিশিষ্ট খলীফা, হযরত মুফতী নূরুল আমীন সাহেব দা.বা.। হযরত যখন তাশরীফ আনেন, আশপাশ থেকেও অনেক ভক্ত-অনুরক্ত সোহবত ও দু'আ কামনায় ছুটে আসেন। হযরতের বিভিন্ন সময়ের বয়ানের কিছু টুকরো অংশ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

শুধু যোগ্যতা ও মালাকার নাম ইলম নয়; বরং 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন'-এর নাম ইলম। প্রশ্ন হতে পারে, কিভাবে বুঝব আমার 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' হাসিল হচ্ছে? বুযুর্গানে দীন অভিজ্ঞতার আলোকে চারটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন-

ক. সবর ও ধৈর্য্য আসবে।

খ. ইস্তিআনাত ও আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার মানসিকতা তৈরি হবে।

গ. তাওয়াক্কুল ও খোদার উপর ভরসার মনোভাব তৈরী হবে।

ঘ. সব কিছুতে মাওলা অভিমুখী হবে।

আরেকদিনের বয়ানে তিনি বলেন, পৃথিবীর সবকিছুর বিরতি থাকতে পারে। সবার অবসর যাপনের অধিকার আছে। কিন্তু 'নফস' নামক সদা তৎপর এ মানব শত্রুর নিয়ন্ত্রণ ও শুদ্ধিতে কোন অবসর ও বিরতি নেই। নফসের শুদ্ধিতে যদি বিরতি আসে তাহলে মরদূদ শয়তান হতে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবে? কিভাবে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচবে?

দাওয়াতুল ইসলাম বাংলাদেশের জিম্মাদারদের আগমন

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ায় গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২০, সোমবার আগমন করেছিলেন অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত সংগঠন দাওয়াতুল ইসলামের যিম্মাদার জামি'আতুল উলূমিল ইসলামিয়ার উস্তাদ মাওলানা জহিরুল ইসলাম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। যোহরের পর তিনি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত হওয়ার বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করে অমুসলিম ও অবহেলিত মুসলিমদের মাঝে দাওয়াতী কাজের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। একটি নির্মম সত্য হিসেবে তিনি বলেন, পাতালে ইসলাম নামে যে একটা ধর্ম আছে পাহাড়ের অনেক মানুষ তা জানেই না। তিনি এও বলেন যে, দাওয়াতুল ইসলামের নাম জরুরী না, কাজ জরুরী। সুতরাং যে শিরোনমেই হোক এ কাজটা আমাদের করতে হবে।

বরেণ্যদের পদচারণায় মা'হাদের ইসলাহী মজলিস

মানুষের বাহ্যিক সুস্থতার জন্য পরিমিত বিশুদ্ধ খাবারের প্রয়োজন পড়ে; ঠিক তেমনি অন্তরের সুস্থতার জন্যও কিছু পদক্ষেপ দরকার পড়ে। আত্মশুদ্ধির পরিভাষায় যেটাকে বলা হয় রূহানী গেযা বা আত্মার খোরাক। বর্তমান সময়ে উলামায়ে কেরাম মানুষের আত্মিক সংশোধন, সুস্থ মানসিকতা গঠন ও ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টির জন্য ইসলাহী মজলিসের শিরোনামে মেহনত করে যাচ্ছেন। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় পরিসরে ইসলাহী মজলিসের আয়োজন করা হচ্ছে।

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়াও দীনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রেখে থাকে। প্রতি মাসেই এখানে নিয়মিত ইসলাহী মজলিসের আয়োজন করা হয়। সে ধারাবাহিকতায় ১৪৪২-৪৩ হিজরী শিক্ষাবর্ষেও মা'হাদে নিয়মতান্ত্রিক ইসলাহী মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি মজলিসের চুম্বকাংশ পাঠকের জন্য পরিবেশন করেছেন মা'হাদের ইফতা ১ম বর্ষের ছাত্র *মৌলবী আস'আদুয্যামান*।

মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.

করোনার দীর্ঘ বিরতির পর ২২ মে ২০২০ ঈসায়ী রোজ সোমবার, বাদ মাগরিব মা'হাদ কর্তৃক আয়োজিত প্রথম ইসলাহী মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। এ মজলিসের মধ্যমণি ছিলেন প্রাণপ্রিয় উস্তায, অসংখ্য উলামা-তলাবার মুরুব্বী হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা.বা.। হুযূর সেদিন অসুস্থ ছিলেন। তারপরও হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় এক চিলতে হাসি নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হন। আল্লাহ তা'আলা হুযূরকে পরিপূর্ণ সুস্থতা ও দীর্ঘ নেক হায়াত নসীব করুন। আমীন।

মজলিসের শুরুতেই হুযূর বলেন, লকডাউনের কারণে দীর্ঘদিন আমরা সবাই এভাবে একসঙ্গে বসতে পারিনি। অথচ ঈমানদাররা একসাথে বসলে ঈমান তাজা হয়। সাহাবায়ে কেরামও একে অপরকে একথা বলে আহ্বান করতেন, এসো! আমরা সামান্য সময় এক সাথে বসে ঈমানী মুযাকারা করি। আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন আযাব-গযব সম্পর্কে হুযূর বলেন, এগুলোর মূল কারণ হলো

আমাদের গুনাহ। গুনাহ যতো বেশি হয় আল্লাহর আযাবও ততো ব্যাপক হয়। সুতরাং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। হুযূর উলামায়ে কেরামের সোহবত সম্পর্কে বলেন, কুরআন হলো একটি পরশপাথর। এর সংস্পর্শে যারা আসবে তারা আল্লাহর রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে যাবে। কুরআনের বাহক উলামায়ে কেরামও পরশ পাথরের মতো। তাদের সোহবতেও মানুষ আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়।

মুফতী মনসূরুল হক সাহেব হুযূরের বয়ানের প্রথম পর্ব শেস হলে ইশার নামায অনুষ্ঠিত হয়। ইশার নামাযের পর চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। পরিশেষে দু'আর মাধ্যমে এ মহতি মজলিস সমাপ্ত হয়।

আল্লামা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী দা.বা.

১৩ জুন ২০২০ ঈসায়ী রোজ মঙ্গলবার, বাদ মাগরিব মা'হাদে অনুষ্ঠিত ইসলাহী মজলিসে তাশরীফ এনেছিলেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ হযরতুল আল্লাম হিদায়াতুল্লাহ (মুহাদ্দিস সাহেব) রহ. এর সুযোগ্য সাহেবযাদা, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার স্বনামধন্য প্রিন্সিপাল আল্লামা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী হুযূর দা.বা.।

হুযূর বয়ানে বলেন, মানুষের মধ্যে যেমন শারীরিক রোগ রয়েছে তেমন আত্মিক রোগও রয়েছে। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, শারীরিক রোগের চিকিৎসা করা সুন্নাত আর আত্মিক রোগের চিকিৎসা করা ফরযে আইন। হযরত আবরারুল হক রহ. উদাহরণ দিয়ে বলতেন, 'যদি কোন পানির ট্যাংক পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে; পাশাপাশি ট্যাংকের নিচে ছিদ্রও থাকে এবং সেটাকে বন্ধ করা না হয়, তাহলে একসময় ট্যাংকের পানি নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি ইবাদতের সাথে সাথে যদি গুনাহ থেকে বিরত থাকা না হয় তাহলে এক সময় সব নেকিও নষ্ট হয়ে যাবে।'

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

> 'তোমরা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো।' (সূরা আনআম; আয়াত ১২০)

এ আয়াত থেকে বুঝে আসে যে, মানুষের জন্য বাহ্যিক ও আত্মিক উভয় প্রকার সংশোধনই জরুরী। কেননা অন্তরই মানুষের মূল চালিকাশক্তি। যখন কারো অন্তর গুনাহের কালিমায় কলুষিত ও কদার্য হয়ে যায় তখন এর দ্বারা তার বাহ্যিক অবস্থাও মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়।

গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি হিসেবে হুযূর হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেন–

> তুমি হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকো। এতে তুমি আল্লাহর কাছে সবচে বড় ইবাদতকারী হিসেবে গণ্য হবে। (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ২৩০৫, মুসনাদে আহমাদ; হাদীস ৮০৮১)

হুযূর আরো বলেন, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য দু'টি জিনিস হাসিল করা আবশ্যক। এক. হুব্বুল্লাহ (আল্লাহর মহব্বত)। দুই. খাশয়াতুল্লাহ (আল্লাহর ভয়)। এই দু'টি জিনিস এমনিতেই হাসিল হয় না; বরং কোন কামেল মুখলিস আল্লাহওয়ালার কাছে গিয়ে কিছু সময় মেহনত-মুজাহাদা করে হাসিল করতে হয়।

মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব দা.বা.

১৪ জুলাই ২০২০ ঈসায়ী রোজ সোমবার, বাদ মাগরিব মা'হাদে অনুষ্ঠিত ইসলাহী মজলিসে আগমন করেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার শাইখে সানী হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মানিকগঞ্জী হুযূর দা.বা.। হুযূর বয়ানে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। তন্মধ্যে ঈমান ও ইসলাম হলো সবচে বড় নিয়ামত।

নিয়ামতের অনুভূতি ও উপলব্ধির ব্যাপারে হুযূর একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা বর্ণনা করেন। 'এক ব্যক্তির কাছে জুতা ক্রয় করার টাকা ছিল না। সে আক্ষেপের তাড়নায় মনে মনে বলল, হায়রে! আমার এমনই পোড়া কপাল! আমি কি আল্লাহর এতটাই অপ্রিয় হয়ে গেলাম যে, জুতা কেনার টাকাও নেই! কিছুক্ষণ পর লোকটি উযূ করার জন্য পুকুরে গেল। দেখলো এক লোকের পা'ই নেই। তখন লোকটির মনে এই অনুভূতি হলো যে, আল্লাহ তা'আলা তো আমাকে দু'টি পা দিয়েছেন; কিন্তু এই মানুষটির তো পা'ই নেই। এটা ভেবে সে নিজ অবস্থার উপর মনে-প্রাণে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলো।'

হুযূর আরো বলেন, আমাদের সঠিক পদ্ধতিতে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রকার নিয়ামত বাড়িয়ে দিবেন। শুকরিয়া আদায়ের সঠিক পদ্ধতি হলো, প্রতিটি নিয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। এটাই প্রকৃত শুকরিয়া। সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের যে নিয়ামত দিয়েছেন তার সঠিক শুকরিয়া হলো নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে ঈমানের পথে পরিচালিত করা।

মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব দা.বা.

১৫ আগস্ট ২০২০ ঈসায়ী রোজ মঙ্গলবার, বাদ মাগরিব ইসলাহী মজলিসে বয়ান করেন হযরত পাহাড়পুরী হুযূর রহ. এর খলীফা, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার সিনিয়র মুহাদ্দিস, মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেব দা.বা.।

হুযূর বলেন, শুধু ইলম অর্জনই নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ইলম অনুযায়ী আমলও করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের যেখানেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে আমলকে শর্তযুক্ত করেছেন। হাসান বসরী রহ. বলতেন, 'আমল করা ব্যতীত জান্নাতের আশা করাও গুনাহ'। ইমাম গাযালী রহ. বলতেন, 'যে ইলম তোমাকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারে না সে ইলম কিভাবে তোমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে?'

মুফতী রিযওয়ানুর রহমান সাহেব দা.বা.

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ঈসায়ী রোজ সোমবার মা'হাদের ইসলাহী মজলিসে আগমন করেন এদেশের অসংখ্য উলামায়ে কেরামের একান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব দা.বা.-এর বড় সন্তান মুফতী রিযওয়ানুর রহমান সাহেব দা.বা.। তিনি একাধারে মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এবং প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব দা.বা.-এর খলীফা ও জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার স্বনামধন্য উস্তায।

মুফতী রিযওয়ানুর রহমান সাহেব বলেন, আল্লাহ তা'আলাকে চেনার অন্যতম একটি উপায় হলো তাঁর নিয়ামতরাজী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। কুরআনে কারীমে সূরা আলে ইমরানের ১৯০তম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

> 'নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে।'

অপরদিকে সূরা যারিয়াতের ২১তম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

> 'তোমাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে (আল্লাহকে চেনার) নিদর্শন। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?'

মুফতী রিযওয়ানুর রহমান সাহেব আরো বলেন, পৃথিবীতে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নেক বান্দা হওয়া। আর সেজন্য আল্লাহর নেক বান্দাদের সোহবত অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

মা'হাদের নিজস্ব জমি প্রাপ্তি উপলক্ষে
দু'আ মাহফিল

দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষা কারিকুলাম ও আদর্শে পরিচালিত মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া ২০১১ ঈসায়ী মোতাবেক ১৪৩২ হিজরী সন থেকে এ যাবৎকাল পর্যন্ত তার সকল কার্যক্রম বসিলা গার্ডেন সিটির ভাড়া করা বাড়িতেই পরিচালিত করে আসছিলো। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তাঁরই এক নেক বান্দা আলহাজ্ব মুহাম্মাদ শাহজাহান কবির সাহেবের বদান্যতায় ইতোমধ্যে বসিলা গার্ডেন সিটিতেই মা'হাদের স্থায়ী জমির সুব্যবস্থা হয়েছে। আলহাজ্ব মুহাম্মাদ শাহজাহান কবির সাহেব-সহ মা'হাদের উপদেষ্টা পরিষদ, পরিচালনা পরিষদ, শুভাকাঙ্ক্ষীবৃন্দ ও আসাতিযায়ে কিরামের উপস্থিতিতে গত ৫ ডিসেম্বর ২০২০ ঈসায়ী রোজ শনিবার মা'হাদ মিলনায়তনে এক দু'আ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দু'আ মাহফিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেছেন মা'হাদের ইফতা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র *মৌলবী নাসিরুদ্দীন*।

মা'হাদের জন্য এ ছিলো এক স্মরণীয় দিন। মা'হাদ প্রাঙ্গনে একে একে উপস্থিত হন– জামি'আ রাহমানিয়ার স্বনামধন্য মুহাদ্দিস মা'হাদের প্রধান মুফতী, মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা., জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার নায়েবে মুহতামিম, মুফতী ইবরাহীম হেলাল সাহেব দা.বা., জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার নায়েবে মুফতী, মা'হাদের ইকতিসাদ বিষয়ক সম্মানিত উস্তায মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব দা.বা.। চির চেনা এসকল পবিত্র মুখের পাশাপাশি মা'হাদে উপস্থিত হন মা'হাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণের অন্যতম সহযোগী জমিদাতা আলহাজ্ব মুহাম্মাদ শাহজাহান কবির সাহেব।

মজলিস শুরু হলো। তিলাওয়াত ও হামদ-না'তের পর মা'হাদের সম্মানিত পরিচালক মুফতী মাহমূদুল আমীন সাহেব দা.বা. স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। তিনি আলহাজ্ব শাহজাহান কবির সাহেব ও অন্যান্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মা'হাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন।

এরপর মা'হাদের পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সেক্রেটারি মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেব প্রস্তাবিত জমিতে কিভাবে কাজ করবেন তার ভবিষ্যত পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক সকলের সামনে তুলে ধরেন। অতঃপর মা'হাদের রিপোর্ট পেশ করেন।

এরপর আলহাজ্ব মুহাম্মাদ শাহজাহান কবির সাহেব নিজ বক্তৃতায় মা'হাদের জন্য প্রদত্ত জমির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। আগামীতে মা'হাদের পাশে থাকবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন। তাঁর তিন ছেলে যাতে দীনের সাথে জুড়ে থাকতে পারে সে জন্যে তিনি মা'হাদের সহায়তা কামনা করেন।

মজলিসের এক পর্যায়ে মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব দা.বা. তাঁর সাথে আলহাজ্ব শাহজাহান সাহেবের নিষ্কলুষ ভালোবাসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। আবেগ জড়িত কান্নার কারণে হুযূর কথা বলতে পারছিলেন না। কিছু সময়ের জন্য হুযূর বাকরুদ্ধ হয়ে যান। আলহাজ্ব শাহজাহান সাহেবের এই ভালোবাসাকে দীনের জন্য কবুল করার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

হযরতুল আল্লাম মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা. মা'হাদের স্মৃতিচারণ করে বলেন, মা'হাদ এক সময় ছিল ওয়াশপুরে। ছিল না পা রাখার জায়গা। ছিল না ঠাঁই নেওয়ার মত কোন স্থান। তারপর বসিলায় পেল এক টুকরো জমি। কিন্তু তা চলে গেল নদীতে। তখন মনে হয়েছিল মা'হাদ কি পারবে না তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে? অতঃপর হুযূর বিগলিত কণ্ঠে মা'হাদের বর্তমান জমির কথা বলেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের শুকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর হুযূর দু'আর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মজলিসের শেষ প্রান্তে মা'হাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্য থেকেও কয়েকজন সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। মা'হাদের সাথে যুক্ত হতে পেরে তারা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন।

প্রাপ্ত এ জমিটিতে আনুমানিক ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দশতলা বিশিষ্ট একটি মসজিদ ও মাদরাসা ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ভবনের প্রথম ও দ্বিতীয় তলা মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেটির নাম নির্ধারণ করা হয়েছে আল-মদিনা জামে মসজিদ। পরবর্তী তলাগুলোতে মা'হাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এ মহতি উদ্যোগকে কবুল করুন; আমীন।

দারুত তাসনীফ, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া

রোজনামচার পাতা

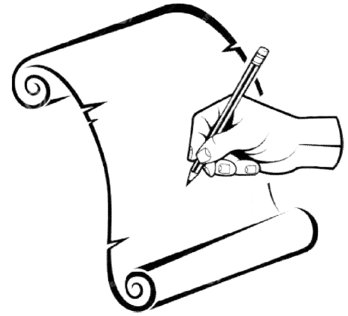

আব্বু আম্মু আরো বেশি আদর করবেন

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঈসায়ী

আব্বু আম্মু আমাকে অনেক আদর করতো। এখন আর করে না। করতে পারে না। দিন-রাত মাদরাসায় থাকতে হয়। লেখা-পড়া করতে হয়। আব্বু আম্মু বলেছে, এখন থেকে পড়া-লেখা শুরু করতে হবে। যদি আমি পড়া-লেখা করি তাহলে আব্বু আম্মু, দাদা দাদু আমাকে আগের থেকে বেশি আদর করবেন।

মুনীর হুসাইন

তাহফীযুল কুরআন বিভাগ

প্রথম আহ্বান

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী

প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শেষ। ছুটি হলো। বাড়িতে গেলাম। একদিন ফজর নামায শেষে এক বন্ধুর সাথে রাস্তায় হাঁটতে বের হলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা একটি বেঞ্চে বসলাম। একজন হিন্দু লোকও আমাদের কাছে এসে বসলো। লোকটি আমাদের প্রতিবেশী। তার কোনো সন্তানাদি নেই। অর্থ কড়ি আছে অনেক। আমরা ভাবলাম, লোকটিকে দাওয়াত দেওয়া দরকার। যেই ভাবা সেই কাজ। আমি লোকটিকে বললাম, চাচা! আপনার সাথে একটু কথা ছিলো। লোকটি বললেন, তুমি কি ধর্মের বিষয়ে কথা বলতে চাও। আমি বললাম, হ্যাঁ চাচা! আপনার ধর্ম বিষয়ে কিছু কথা বলবো। তিনি বললেন, আচ্ছা বলো। আমি তাকে বললাম, আচ্ছা চাচা! বলুন তো আমাদের কে সৃষ্টি করেছেন? তিনি বললেন, কেনো! ভগবান! আমি বললাম, তবে আপনারা মাটির তৈরি মূর্তির পূঁজা করেন কেন? শুধু মূর্তির নয়; আপনারা তো আরো

অনেক জিনিসের পূঁজা করে থাকেন। লোকটি নীরব হয়ে গেলো। আমি ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু জানি ততটুকু বললাম।

কথাগুলো শুনে তার মাঝে ভাবনার উদয় হলো। এরপর তিনি বললেন, তুমি যে কথাগুলো বলেছো তা আমার ভালোর জন্যই বলেছো। তোমার কথাগুলো আমার অনেক ভালো লেগেছে। তবে দেখো, এটা আমার বাপ-দাদার ধর্ম। আমি যদি আমার এ ধর্ম ত্যাগ করি তবে আমার ধর্মের লোকেরা আমাকে ভর্ৎসনা দিবে। গালমন্দ করবে। আমার মনে হলো, লোকটার মনটা বেশ নরম হয়েছে। দাওয়াত দিতে দিতে হয়তো একদিন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবে। আল্লাহ! তুমি তাকে সৎপথ দেখাও। আমাদেরকেও এ পথে অবিচল রাখো।

ফয়জুল্লাহ

ইবতিদায়ী আউয়াল [২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ]

ভুলের মাঝেও শিক্ষা

১১ আগস্ট ২০১৯ ঈসায়ী

কুরবানীর ছুটি শেষ। মাদরাসায় ফিরছি। দাউদকান্দি থেকে বাসে চেপে বসলাম। যাত্রী তেমন একটা নেই। কিছুক্ষণ পর এক ভদ্রলোক এসে আমার পাশের সিটে বসলেন। আমার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললেন। আমার পরিচয় নিলেন। নিজের পরিচয় দিলেন। এভাবে আমাদের দু'জনের মাঝে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা তৈরি হলো।

তার কথা শুনে আমার মনে হলো, তিনি একজন ভালো মানুষ। তিনি আমাকে অনেক সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিলেন। যেগুলো সত্যিকারার্থেই আমার শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য পাথেয় স্বরূপ। এমন একজন মানুষকে ভালো লোক না বলে উপায় নেই। এক পর্যায়ে আমাকে বললেন, তুমি কি যোহর নামায পড়েছো? আমি বললাম, এখনো পড়িনি। তিনি বললেন, আমরা গুলিস্তান নেমে দু'জনে যোহর নামায পড়ে নেবো। এরপর আমরা যার যার গন্তব্যে চলে যাবো। আমি বললাম, আচ্ছা, ঠিক আছে।

বাস দাঁড়িয়ে গেলো। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি, গুলিস্তান চলে এসেছি। লোকটি বললো, চলো আমরা বাস থেকে নেমে মসজিদে যাই। আমি বললাম, আচ্ছা চলুন। কথামত আমরা দু'জন বাস থেকে নেমে গুলিস্তান বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মসজিদে গিয়ে বসি। কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোকটি বললো, আমার ব্যাগটি রাখো। আমি প্রয়োজন সেরে আসি। আমি বললাম, আমিও তো উযূ করতে

যাবো। লোকটি বললো, না তুমি থাকো। আমি আসলে তুমি যেয়ো। আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে। তিনি পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে প্রয়োজন সেরে চলে এলেন। এবার আমাকে বললেন, এবার তুমি যাও। তিনি যেমন বিশ্বাস করে তার ব্যাগ আমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন আমিও তদ্রূপ তার উপর বিশ্বাস করে তার কাছে ব্যাগটা রেখে প্রয়োজন পূরণে চলে গেলাম। যদিও তখন আমার মনে একটু খটকা লাগছিলো। কিন্তু অতি বিশ্বাসের কারণে তাতে ভ্রুক্ষেপ করিনি। উযূ করে এসে দেখি, ভদ্রলোকটি যেখানে বসা ছিলেন সেখানে তিনি নেই। তখন আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠলো। পরক্ষণে আবার ভাবলাম, হয়তো ভিতরে নামায পড়ছে। মসজিদের ভিতরে গিয়ে দেখি তিনি নেই। তন্ন তন্ন করে তাকে খুঁজলাম। কোথাও তাকে পাওয়া গেলো না। তখন আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। আমার ব্যাগে চলতি মাসের বেতন, হাত-খরচের টাকা, কিতাবপত্র, কাপড়-চোপড়সহ প্রয়োজনীয় আরো অনেক কিছু। কিছুক্ষণ বসে ভাবলাম। নিজেকে ভর্ৎসনা করলাম। মানুষ তবে এমন হতে পারে!

যাত্রাপথে বসন্ত কোকিলের মত বন্ধুত্বে কেন আমি আস্থা রাখলাম? এজন্য সাবধান হতে হবে। খুব সন্তর্পণে মানুষ অমানুষের ব্যবধান জানতে হবে। আল্লাহ আমাদের মানবরূপী পশুদের প্রতারণা থেকে পরিত্রাণ দান করুন।

আশিকুর রহমান

ইবতেদায়ী সানী

হঠাৎ একদিন

২০ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

আমাদের প্রিয় উস্তাদ মাওলানা আশরাফুল আলম (গাজীপুরী হুযূর) দা.বা. শেষ দরসে বললেন, আপনাদের ছেড়ে থাকতে আমার অনেক কষ্ট হয়! ভাবি, কী করবো। আগে তো একটা ফিকির ছিলো– আপনাদের কিতাব পড়াতে হবে, মুতালাআ করতে হবে। আপনাদের কিতাব পড়াতাম, কিতাব মুতালাআ করতাম। ভাবতাম, কখন আপনাদের কাছে আসবো, আপনাদের ক্লাস করাবো, আপনাদের সাথে কথা বলবো। কিন্তু আজ তো দরস শেষ। কিভাবে আমার সময় কাটবে? আমার মা অসুস্থ হওয়ায় আমার যতটুকু না কষ্ট হয়েছে তারচে' বেশি কষ্ট হয়েছে আপনাদের ক্লাস করানো বাদ দিয়ে থাকতে, আপনাদের ছেড়ে থাকতে।

হুযূর অশ্রুসজল চোখে কথাগুলো বলতে থাকলেন। অজান্তে আমাদের চোখেও পানি এসে গেলো। উস্তাদ কাঁদছেন, ছাত্র ভাইয়েরাও কাঁদছে। ভালোবাসার

কান্না। আত্মতৃপ্তির কান্না। এ কান্না আর ভালোবাসাই তো আমাদেরকে মাদরাসার নূরানী পরিবেশে চার দেয়ালে বন্দি করে রাখতে পারে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস মা-বাবা, ভাই-বোন ও পারিবারিক বন্ধন ছেড়ে মাদরাসায় পড়ে থাকি– সেতো উস্তাদদের এমন অকৃত্রিম ভালোবাসার দান পেয়েই। সারা জীবন যেন এই অকৃত্রিম ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকে– মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে এটাই আমাদের কামনা।

মুহাম্মাদ মাহমুদুল হাসান
উস্তানী আউয়াল

কে জানতো, এ দিনটির কথা!

২৯ এপ্রিল ২০১৯ ঈসায়ী

বার্ষিক পরীক্ষার ছুটি কাটিয়ে মাদরাসায় ফিরেছি। ফজর নামায আদায় করে মুদীর সাহেব হুযূরের সাথে সাক্ষাতের জন্য কিছুক্ষণ ইন্তিযার করলাম। এরপর কিছু সময় মুক্ত বাতাসে বিচরণ করে রুমে ফিরে এলাম। রাজবাড়ীর হুযূর আমাকে ডেকে বললেন, আব্দুল্লাহ! তুমি এখনি বাসায় যাও।

আমি তখনি আম্মাকে ফোন করলাম। আম্মা ফোন রিসিভ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'বাবা! তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসো, তোমার বাবার অবস্থা বেশি ভালো না।' বোনকে ফোন দিলাম। বোনও ফোন ধরে কাঁদতে লাগলো। বললো, 'তুই তাড়াতাড়ি আয়। প্রশ্ন করলাম– কোথায়? কান্না বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর এলো– কল্যাণপুর ইবনে সিনা হাসপাতালে। আসছি– বলে ফোন রেখে দিলাম।

আজ তারাবীহের জন্য কলমারচর যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু যাওয়া হলো না। হাসপাতালে যেতে হবে। এমন সময় রাজবাড়ীর হুযূর ডেকে বললেন, আব্দুল্লাহ! মন খারাপ করো না, সবাই একদিন চলে যাবে– কেউ আগে, কেউ পরে। প্রথমে মায়ের কান্না, বোনের কান্না, এরপর হুযূরের সান্ত্বনা বাণী। সবগুলোই যেন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বার্তা বহন করছিলো। মনকে সান্ত্বনা দিলাম– কিছুই হয়নি। গাজীপুরের হুযূরকে জানিয়ে দ্রুত রওয়ানা হলাম হাসপাতালের দিকে।

জ্যামের শহর ঢাকা। পথ শেষ হতেই চায় না। একসময় পৌঁছে গেলাম কল্যাণপুর। বাস থেকে নেমে বোনকে ফোন করলাম। সে বললো, 'দ্রুত এসো, আমরা এ্যাম্বুলেন্সে।' আমি দৌড়ে সেখানে পৌঁছে দেখলাম– আমার আব্বার মুখে অক্সিজেন লাগানো। তিনি আমার দিকে তাকালেন। হয়তো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু পারলেন না। সেই শক্তি যে তার এখন নেই! আমি তার মাথার কাছে বসে সূরা ইয়াসীন পড়তে শুরু করলাম।

ইবনে সিনা হাসপাতালে বেড খালি নেই। আমরা ডেলটা মেডিকেল কলেজের দিকে রওয়ানা হলাম। দীর্ঘ যানজট পেরিয়ে অতি কষ্টে পৌঁছলাম গন্তব্যে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আব্বাকে ভর্তি করতে চাচ্ছে না। তারা নগদ ত্রিশ হাজার টাকা দাবী করলো। না হলে ভর্তি নিবে না। আমরা বললাম, টাকা দিচ্ছি, আগে রোগীকে ভর্তি করুন। চিকিৎসা শুরু করুন। তারা কিছুতেই মানতে রাজি হলো না। অবশেষে আমার দুলাভাই বিশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, 'বাকি টাকা পরে দিচ্ছি, আগে রোগীকে ভর্তি করুন।' তখন তারা তোড়জোড় শুরু করলো।

এদিকে এ্যাম্বুলেন্সেই আব্বা বমি করতে শুরু করলেন। বমির সঙ্গে রক্ত বের হচ্ছিলো। হতবাক আমি ছলছল চোখে দেখছিলাম। আর দেখতে দেখতেই সামান্য সময় পরেই আব্বা আমাদের এতীম করে চলে গেলেন চিরস্থায়ী শান্তির ঠিকানায়।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যিনি আমাকে আগলে রেখে বড় করে তুলেছিলেন সেই আব্বাজান আজ আর নেই। আলোকোজ্জ্বল দিনটাকে খুব মেঘাচ্ছন্ন মনে হলো। কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। পরক্ষণেই সম্বিৎ ফিরে পেলাম। মনকে বোঝালাম– এ ডাক সকলেরই আসবে, একদিন সবারই চলে যেতে হবে। আমাকে এখন ভেঙ্গে পড়লে চলবে না।

উস্তাদগণকে ফোনের মাধ্যমে জানালাম। গোসল দিয়ে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলাম। কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না। এবারই আমাকে মাদরাসায় পাঠানোর সময় তিনি বলেছিলেন, বাবা! আমার জন্য চিন্তা করো না। তারাবীহ পেলে আমাকে জানিও। তুমি তারাবীহ পড়ালে আমি সুস্থ হয়ে যাবো। কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না। এর আগেই তিনি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন। জীবনের প্রথম জানাযা পড়ালাম; তাও আব্বাজানের জানাযা। নিজ হাতে আব্বার দাফনের কাজ সম্পন্ন করলাম। এতো দুঃখের মাঝেও এটাই ছিলো গর্বের, পরম আনন্দের।

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সিদ্দীকী
উস্তানী আউয়াল

আমাকেও যেতে হবে একদিন!

১২ এপ্রিল ২০২০ ঈসায়ী

শনিবার। কুরবানীর ছুটি চলছে। বাড়িতে আছি। সোমবার কুরবানীর ঈদ। গতকালই আমাদের গরু কেনা হয়েছে। আমরা গরুর দেখা-শোনায় ব্যস্ত।

হঠাৎ দেখা পেলাম আমার ছোট খালার। চোখ দু'টো ছলছল করছে তার। মাকে কি যেন বলে চলে গেলেন। মাকে জিজ্ঞেস করলাম– কি হয়েছে মা? মা বললেন, আমার চাচা আব্দুর রহীম খলীফা ইন্তিকাল করেছেন। সাথে সাথে পড়লাম– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমার এই নানা খুব ভালো মানুষ ছিলেন। নানা বাড়ির মসজিদ-মাদরাসা দেখাশোনা করতেন। রমাযানে ই'তিকাফে বসতেন।

সেদিন রাতেই আমরা নানাবাড়ি গেলাম। বাড়ির উঠোনে একটা খাটিয়াতে তিনি ঘুমিয়ে আছেন। মুখের কাপড় সরিয়ে শেষবারের মত তার চেহারাটি দেখলাম। আর ভাবলাম– তার সাথে আমরা রমাযানে কত খোশগল্প করেছি। আজ তিনি নেই। বিশ্বাসই হচ্ছে না– তিনি সামনে থাকা সত্ত্বেও তার সাথে কোন গল্প করা যাচ্ছে না। হাসি-মজাক করা যাচ্ছে না। তিনি চলে গেছেন আমাদেরকে ছেড়ে দূরে বহুদূরে– আরশের মালিকের দরবারে।

রাতেই আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমানোর জন্য বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বহু চেষ্টা করলাম, কিন্তু চোখে ঘুম নেই। মনের কোণে শুধু নানার মৃত্যুর কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে। চাঁদের স্নিগ্ধ হাসি আর যেন ভালো লাগছে না। আকাশের তারারাও আজ মনকে আকৃষ্ট করতে পারছে না। রাতের জোনাকিগুলোও দেখতে কেমন বিশ্রী লাগছে।

পৃথিবীতে কত রাজা-বাদশা, কত ক্ষমতাশীল প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তারা কেউ কি এখন আছে। কতজন কত ক্ষমতা দেখিয়েছে, কতজন কত জুলুম-অত্যাচার করেছে, আবার কতজন কত ভালো কাজও করেছে; কিন্তু তারা কেউই আজ নেই। তাদের সকলকেই পরকালের পথে পাড়ি দিতে হয়েছে। ঐ অন্ধকার কবরের অধিবাসী হতে হয়েছে তাদেরকে। নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব, একাকি ও অসহায় অবস্থায় থাকতে হচ্ছে। আমিও কি ছাড় পাবো! আমাকেও যেতে হবে একদিন! নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে হবে ঐ কবরে। আমি যদি দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় ঐ নিঃসঙ্গ কবরে থাকার প্রস্তুতি নিই, তাহলে তা আমার জন্য হবে অতি সহজ ও অতি আনন্দের।

আফসোস আমাদের নিজেদের জন্য! সব সময়ই যদি আমাদের কবরের কথা স্মরণ থাকতো। মনে থাকতো, আমাকেও একদিন পরকালের পথ পাড়ি দিতে হবে। যেতে হবে একদিন নিঃসঙ্গ ও নিঃস্ব অবস্থায় ঐ কবরে।

আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ যায়েদ
উস্তানী আউয়াল

হুযুরের শূন্যতা কি কেউ পূরণ করতে পারবে?

৩ জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪১ হিজরী

বুধবার। আসরের পর তাফরীহ করে রুমে এলাম। হঠাৎ এক ছাত্র ভাই আমাকে বলল, আনোয়ার শাহ সহেব ইন্তিকাল করেছেন– শুনেছেন নাকি। সংবাদটি শোনামাত্রই শরীর শিহরিয়ে উঠলো। বিশ্বাস করতে পারছি না। নিশ্চিত হওয়ার জন্য জামিয়া ইমদাদিয়া ও বাড়িতে ফোন দিলাম। সত্যিই হুযূর আমাদেরকে রেখে চলে গেছেন।

জানাযার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার বাদ যোহর। সকাল সকাল না গেলে জানাযা পাওয়া যাবে না। ফজরের পরপরই হুযূরের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমি ছাড়া বাসে অনেক আলেমকে দেখতে পেলাম। সকলেই জানাযায় শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। যানজট এবং গাড়ির ধীরগতির কারণে সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলাম– যোহরের পূর্বে বাস কিশোরগঞ্জ পৌঁছতে পারবে তো!

আলহামদুলিল্লাহ। সঠিক সময়েই আল্লাহ তা'আলা গন্তব্যে পৌঁছে দিলেন। দ্রুত বাস থেকে নেমে গেলাম। রাস্তা-ঘাট তুলনামূলক ফাঁকা। কিছু গাড়ি দেখা যাচ্ছে, যেগুলোর অধিকাংশই জানাযার উদ্দেশ্যে আসা উলামায়ে কেরামকে নিয়ে এসেছে। দলে দলে মানুষ জানাযার দিকে ছুটছে। যোহরের আযানের পরপরই শহীদী মসজিদে পৌঁছে গেলাম। এ'লান হলো– জানাযা অনুষ্ঠিত হবে শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানে। দ্রুত উযূ সেরে মাঠের দিকে ছুটলাম।

শোলাকিয়া ঈদগাহ। কয়েক লক্ষ মানুষের ধারণক্ষমতা রয়েছে এতে। মাঠটি কানায় কানায় ভরপুর। কি করবো বুঝতে পারছি না– সামনে এগুনোই যাচ্ছে না। মাঠে তখন আলোচনা চলছিলো। উপস্থিত ছিলেন আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী রহ., মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস সাহেব, মুফতী ওয়াক্কাস সাহেব, মাওলানা উমর ফারূক সাহেব, মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদবী সাহেব, মাওলানা মাহফুজুল হক সাহেবসহ বরেণ্য উলামায়ে কেরাম। আলোচনার সময় পুরো মাঠে কান্নার রোল পড়ে গেলো।

হুযূরের ছেলে মাওলানা আনজার শাহ তানীম জানাযার ইমামতী করলেন। প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ হুযূরের জানাযায় অংশগ্রহণ করলো। স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেকেই জানাযায় শরীক হতে পারেননি। শুনেছি, এটিই ছিলো কিশোরগঞ্জে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাযার জামা'আত।

জানাযা শেষে অশ্রুসজল নয়নে হুযূরের স্মৃতিচারণ করতে করতে বাসায় ফিরে এলাম। সকলের মুখে একই আলোচনা– হুযূরের শূন্যতা কি কেউ পূরণ করতে পারবে? কে হবে আতহার আলী রহ. এর প্রতিষ্ঠিত জামিয়া ইমদাদিয়ার মুহতামিম? কে হবে শহীদী মসজিদের খতীব? কিশোরগঞ্জবাসীর রাহবারই বা কে হবে? হুযূরের সুযোগ্য উত্তরসূরী কি আমরা পাব?

পরদিন শুক্রবার জুমু'আ আদায়ের জন্য ছুটে গেলাম হুযূরের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদে। কিন্তু হুযূরকে না পেয়ে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। জুমু'আর বয়ানে হুযূরের সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে আলোচনা হলো। বয়ান শেষে মুআযযিন জুমু'আর সানী আযান দিতে শুরু করলেন। কিন্তু কান্নার কারণে বারবার আওয়াজ বন্ধ হয়ে আসছে। পুরা মসজিদে কান্নার রোল পড়ে গেলো। এভাবেই নামায শেষ হলো। দু'আ হলো হুযূরের জন্য। ইচ্ছা করছে মসজিদের পাশেই অবস্থিত হুযূরের মাদরাসায় যেতে। কিন্তু মনের অস্থিরতার কারণে যাওয়া হলো না। বাড়িতে ফিরে এলাম।

হুযূর ছিলেন বড় মাপের একজন আলেম। বহু গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একজন বুযুর্গ। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন আদর্শ উস্তাদ। দরস দানকালে ছাত্ররা চাতক পাখির ন্যায় হুযূরের দিকে তাকিয়ে থাকত। অসুস্থকালীনও বারবার ছাত্রদেরকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করে বলেছিলেন– আমাকে ছাত্রদের কাছে নিয়ে যাও...। এমনই ছিলো দরস-তাদরীসের তার আত্মিক সম্পর্ক। এমনই ছিলো ছাত্রদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা।

হুযূরের কথা স্মরণ হলে মনে পড়ে যায় কবিতার সেই লাইন দু'টি–

যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে, কেঁদেছিলে তুমি হেসেছিলো সবে।
এমন জীবন করিও গঠন, মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভূবন।

আল্লাহ তা'আলা হুযূরকে জান্নাতের আ'লা মাকাম দান করুন। আমীন।

যুবাইর আহমাদ
ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ [২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ]

অপরূপ নীলিমা

৮ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

মা'হাদের পঞ্চম তলা। পশ্চিম দিকে একটি রুম। রুমটির বাম দিকে একটি খোলা জানালা। জানালার সমুখে আমি দাঁড়িয়ে আছি। চার দেয়ালের বাইরের পৃথিবীটাকে দু চোখ ভরে দেখছি। নীলাকাশ। সাদা মেঘের শুভ্র ভেলা। পাংশু

মেঘ খণ্ডগুলো দেখে বেশ ভালোই লাগছিলো। নীড়হারা পাখিগুলো মুক্ত আকাশে জিকিরের ধ্বনি তুলে উড়ে বেড়াচ্ছিলো। আকাশ ভরা সোনালী রোদে পৃথিবীটা চিক চিক করছিলো। আমার দৃষ্টিটা বাহিরের পৃথিবীতেই পড়ে আছে। হঠাৎ পৃথিবীর চেহারাটা বদলে গেলো। চারপাশ কালো হয়ে নীলাকাশের সৌন্দর্য আর সূর্যের সোনালী আভাকে নিমিষেই কালো চাদরে ঢেলে দিলো। ডানা মেলা পাখীগুলো তখন প্রচণ্ড ভয়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে। মুহূর্তেই পুরো পৃথিবীটা অন্ধকারে ছেয়ে গেলো। কিছু সময় পর অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের বুক চিরে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টির ধারা নেমে এলো। বৃষ্টি কণিকাগুলো হিমেল হাওয়ায় একাকার হয়ে বাতাসের শীতলতাকে আরো প্রখর করে তুললো। আকাশ থেকে নেমে আসা জল কণিকাগুলো খোলা জানালা বেয়ে আমার দেহেও শীতল পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিলো। উতল হাওয়ায় জানালার পর্দাগুলো পত পত ধ্বনি তুলো উড়ছিলো। জানালা বন্ধ করে দিয়ে জলবায়ুর পৃথিবীর হাতছানি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিই। আল্লাহ চাহে তো বাইরের অন্ধকারাচ্ছন্ন বৃষ্টিময় দৃশ্যটা বদলে যাবে। আকাশ ফিরে পাবে তার হারানো নীলিমা। সূর্য ফিরে পাবে তার আলোকিত হাসি। বসুন্ধরা ফিরে পাবে কান্তিময় সৌন্দর্য। বদলে যাওয়া এ পৃথিবীর ন্যায় আমাদের হৃদয়ের পৃথিবীটাও বদলে যাক। আমাদের হৃদয়ের জানালা বেয়ে প্রবেশ করুক স্বচ্ছ সুনির্মল পবিত্র হাওয়া। আলোয় আলোকিত হোক আমাদের অন্তঃপৃথিবী।

ইনআমুল হক
ইবতিদায়ী সানী

ওই পাহাড় আর গাছ গাছালি...

১০ এপ্রিল ২০২০ ঈসায়ী

কুরবানির ছুটি চলছে। ইচ্ছে হলো, একটু ঘুরতে যাবো। যে ইচ্ছে সেই কাজ। বন্ধুদের সাথে ইচ্ছে বিনিময় হলো। সবার ইচ্ছার সমন্বয় হলো। তবে কোথায় যাওয়া যায়? সাত পাঁচ ভেবে সিদ্ধান্ত হলো হামহাম ঝর্ণাধারা দেখতে যাবো। ঝর্ণাটি আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ৫০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। সাথে কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে একদিন বেড়িয়ে পড়লাম হামহাম ঝর্ণার উদ্দেশে। যতদূর সম্ভব গাড়িতে অগ্রসর হলাম। এক পর্যায়ে গাড়ির পথ শেষ। শুরু হলো হাঁটা পথে হেঁটে চলা। পথ বড় সুন্দর, সবুজ শ্যামল। কিন্তু অতি দীর্ঘ ও প্রলম্বিত। গন্তব্যে পৌঁছতে হলে এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। আমরা হাঁটছি। উঁচু নিচু পথ। আঁকা বাঁকা পথ। সবুজের বুক চিরে হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে আমরা

ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু হামহামের দেখা পাই না। কোথায় সে হামহাম? কোথায় সে মহামহিমের কুশলী হাতের অপরূপ সৃজন? ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমরা বন্ধু কাফেলার সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। কিন্তু পথের শেষ নেই! ক্লান্তি দূর করতে একটুখানি বিশ্রাম করে নিই।

পাহাড় টিলা বেয়ে আবার আমাদের পথচলা শুরু হলো। হঠাৎ ঝর্ণাধারার অপরূপ ধ্বনি আমাদের কানে ভেসে এলো। ঝর্ণাধারার ছলছল ধ্বনিতে আমরা এক অপরূপ ভালোলাগায় হারিয়ে গেলাম। নিমিষেই সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেলো। ঝর্ণার দিকে দৃষ্টি পড়তেই পথের সকল বেদনা ঘুচে গেলো। আমরা ঝর্ণার সমুখে একটি জায়গায় বসে পড়লাম। সাথে করে নিয়ে আসা খাদ্যে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করছি আর ভাবছি, আহ! আল্লাহর সৃষ্টি কত সুন্দর! সৌন্দর্যের এ যাদুর টানে ছুটে আসে হাজারো মানুষ। বরণ করে নেয় হাজারো কষ্ট যাতনা। ভাবতে ভাবতে দৃষ্টি চলে গেলো ঝর্ণার নিচের দিকে। সেখানে দেখছি, বেশ কিছু মানুষ গোসল করছে। তাদের চোখে মুখে সে কি তৃপ্তি! সে কি আনন্দ!! আমাদের লোভ হলো ঝর্ণার পানিতে দেহ ভেজাবার। আহার পর্ব শেষে ছুটে গেলাম উপর থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে ছলছল রবে গড়িয়ে পড়া ঝর্ণাধারার নিচে। আহ! কি শীতল পানি! হাতের আঁজলা পেতে এক আঁজলা পানি মুখে পুরে নিলাম। হৃদয়টা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। মনে হলো, রহমতের সুমিষ্ট পানি পান করলাম। মনে হলো যমযমের পানির কথা। না জানি সে পানি কত স্বাদের? কত তৃপ্তির?

গোসল শেষে ভেজা কাপড়েই পাহাড়ের উপরে উঠলাম। মন ভরে আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য অবলোকন করলাম। এদিকে যোহরের নামাযের সময় হয়ে এলো। আমরা পাহাড়ের উপরেই নামায আদায় করলাম। এ যেন আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখে আনন্দ কৃতজ্ঞতায় তাঁর সমুখে লুটিয়ে পড়া। অব্যক্ত এক ভালোলাগায় মোহিত হলাম। আনন্দে আনন্দে হৃদয়টা ভরে গেলো। ঝর্ণা জলে সিক্ত দেহে ঝর্ণার পাশে নামায আদায় হলো। স্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টির পাশে দাঁড়িয়ে স্রষ্টা সমীপে লুটিয়ে পড়ার এমন আনন্দ ক'জনের ভাগ্যে জোটে? সবাই তো সৃষ্টির সৌন্দর্যের স্বাদ গ্রহণ করে অনাচারে হারিয়ে যায়। সৃষ্টির স্রষ্টাকে ভুলে যায়। তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। স্রষ্টার সৃষ্টি দেখে তাঁর নিয়ামতের সৌন্দর্য ভোগ করে তাঁর অবাধ্যতা করা কতোট কৃতঘ্নতা! কত বড় অকৃতজ্ঞতা!! অথচ আল্লাহর সৃষ্টির পরতে পরতে আছে শিক্ষা সম্ভার। আল্লাহ আমাদের তাঁর সৃষ্টি থেকে শিক্ষা গ্রহনের তাওফীক দান করুন।

তরিকুল ইসলাম
উস্তানী আউয়াল

অজয় সরকার কেন মুসলিম হলো?

১২ জানুয়ারি ২০২০ ঈসায়ী

ইজতেমার ময়দান। শেষ দিন। আসর নামায শেষে মুদীর সাহেব আমাদের একত্রিত হতে বললেন। সকলে একত্রিত হলো। বয়ানের মুযাকারা হলো। মজলিস শেষে হুযূর বললেন, তোমাদের ভাই মুহাম্মাদ আলী তোমাদেরকে তার জীবন পরিবর্তনের ঘটনা শোনাবেন। মাগরিবের পরে আমরা সকলেই বেশ আগ্রহ নিয়ে বসে পড়ি। মনে মনে প্রশ্ন জাগছিলো, কে সেই মুহাম্মাদ আলী? কি তার পরিচয়?

ভাই মুহাম্মাদ আলী আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। সুন্দর চেহারার একজন সুন্দর মানুষ। তিনি তার দিন বদলের বিবরণ শুরু করলেন– 'আমার বাড়ি নেত্রকোণা। আমি এক সাধারণ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। বাবা-মা আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন অজয় সরকার। আমি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত লেখা পড়া করি। এরপর কাজের উদ্দেশে ঢাকার রামপুরায় খালার বাসায় চলে আসি। বাসার দোতলায় মুসলিম ছেলেরা কাজ করতো। আমি খালার বাসায় থেকে সেখানে কাজে যোগদান করি। একদিন গভীর রাতে হঠাৎ ভয় পেয়ে যাই। ভয়ে ঘুম থেকে জেগে তিন তলার ছাদে চলে যাই। কিছুক্ষণ খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে আবার বেডরুমে এসে শুয়ে পড়ি। এবার স্বপ্নে দেখি– সাদা দাড়ি টুপির একজন মানুষ আমার কাছে এসে বলছে, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। এটাই ছিলো আমার জীবনের বিস্ময়কর স্বপ্ন। এ স্বপ্ন থেকেই আমার জীবন পরিবর্তনের সূচনা হয়। কিছুদিন পর আরো একটি স্বপ্ন দেখি। সে স্বপ্নে আমি দেখতে পাই– আমি আমার গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছি। বাড়ির পাশে নয়নাভিরাম দৃশ্য। আমি হাঁটছি আর হৃদয়কাড়া সুন্দর দৃশ্য দেখছি। হঠাৎ দেখি, দশ এগারো হাত উঁচু এক প্রকাণ্ড মূর্তি আমার দিকে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে। আমি ভয়ে দ্রুত পেছন দিকে সরে যাচ্ছি। কিন্তু মূর্তিটি ঠিক তত দ্রুতই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এক পর্যায়ে মূর্তিটি আমার কাছে চলে আসে। আমি তখন তাকে নিবেদন করে বলি, আমি মুসলমান হয়ে যাবো। তখন মূর্তিটি বললো, যা! মুসলমান হয়ে যা। একই ধরনের দু'টি স্বপ্ন আমাকে বেশ চিন্তায় ফেলে দেয়। আরো একদিন স্বপ্নযোগে লোকনাথ দেবতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। এবারও আমি নিবেদন করে তাকে বলি, আমি মুসলমান হয়ে যাবো। লোকনাথ বললো, তুই পারবি না। আমি বললাম, আমি পারবো। এভাবে তিন বার বলার পর লোকনাথ বললো, যা! তুই মুসলমান হয়ে যা।

এ তিনটি স্বপ্ন দেখার পর আমার মাঝে পরিবর্তনের আগ্রহ তৈরি হলো। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। তবে পূর্বের তুলনায় মুসলমানদের প্রতি অনেকটাই নমনীয় ও আসক্ত হয়ে পড়ি। মুসলিম বন্ধুদের চলা ফেরা ও গতিবিধি লক্ষ করে তাদের সাথে ইসলামিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখার ইচ্ছা পোষণ করি। মুসলিম বন্ধুরা ঘুরতে যেতো। আমি একা থেকে যেতাম। বিষয়টা আমার কাছে খুব খারাপ লাগতো। একদিন ইচ্ছা হলো, মুসলিম বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাবো। সে মতে শবে বরাতে বন্ধুদের সাথে বাইতুল মুকাররমের উদ্দেশে ঘুরতে বের হলাম। বাইতুল মুকাররমে গিয়ে আমি এক অন্যরকম ভালোলাগায় শিহরিত হয়ে উঠি। আহ! একসাথে একত্রে নামায পড়া ও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার কি মনোরম দৃশ্য!! এরপর থেকে আমি মোবাইলে ওয়াজ শুনতে শুরু করি। এদিকে বাইতুল মুকাররমে যাওয়ার ঘটনা গ্রামের বাড়িতে বাবা-মার কানে চলে যায়। বাবা-মা আমাকে অনেক বকাঝকা করেন। অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেন। এতে ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহ উদ্দীপনায় বেশ ভাটা পড়ে যায়।

কিছুদিন পর রামপুরা থেকে মুহাম্মাদপুর বসিলা গার্ডেন সিটির একটি বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে চলে আসি। এখানে এসে সহকর্মী মনির ভাইয়ের সাথে বেশ হৃদ্যতা তৈরি হয়ে যায়। তিনি আমাকে বিভিন্ন সময়ে ইসলামিক কথাবার্তা বলতেন। ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেন। এতে আমার আগ্রহ আবার পূর্বের ন্যায় চাঙ্গা হয়ে উঠে। আমি তখন ভাবি, আপাতত এখন কালেমাটা পড়ে নিই এবং পাশের সাবেত আলী মোল্লা মসজিদে নামায পড়া শুরু করি। পরে একসময় মুসলমান হয়ে যাবো। বিষয়টি মসজিদের ইমাম সাহেব শুনতে পান। তিনি আমাকে ডেকে নানাভাবে বোঝাতে শুরু করেন। কয়েকদিন পর ইমাম সাহেব আমাকে মা'হাদের মুদীর সাহেবের কাছে নিয়ে যান। মুদীর সাহেব তার পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হন। তখন মা'হাদের সকল উস্তাদ ছাত্রের সামনে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাই।'

মুদীর সাহেবের পরামর্শে মুহাম্মাদ আলী ভাই শুরু থেকে বাবা-মার সাথে ভালো আচরণ করে আসছিলেন। আর্থিক সহযোগিতাও করতেন পুরো মাত্রায়। কৌশলে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী করে তোলারও চেষ্টা করতেন। তার ছোট বোনকে বোঝাতে বোঝাতে এখন সে মুসলমান হওয়ার জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত। বাবা-মাও আগের তুলনায় অনেকটাই নমনীয়। আমরা দু'আ করি, আল্লাহ যেন মুহাম্মাদ আলী ভাইয়ের পুরো পরিবারকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দান করেন।

মুফাসসাল হুসাইন
ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ [২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ]

শুধু তালিবে ইলম নয়...

৬ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

একদিন কুমিল্লার হুযূরের দরস চলছিলো। এক পর্যায়ে হুযূর স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত কিছু কথা বললেন। হুযূর বললেন, 'তোমাদের শুধু তালিবুল ইলম হলে হবে না। তোমাদের তালিবুল ইলম ওয়াল আমাল হতে হবে। শুধু ইলম অর্জন করলে কিছুই হয় না। অর্জিত ইলমকে স্বীয় জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। ইলম অর্জন করে যদি আমল করতে না পারো তবে তোমাদের মাঝে আর সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না। ইলম ইহুদী খ্রিস্টানরাও শিখে। অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ভার্সিটিগুলোতে কুরআন হাদীস নিয়ে গবেষণা হয়। তারা কুরআন হাদীস নিয়ে গবেষণা করে। তারাও সেখানে কুরআন হাদীস শিখে ফিকহ-হাদীস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হচ্ছে। তাদের মাঝে আমাদের মাঝে পার্থক্য হলো আমল। তারা শুধু ইলম অর্জন করে। কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করে না, বিশ্বাস করে না। আমরাও যদি শুধু ইলম শিখি এবং আমল না করি তাহলে তাদের মত আমাদের এ ইলমও কোনো কাজে আসবে না। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে। তা না হলে এ ইলম ফলবান হবে না। ইহুদী-খ্রিস্টানরা ইলম শেখে কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এবং আল্লাহর বিধান ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে জাহান্নামের পথিক বানানোর জন্য। আমাদের উদ্দেশ্য হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

সুতরাং তোমাদের হতে হবে জ্ঞানপর্বত বিদ্যাসাগর। নববী আদর্শে উদ্ভাসিত ইলমের বাগান। তাহলেই জাতিকে তোমরা কিছু দিতে পারবে। পথ খুঁজে পাবে পথহারা পথিক। দূরীভূত হবে মিথ্যার অন্ধকার। জ্বলবে সত্যের আলো। তোমাদের হাতেই উড্ডীন হবে ইসলাম ও বিজয়ের নিশান।'

হুযূরের প্রেরণা জাগানো কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শ্রবণ করছিলাম। আর প্রভাবিত হয়ে প্রার্থনা করছিলাম, আল্লাহ! শুধু তালিবুল ইলম নয়; আমাদেরকে প্রকৃত তালিবুল ইলম ওয়াল আমাল হিসেবে কবুল করে নিন।

আবূ বকর নাহিদ
ইবতিদায়ী সানী

হৃদয় ভরা আগ্রহ

৫ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

আজ ঈসায়ী মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার। ক'দিন থেকেই এ দিনটির প্রতীক্ষায় ছিলাম। ভাবছিলাম, কবে এ দিনটি আসবে? কবে আমার আগ্রহটি পূরণ হবে? আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো একটি দীনী বিষয়। মানুষের মনে অনেক আগ্রহই জাগ্রত হয়। কিছু ভালো। কিছু খারাপ। ভালো কাজে পরিশুদ্ধ আগ্রহ সৃষ্টি হলে অফুরন্ত সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। পক্ষান্তরে খারাপ কাজে আগ্রহ সৃষ্টি হলে আমলপত্র কলঙ্কিত হয়।

অনেক দিন আগে থেকেই ইচ্ছে ছিলো শীর্ষস্থানীয় উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্দাওয়ার মাসিক মুহাযারায় উপস্থিত হওয়ার। সময় মত দায়িত্বশীল উস্তাদ থেকে ছুটি নিয়ে মারকাযের উদ্দেশে যাত্রা করি। বাদ মাগরিব যথাসময়ে মুহাযারা মজলিসে উপস্থিত হই। পীনপতন নীরবতায় আচ্ছাদিত তালিবে ইলমের একটি মজলিস দেখে অনন্ত বিস্ময়ে আভিভূত হই। কিছুক্ষণ পর হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব হাফিযাহুল্লাহ উপস্থিত হলেন। যথানিয়মে হুযূর আলোচনা শুরু করলেন। আলোচনার বিষয় ছিলো সুন্নাত ও বিদ'আত। হুযূরের বয়ানের সারনির্যাস হলো,

এক. সুন্নাহর অনুসরণ যদি সুন্নাহসম্মত পন্থায় না হয় তাহলে তা বিদ'আতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং সুন্নাহর প্রতি আহ্বান ও সুন্নাহর প্রতি আমল যেন আমাদের মাঝে দীনী গোঁড়ামি ও প্রান্তিকতা সৃষ্টি না করে সে দিকে সবিশেষ যত্নবান হতে হবে।

দুই. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে বিষয়টা মুবাহ (অনুমোদিত) ছিলো তাকে সুন্নাহ জ্ঞান করাও একটি বিদ'আত। মাওলানা ইলয়াস রহ. দাওয়াত ও তাবলীগের যে নিয়মটা প্রবর্তন করেছেন সেটা একটি মুবাহ কাজ; সুন্নাহ নয়। একে সুন্নাহ বানানোটাও বিদ'আত। বর্তমানে নিযামুদ্দীনে মাওলানা সা'দ সাহেব এ কাজটি করছেন। তার মূল সমস্যাটা হলো ইহদাস ফিদ্দীন (দীনের মাঝে অননুমোদিত নতুনত্ব সৃষ্টি করা)।

হুযূরের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা একাগ্রতার সাথে শুনছিলাম। এর মাঝে ঈশার আযান শুরু হয়ে গেলো। হুযূর কিছুক্ষণ পরই মজলিস শেষ করে দেন। আল্লাহ হুযূরকে দীর্ঘজীবী করুন এবং ইলমের ময়দানে বেশি বেশি খিদমত করার তওফীক দান করুন।

সাইফুদ্দীন
ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ

মিথ্যা বলার শাস্তি

১৫ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

আমি তখন হিফযখানায় পড়ি। বাসায় খাওয়া দাওয়া করতাম। রাতের খাবার বড় ভাই মাদরাসায় দিয়ে যেতেন। একদিন খাবার খেয়ে মাদরাসায় রওনা হলাম। পথে এক বন্ধুর সাথে দেখা। সে বললো, আজ দু'জন মানুষ মারা গেছে। একজন অসুস্থ হয়ে আরেকজন পানিতে ডুবে। চল, দেখে আসি। চলে গেলাম মরা মানুষ দেখতে।

মাদরাসায় ফিরে দেখি মশক করে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও যথানিয়মে ঘুমিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার সময় হুযূর আমাকে ডেকে বললেন, মশকের সময় তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, খাবার রান্না হতে দেরি হয়েছিলো। এ কারণে মশকের সময় থাকতে পারিনি। হুযূর আমাকে হালকা পিটুনি দিয়ে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, আর যেন দেরি না হয়। মাগরিবের নামাযের পর হুযূর আমাকে ডেকে বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তোমার বাসায় খাবার রান্না করতে দেরি হয়নি। তোমার ভাইকে আমি জিজ্ঞেস করেছি। একথা বলে, হুযূর আমাকে প্রহার করলেন।

আমি শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছি। শিক্ষা পেয়েছি, আর যাই হোক মিথ্যা বলা যাবে না। এরপর থেকে আর মিথ্যা বলিনি। আল্লাহ আমাদেরকে মিথ্যার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

আব্দুল্লাহ আল মাসউদ
উস্তানী আউয়াল

আলোর সন্ধানে

৩ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

সবেমাত্র নাযেরা শেষ করেছি। একদিন তাজবীদের একটি বিষয়ে সমস্যায় পড়ে যাই। এক বড়ভাই মুফতী মাসুম বিল্লাহ সাহেবের সন্ধান দিলেন। হুযূরের কাছে গিয়ে তাজবীদ বিষয়ক সমস্যার সমাধান করলাম।

হুযূর জানতেন, আমি কলেজ ছেড়ে মাদরাসায় পড়তে চাই। হুযূর বললেন, তুমি রমাযানে আমার কাছে উর্দূ কায়িদা পড়ো। রমাযানের পর তোমাকে রাহমানিয়া মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেবো। আমি বললাম, মামার সাথে পরামর্শ করে দেখি। অফিস থেকে বের হওয়ার সময় হুযূর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে ভাড়ার টাকা আছে? আমি বললাম, আছে। হুযূর বললেন, দেখাও দেখি। পকেট থেকে ১০ টাকা বের করলাম। হুযূর বললেন, ১০

টাকায় হবে না। এ বলে হুযূর অফিস থেকে ১০০ টাকার একটি নোট এনে আমার হাতে দিলেন। মামার সাথে ঢাকায় যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করলে তিনি রাজি হলেন। রমাযানে আমি আর খালিদ সাইফুল্লাহ ভাই হুযূরের কাছে উর্দূ কায়িদা পড়লাম।

শাওয়াল মাসের ৫ তারিখে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। রাহমানিয়া মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সম্ভব হলো না। রাহমানিয়ার ছাত্র খালিদ ভাই আমাদেরকে নায়েব সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। নায়েব সাহেব আমাদেরকে মা'হাদে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমরা সোজা মা'হাদে এসে ভর্তি হয়ে গেলাম।

ঢাকায় আসার আগে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। কোথায় ভর্তি হবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। পথের দিশা পাচ্ছিলাম না। মুফতী মাসুম বিল্লাহ সাহেব আমাকে পথের দিশা দিলেন। এখন বুঝতে পারছি, হুযূর আমার কতোটা উপকার করেছেন। ফাজাযাহুল্লাহু আহসানাল জাযা।

এহসানুযযামান (জামিল)
উস্তানী আউয়াল

বাইতুল্লাহর পথে

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঈসায়ী

প্রতিটি মুসলমান বুঝমান হওয়ার পর থেকে যে স্বপ্নটি লালন করে থাকে তা হলো বাইতুল্লাহর যিয়ারত। আমিও সেই ছোট্ট কৈশোর থেকে এমন একটি স্বপ্ন লালন করে আসছিলাম। নাযেরা বিভাগে পড়াকালীন আমার এক বন্ধুর বাবা হজ্বের উদ্দেশে রওনা হলেন। সংবাদ শোনামাত্রই আমার অবুঝ মন নড়ে উঠে, আমি কি পারবো আল্লাহর ঘরে যেতে! তখন থেকেই আমল শুরু করে দেই। যেন আল্লাহ আমাকে তাঁর ঘরে যাওয়ার সুযোগ করে দেন।

২০১৯ সাল। ৮ রমাযান বাদ আসর। আব্বা আমাকে ফোন করে বললেন, তুমি কি উমরায় যেতে চাও? একথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঝটপট উত্তর দিলাম, অবশ্যই। আব্বা বললেন, তোমার পাসপোর্ট আমাকে দিয়ে যাও। নির্ধারিত সময়ে ভিসা প্রসেসিং-এর কাজ সম্পন্ন হলো। ১৪ রমাযান দিবাগত রাতে বাইতুল্লাহর উদ্দেশে রওয়ান হলাম। ফজর নামাযের সময় জেদ্দা বিমান বন্দরে এসে পৌঁছলাম। ফজর নামাযের পর বাস যোগে বাইতুল্লাহর দিকে রওনা হলাম। যতই বাইতুল্লাহর নিকটবর্তী হচ্ছিলাম ততই মনের গভীরে এক অজানা আনন্দ দোলা দিয়ে যাচ্ছিলো।

নির্ধারিত সময়ে হোটেলে এসে পৌঁছলাম। সামানাপত্র হোটেলে রেখে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে অগ্রসর হলাম। মসজিদে হারামের চত্তরে সাদা কাপড় পরিহিত

আল্লাহর মেহমানদের দেখে মনটা আরো ব্যাকুল হয়ে উঠলো। যখন চোখের সামনে বাইতুল্লাহ ভেসে উঠলো তখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না– আমি স্বশরীরে বাইতুল্লাহ সম্মুখে! এখানে কত শত নবী রাসূলের পদচারণা হয়েছে! কত ইতিহাস ও স্মৃতির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পবিত্র এ বাইতুল্লাহ। কথাগুলো ভাবতেই মনের অজান্তে চোখের মণিকোঠা হতে ক' ফোঁটা অশ্রুবারি ঝরে পড়ে। কিছু সময় এভাবে থাকার পর নিজেকে সামলে নিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। দু'আ শেষে বাইতুল্লাহর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

মাহমূদুল হাসান
ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ

বাতিঘরের সন্ধানে

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঈসায়ী

হিফয প্রায় শেষের দিকে। আমি খুব চিন্তিত। কোথায় পড়বো? আলিয়ায় না কওমীতে? পরিবারে সবাই আলিয়ায় পড়াবে। আমার ইচ্ছা কওমী মাদরাসায় পড়বো। কিন্তু এটাতো প্রায় অসম্ভব? আমি একা একদিকে। আর পবিারের সবাই অন্য দিকে। আমি দু'আ করতে থাকি। দেখতে দেখতে হিফযখানার দিনগুলো শেষ হয়ে গেলো। আমার ভাই আমাকে নিতে এলেন। আমার উস্তাদ আমার ভাইকে আমাকে কওমী মাদরাসায় পড়ানোর জন্য উৎসাহ দিলেন।

বাড়িতে অনেক দিন কেটে গেলো। কোনো সিদ্ধান্ত হলো না। একদিন আমি সবাইকে বললাম, আমি কওমী মাদরাসায় পড়বো। কিন্তু পরিবারের কেউ মানতে চাইলো না। একদিন আমার দুলাভাইসহ মুফতী খুবাইব সাহেবের সাথে পরামর্শ করলাম। হুযূর বললেন, আমি কয়েক দিনের মধ্যে কয়েকজন ছাত্রকে কওমী মাদরাসায় ভর্তি করাতে ঢাকায় যাবো। তুমিও আমার সাথে যাবে। আমি বললাম, বাড়ির কেউ অনুমতি দিতে চায় না; কী করবো? দুলাভাই বললেন, মুফতী সাহেব যা বলেছেন তাই মেনে নাও। বাড়িতে এসে বিষয়টি জানালে ভাইয়া মেনে নিলেন। তবে শর্ত জুড়ে দেওয়া হলো কওমী মাদরাসায় পড়ার সাথে সাথে আলিয়া মাদরাসায়ও পড়তে হবে। আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানালাম।

দুদিন পর। মুফতী সাহেব জানালেন, আজ রাতে আমরা ঢাকায় রওনা হবো। আমি বললাম আমি প্রস্তুত আছি। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। আম্মা ও বোনের মুখে হাসি নেই। চেহারা মলিন হয়ে আছে। চোখে অশ্রু ঝরছে। কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন, ও ঢাকায় কি করে যাবে? কিভাবে থাকবে? তার খরচই বা কে বহন করবে? কাছেই কোনো মাদরাসায় পড়তে পারতো। এতদূর যাওয়ার প্রয়োজন

ছিলো না। কিন্তু আমি আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে ইলম অর্জনের জন্য ঢাকায় চলে আসি।

আল্লাহ আমাকে সহীহ ইলমে দীন অর্জন করার তাওফীক দান করুন এবং মাতা-পিতার অফুরন্ত সওয়াবের মাধ্যম হওয়ার তাওফীক দান করুন।

হাবীবুর রহমান
উস্তানী আউয়াল

ফিরে দেখা মা'হাদের একটি বছর

২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ ঈসায়ী

ভর্তি হলাম মা'হাদে। চার দিক অন্ধকার। কাউকে চিনি না। কারো সাথে পরিচয় নেই। মনটা ভীষণ খারাপ হতে লাগলো। কষ্টের মেঘ ভীড় জমাতে লাগলো। ভাবতে লাগলাম, হয়তো আবদ্ধ গ্লানি ভোগ করতে হবে। কিন্তু না। দু একদিন যেতে না যেতে যখন উস্তাদদের পরম ভালোবাসা ও পুরাতন বড় ভাইদের স্নেহময় আচরণের তুফান শুরু হলো তখন কষ্টের মেঘমালা দূর আকাশে হারিয়ে গেলো।

বছরের শুরু মজলিসগুলোতে হযরত মুমিনপুরী হুযূর, হযরত মানিকগঞ্জী হুযূর, হযরত ইবরাহীম হাসান সাহেব হুযূর ও হযরত মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব হুযূরসহ অন্যান্য উস্তাদদের সংস্পর্শ ও দরদমাখা সান্ত্বনা পেয়ে মা'হাদকে আপন ঘরের মতো মনে হতে লাগলো। ইসলাহী মজলিস, মুহাযারা ও অন্যান্য মজলিসগুলোর মাধ্যমে মুফতী দিলাওয়ার হুসাইন সাহেব, মাওলনান শরীফ মুহাম্মদ সাহেব, মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেব, মুফতী নূরুল আমীন সাহেব, বগুড়ার পীর সাহেব, মুফতী ইবরাহীম হেলাল সাহেব, মুফতী আহমাদুল্লাহ সাহেবসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরামের একান্ত সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি।

মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেবের নিয়মিত ক্লাস ও বোধগম্য তাকরীর আমার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। মুদীরে মা'হাদ মুফতী মাহমূদুল আমীন সাহেবকে ভালোভাবে না চেনার দরুণ প্রথম দিন তাঁর সাথে সাক্ষাত করা হয়নি। কিন্তু নিজেই এসে মিষ্টি হাসি দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এ আচরণ আমাকে যারপরনাই মুগ্ধ করেছে। নাযেমে দারুল ইকামাহ মাওলানা মাহমূদুল হাসান সাহেবকে সর্ব বিষয়ে মাথার ছায়া হিসেবে পেয়েছি। আমীনুত তা'লীম মুফতী হাফিজুর রহমান সাহেবের একান্ত চেষ্টা ও নিগরানীতে লেখা পড়ায় উন্নতি লাভ করেছি। মুফতী সাঈদুর রহমান সাহেব ও মুফতী ইরফান জিয়া সাহেবের প্রতিটি বয়ান ও ক্লাস মুতালাআর প্রতি জ্বলন্ত স্পৃহা জাগিয়েছে।

মুফতী মাহমূদুল হাসান কুমিল্লার হুযূর থেকে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিখেছি। মাওলানা আমীর হুসাইন সাহেব, মাওলানা সুহাইল আহমাদ সাহেব ও মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাহেবসহ সকল উস্তাদের কোমল আচরণ আমার মন কেড়েছে। ইনআম ভাই ও মাসুম ভাইয়ের রান্নার ঘ্রাণ ও স্বাদ আমাকে মুগ্ধ করেছে। সাথীদের সাথে মিলে মিশে থাকা, খেলাধুলা ও দল বেঁধে কলমারচর মাহফিল ইত্যাদিতে যাওয়ার সুখময় স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে কাঁদায়।

হে মা'হাদ! তুমি চিরকাল বেঁচে থাকো সুন্দর এ ভুবনে। তুমি হও সবার মাথার মুকুট। বিশ্বব্যাপী উজ্জ্বল হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক তোমার আলো। তবে মনে রেখো আমায়। ভুলে যেও না কভু। এ প্রত্যাশায়...

আবূ তালহা মাসউদ
ইফতা প্রথম বর্ষ [২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ]

ইলমের সন্ধানে

১৪ মার্চ ২০২০ ঈসায়ী

আমি তখন গ্রামের মাদরাসায় পড়ি। আমার ইচ্ছে হতো শহরে গিয়ে পড়া লেখা করার। আমাদের গ্রামে কয়েকজন ছাত্র ঢাকায় পড়তো। তারা বাড়িতে এলে তাদেরকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম। তাদের উত্তরে আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পেত। আল্লাহর কাছে দু'আও করতাম। একদিন আম্মুকে বললাম, আমি ঢাকায় পড়বো; বড় আলেম হবো। আম্মু বললেন, আচ্ছা! দেখি কার মাধ্যমে পাঠানো যায়। আম্মুর কথা শুনে আমি খুব আনন্দিত হলাম। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

ক'দিন পর। আম্মুকে জিজ্ঞেস করলাম, কার মাধ্যমে ঢাকা পাঠাবেন? আম্মু বললনে, ঢাকার মুহাম্মাদপুরে আমাদের বাড়ির পাশের একজন চাকরি করে। তার মাধ্যমে পাঠাবো। কিছুদিন পর সে হুযূর এলেন। আমরা তার বাসায় গিয়ে মনের আশা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, আমি যেখানে চাকরি করি সেখানে মা'হাদুল বুহূসিল ইসলামিয়া নামে একটি মাদরাসা আছে। সেখানে ভালো পড়া লেখা হয়। তোমাকে সেখানে ভর্তি করে দিতে পারবো।

ছুটি শেষ হয়ে এলো। হুযূর ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। আমিও সবকিছু গুছিয়ে নিলাম। আম্মুর কাছ থেকে দু'আ নিয়ে ঢাকার গাড়িতে চড়ে বসলাম। শেষবার আম্মুকে দেখে মনের অজান্তে কেঁদে ফেললাম। আম্মু বলেছিলেন, তোমাকে বড় আলেম হতে হবে। আমি শপথ করলাম, আমি আম্মুর আশা পূরণ করবোই ইনশাআল্লাহ।

সকাল ৮টায় গাবতলি নামলাম। প্রথমে দুলাভাইয়ের সাথে যাত্রাবাড়ি গেলাম। পরদিন হুযূর ফোনে বললেন, দ্রুত চলে আসো। আজ ভর্তির শেষ দিন। আমি

দ্রুত মুহাম্মাদপুর এসে হুযূরকে ফোন দিলাম। হুযূরের ফোন বন্ধ। হঠাৎ অচেনা নাম্বার থেকে ফোন এলো। আমাদেরকে মা'হাদ মাদরাসার সন্ধান দেওয়া হলো। আমরা যথানিয়মে মা'হাদে পৌঁছে যাই। আল্লাহর অনুগ্রহে মা'হাদে ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করি। আল্লাহ পাক হুযূরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আল্লাহ যেন আমাকে আমার আম্মুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

জাহিদুল ইসলাম
ইবতিদায়ী সানী

শূন্য থেকে শুরু

৫ ডিসেম্বর ২০২০ ঈসায়ী

২০১১ সাল। ঢাকার মুহাম্মাদপুরে স্থাপিত হলো একটি দীনী ইদারা। অল্প ক'জন ছাত্র। স্বল্প পরিসর। কিন্তু লক্ষ্য বহুদূর। সুদূরপ্রসারী চেতনা। নীতি ও লক্ষ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলতে থাকে আপন গতিতে। কালের আবর্তনে এখানে ওখানে কয়েকটি স্থান পরিবর্তন করে একসময় একটু স্থির হলো রাজধানী ঢাকার মুহাম্মাদপুরে বসিলা গার্ডেন সিটিতে। তবুও তো ভাড়া বাড়ি। একদিকে ভাড়া বাবদ প্রতি বছর ব্যয় হয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে সীমিত পরিসরের কারণে অধরা থেকে যাচ্ছে মা'হাদের নানামুখী স্বপ্ন। যেসব স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রয়োজন একটি নিজস্ব ক্যাম্পাস। প্রয়োজন একখণ্ড জমি।

শুরু হলো তোড়জোড়। মা'হাদের সদস্যবৃন্দ ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অদম্য ইচ্ছায় বসিলার গ্রীন সিটি-২ তে আল্লাহ তা'আলা মসজিদ মাদরাসার জন্য একখণ্ড জমির ব্যবস্থা করলেন। কল্পনার স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে ডানা মেলতে লাগলো। আশার আলো জ্বলে উঠলো মা'হাদের তলাবা ও আসাতিজায়ে কিরামের মাঝে। দীর্ঘ দিনের যাযাবর জীবন এই বুঝি ঘুচলো।

জায়গাটি নিয়ে পরিকল্পনা হলো। পরিকল্পনা মাফিক কিছু কাজও হলো সেখানে। অস্থায়ী অবকাঠামোর ভিতও রচিত হলো। কিন্তু কুদরতের ইচ্ছা ছিলো ভিন্ন। বুড়িগঙ্গার আকস্মিক ঘূর্ণাবর্তে ভাঙ্গনের শিকার হয় মা'হাদের প্রথম ভিত। গ্রিন সিটি মালিকদের মাধ্যমে শুরু হয় জায়গা বদলের চিন্তা। ব্যবস্থা হয়ে যায় আরেক খণ্ড জমির। সেখানেও কিছু কাজ হয়। এখানেও কুদরতের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নদীর সীমানা উদ্ধারের শিরোনামে সেই জমি চলে যায় বুড়িগঙ্গা গহ্বরে। আল্লাহর ফায়সালা বান্দার জন্য নিশ্চয়ই কল্যাণকর। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায় সাময়িক বেদনা অনুভব হলেও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তম কোনো প্রতিদানের আশায় বুক বাঁধলো মা'হাদ।

এদিকে বসিলায় জমির দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। পাঁচ লাখ টাকার জমি ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে পঞ্চাশ লাখ। কিন্তু আল্লাহর খাযানায় তো অভাব নেই। তিনি চাইলে বসিলার মধ্যেই মা'হাদের জমির ব্যবস্থা হওয়া কঠিন কিছু নয়।

বাস্তবেও তাই ঘটলো। আল্লাহ তা'আলা 'মিন হাইসু লা ইয়াহতাসিব' কিভাবে ব্যবস্থা করেন; তার বড় একটি প্রমাণ দেখতে পেলো মা'হাদ। আল্লাহর এক বান্দা মাদরাসা-মসজিদের নামে তার একটি জমি ওয়াকফ করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ স্বপ্ন দেখছিলেন। আর সেজন্য এমন কিছু মানুষকে খুঁজছিলেন যারা তাঁর এই আমানত হেফাজতের দায়িত্ব নিয়ে সেখানে মসজিদ মাদরাসার মহতি কাজ আঞ্জাম দিবে। এক সূত্রে মহৎ এই ব্যক্তিটির সাথে মা'হাদের যোগাযোগ হলো। মা'হাদের অর্থনীতি বিষয়ক উস্তাদ মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব দা.বা. -এর মধ্যস্থতায় অত্যন্ত আস্থার সাথে তিনি বসিলায় অবস্থিত তার একটি জমিতে মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ভার মা'হাদকে অর্পণ করলেন। ইনশাআল্লাহ, খুব দ্রুতই সেখানে মসজিদ মাদরাসার কাজ শুরু হবে।

আল্লাহরর দরবারে আমরা আশাবাদী, নিজস্ব পরিসরে মা'হাদের ইলমী ও দাওয়াতী কার্যক্রম আরো গতিময় হবে, ইনশাআল্লাহ।

মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ

স্মৃতির পাতায় পাহাড়পুরী হুযূর রহ.

২৮ জানুয়ারি ২০২১ ঈসায়ী

দুনিয়াতে আল্লাহর কিছু খাস বান্দা থাকেন, যাঁদের বেশ-ভূষা, আচার-আচরণ অতিসাধারণ হলেও মহান আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা অসাধারণ। কয়েক বছর আগে এমন এক মহা গুণের অধিকারী বুযুর্গ আমাদের মাঝ থেকে পরলোকগত হয়েছেন। যিনি সবার মাঝে 'পাহাড়পুরী হুযূর' নামে পরিচিত। অনেক গুণ-বৈশিষ্ট্য আর যোগ্যতার আধার ছিলেন তিনি। বিজ্ঞ জনেরা মনে করেন- আমাদের আকাবিরদের বর্ণিল জীবনের প্রোজ্জ্বল নমুনা ছিলেন তিনি। হুযূরের জীবন ছিল অনেকটা অনাড়ম্বর। গোটা জীবনকে ইবাদত-বন্দেগী, আত্মশুদ্ধি, সমাজ গঠন আর খাঁটি নায়েবে নবী তৈরির পিছনে ব্যয় করেছেন। তিনি সম্পর্কে হযরত হাফিজ্জী হুযূর রহ. এর কনিষ্ঠ জামাতা ও তাঁরই বিশিষ্ট খলিফা ছিলেন। হযরত হাফিজ্জী রহ.এর মত ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার মকতব তৈরীর স্বপ্ন বুকে নিয়ে পুরো বাংলাদেশ চষেছেন। হুযূর ছিলেন আমার প্রিয় ব্যক্তি! তিনি ছিলেন আমার আদর্শ!! আমি হুযূরকে অনেক মহব্বত করতাম। তাই হুযূরের বিয়োগ ব্যথা আমার হৃদয়ে ভীষণ ক্ষতের সৃষ্টি করে।

পৃথীবির নিয়ম- সবাই ভালোবাসার মানুষের মত জীবনটা সাজাতে চায়; তার চেতনাকে লালন করতে চায়; তার আদর্শ বুকে ধারণ করতে চায়। আমার জীবনেও তার ব্যতয় ঘটেনি। প্রিয় মানুষটির ছোট্ট ছোট্ট বাণী, তাঁর প্রতিটি উপদেশ এবং কাজকর্ম আমার জীবনে দারুণ রেখাপাত করে। হুযূর তাকওয়া পরহেযগারীতে ছিলেন পাহাড়সম। কিন্তু আমার বড় দুর্ভাগ্য যে, আমি হুযূরকে কাছে পেয়েও যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারিনি। কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বুঝবার মতো যোগ্যতা আমার তখন হয়েছিলো না। তবুও বলবো, আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. এর জীবনীতে পড়েছিলাম। তিনি বলেছেন, 'পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলার মানুষ প্রকৃত মানুষের কদর করতে জানে না।' আর এই সত্যটিই আমার জীবনে কঠিনভাবে ধরা দিয়েছে। যাহোক হুযূরের কিছু স্মৃতিচারণ করে সেই অব্যক্ত বেদনার উপশম করতে চাই।

তখন আমি জামি'আ ইসলামিয়া লালমাটিয়া মাদরাসার ছাত্র। একবার হুযূরের কাছে এক মাদরাসার মুহতামিম সাহেব এসে বললেন, হুযূর দু'আ চাই। মাদরাসা নিয়ে খুব পেরেশানীতে আছি। হুযূর একথা শুনে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, মিয়া! তোমার তো অনেক সৌভাগ্য, তুমি মাদরাসা তথা দীনী বিষয় নিয়ে পেরেশানীতে আছো। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত রেখেছেন। আল্লাহু আকবার! কত চমৎকার সান্ত্বনা!! কত বড় শিক্ষণীয় বিষয়!!!

আরেকদিনের ঘটনা। হুযূর লালমাটিয়া মাদরাসায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করছিলেন। নসীহতের এক পার্যায়ে বললেন, প্রিয় ছাত্ররা! তোমরা নিয়মিত আওয়াবিন, ইশরাক ও চাশতের নামাযের ইহতিমাম করবে। আমি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত বিশ রাকাআত নফল নামায পড়ি। অথচ হুযূর ছিলেন সে সময় ভীষণ মা'যূর। সুবাহানাল্লাহ! কত চমৎকারই না ছিলো হুযূরের জীবন। উনারাই তো হলেন আমাদের মহান পূর্বপুরুষ। কবির ভাষায়–

اولئك ابائي فجئني بمثلهم - إذاجمعتنا ياجرير المجامع

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের মত উৎকৃষ্ট জীবন গড়ার এবং তাঁদের জীবনী অধ্যায়ন করে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন।

মাসীহুর রহমান
ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ

ঝরে পড়লো আরেকটি নক্ষত্র

১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ঈসায়ী

২৭ রবিউস সানী ১৪৪২ হিজরী। ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ঈসায়ী। রোজ রবিবার। লক্ষ-কোটি হৃদয়ের স্পন্দন, দেশবরেণ্য আলেমে দীন, হাজার হাজার আলিমের পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আল্লামা নূর হুসাইন কাসেমী রহ. আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত রহ.-এর এই আকস্মিক বিদায়ে শোকবিদ্ধ কোটি প্রাণ। যেন প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পতিত জাহাজ তার চৌকষ নাবিক হারাল। কাফেলা হারাল তার রাহবার। প্রবাদ আছে– একজন সত্যিকার আলিমের মৃত্যু যেন জগতবাসীরই মৃত্যু। বড় হতভাগ্য আমরা! এই প্রবাদই আমাদের জীবনে বড় সত্য হয়ে ধরা দিল হুযূরের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। মিথ্যার সাথে আপোষহীন এই মহানায়ক কখনোই খলনায়কের ভূমিকা অবলম্বন করেননি। ফলে তার প্রতিটি কথাই বাতিলের প্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি করেছে। ভয়ে কেঁপেছে তাগুত। সত্যপ্রিয় ভক্তদের সীমাহীন ভালোবাসার ফলে তার প্রতিটি মাহফিলই পরিণত হতো জনসমুদ্রে। মহান আল্লাহর কি অপার মহিমা! একই দৃশ্য লক্ষ করা গেছে হযরতের মৃত্যুর পরও।

বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসা লাখো লাখো ভক্তরা শেষ বারের মত তাকে এক নজর দেখার জন্য ভীড় জমিয়েছিল তার জানাযাস্থলে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। হযরতের মৃত্যুর পরের দিন বা'দ ফজর এ'লান করা হলো– 'সকাল ৯ টায় জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমে অনুষ্ঠিত হযরতের মুবারক জানাযায় মা'হাদের ইফতা বিভাগের সকল ছাত্র অংশগ্রহণ করবে।' ঘোষণা শুনামাত্রই মনটা ভরে গেল।

দলবদ্ধ হয়ে জানাযার উদ্দেশ্যে জাতীয় মসজিদের দিকে রাওনা হয়ে গেলাম। পৌঁছামাত্রই দেখি, সারা দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম, লাখো মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, লক্ষ লক্ষ কাসেমী ভক্ত জানাযার নামাযে অংশ নিতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন বাইতুল মুকাররম প্রাঙ্গনে। লোকে লোকারণ্য জানাযাস্থল। জানাযার নামায আদায়ের পূর্বে কয়েকজন শীর্ষ আলিমে দীন হযরতকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে তার গুণাবলীর নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রোতাদের মাঝে পিনপতন নীরবতা। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। সে নীরবতা ভাঙ্গলো চারিদিক থেকে ভেসে আসা কান্নার সুরে। কেউ স্বশব্দে কেউবা নিঃশব্দে।

সবাই আজ শোক সাগরে নিমজ্জিত। আমিও নিজেকে সংবরণ করতে ব্যর্থ হলাম। মনের অজান্তেই কপোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বক্তব্যের সারাংশ এমন– হযরতের মৃত্যু দেশ ও জাতির জন্য এক বিশাল শূন্যতা। জাতি হারিয়েছে বাতিলের সাথে আপোষহীন নেতা, হকের উপর অবিচল সৈনিক, হাদীসের মসনদের মহান শাইখ, সিয়াসী ময়দানে একজন আদর্শ রাজনীতিবিদ, আধ্যাত্মিকতার জগতে একজন কামিল বুযুর্গ।

সকাল ৯ টা ১০ মিনিটে হযরতের জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ইমামতি করেন হযরত রহ. এর ছোট সাহেবযাদা মুফতী জাবের কাসেমী দামাত বারাকাতুহুম।

মহান প্রভুর দরবারে আমাদের প্রার্থনা– ইয়া আল্লাহ! আপনি আপনার এই মর্দে মুমিন ও মর্দে মুজাহিদকে শান্তির ছায়ায় আশ্রয় দিন এবং আমাদেরকে হযরতের নি'মাল বদল দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ সাইফুদ্দীন
ইফতা দ্বিতীয় বর্ষ

হাজী শরীয়তুল্লাহর উত্তরসূরী

১৫ জানুয়ারি ২০২১ ঈসায়ী

বেশ কয়েক দিন ধরে আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ মুদীর সাহেব হুযূর দামাত বারাকাতুহুম এর আব্বাজান ভীষণ অসুস্থ। ক'দিন আগে শারীরিক অবস্থার অবনতির কারণে বেশ কিছুদিন হাসপাতালেও ভর্তি ছিলেন। তবে এখন অনেকটা সুস্থ হলেও শঙ্কামুক্ত নন। থাকেন আমাদের মাদরাসারই উত্তর পাশে মুদীর সাহেব হুযূরের ভাড়া ফ্লাটে। প্রথম সাময়িক পরীক্ষার বিরতির শেষের কয়েকদিন আমার মাদরাসায় থাকার পালা। এরই সুবাদে আল্লাহর শোকর হুযূরের বাবার কিছু খিদমত করার সুযোগ হয়।

একেবারে শয্যাশায়ী; তার উপর আবার সামান্য বিস্মৃতির প্রভাব। নিজ আত্মীয় স্বজনদেরও অনেক সময় চিনতে পারেন না। তবে শ্রদ্ধেয় মুদীর সাহেব হুযূরকে সবসময় চিনেন। আমার কাছে মনে হয়েছে দিবা-রাত্রি শত ব্যস্ততার মাঝেও আব্বার কাছে থাকাকে প্রাধান্য দানই এর একমাত্র রহস্য। আমি কাছ থেকে যতটুকু দেখেছি, হুযূর হৃদয়ের সবটুকু উজাড় করে বাবার খিদমত করেন। যেন বাবা তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় বাবাকে মুখে তুলে খাবার খাইয়ে দিতেন হুযূর। রাত জেগে বাবার সার্বিক প্রয়োজন পূরণ করেন। একদিন রাতে

হুযূর বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যাবেন। আমাকে বললেন, 'সুহাইল! রাত দু'টো থেকে আব্বার পাশে থাকতে হবে; তুমি প্রস্তুত আছো তো? কখনো বিছানা থেকে উঠে বসতে চাইলে বসাবে আর পানি পান করতে চাইলে পান করাবে।' বললাম, ইনশাআল্লাহ আমি প্রস্তুত আছি।

হুযূরের বাসায় হুযূরের বাবার পাশের বেডে রাত দুটো পর্যন্ত ঘুমালাম। দুটোর দিকে উঠে পাশে গিয়ে বসলাম। জিজ্ঞাসা করলেন– তুমি কেডা? হুযূরের বড় ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন– আল-আমীন (এ নামেই তিনি পরিবারের কাছে বেশি পরিচিত)-এর ছাত্র। এরপর হুযূরের ভাই বিশ্রামে চলে গেলেন। কখনো উঠে বসতে চাইলে ধরে বসাই, পানি পান করতে চাইলে পানি পান করাই। মাঝে মাঝে উচ্চস্বরে আল্লাহ বলে উঠেন। কিছুক্ষণ পরপরই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন– তুমি কেডা? আমি উত্তর দেই। মনের অজান্তেই আনমনা হয়ে ভাবতে থাকি নব্বই বছরের শয্যাশায়ী এই জ্ঞান তাপসকে নিয়ে। যিনি হাজী শরীয়তুল্লাহ রহ.-এর উত্তরসূরী। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের লড়াকু সৈনিক। আপোষহীন মরদে মুজাহীদ। গ্রামে-গঞ্জে যাঁর রয়েছে অসংখ্য ভক্তবৃন্দ। যারা তাদের প্রাণপুরুষকে এক নজর দেখার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। যাদের হৃদয়ে রয়েছে তার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা। ভাবনার ঘোর কাটল হুযূরের বাবার আওয়াজে, 'তুমি যাও, মাওলানার আম্মা আইবো।' আমি অবাক হলাম হুযূরের আম্মা এখন কি করে আসবেন? তিনি তো এখন ঘুমাচ্ছেন। আমি একবার বাইরে যাই আবার ভিতরে আসি। কারণ তিনি একা হয়ে গেলে কি হয় বলা মুশকিল! হুযূরের আব্বাজান নাছোড়বান্দা। আমাকে আড়ালে যেতেই হবে। পরিশেষে পর্দার আড়ালে গিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ইতোমধ্যে হুযূরের আম্মা এসে হাজির! স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলে এ ভেবে আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, তিনি কি করে বুঝলেন, হুযূরের আম্মা তাঁর কাছে আসতে চাইছেন, কিন্তু আমার কারণে আসতে পারছেন না? যাহোক কৌতুহল নিয়ে পরবর্তীতে আমি মুদীর সাহেব হুযূরের কাছে ঘটনাটি ব্যক্ত করলে তিনিও আমাকে এরূপ ঘটনা শুনালেন। বুঝলাম আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের ব্যাপার...।

মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাই– তিনি যেন তাঁর এই প্রিয় বান্দাকে দ্রুত সুস্থ করে দেন। যাতে তিনি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন। আমীন।

সুহাইল আহমাদ
ইফতা ২য় বর্ষ

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া'র

ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

মা'হাদ সুদূরপ্রসারী চতুর্মুখী শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুমহান লক্ষ্য নিয়ে ধীর ধীরে এগিয়ে চলছে। মা'হাদ ইসলামী ফাতওয়া ও উচ্চতর গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে তার কার্যক্রমের সূচনা করলেও ইতিমধ্যেই মকতব, নাযেরা, তাহফীযুল কুরআন ও কিতাব বিভাগের প্রথম থেকে তৃতীয় জামাআত (জামাআতে তাইসীর থেকে জামাআতে নাহ্‌বেমীর)-এর মাধ্যমে তা সমৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কিতাব বিভাগের চতুর্থ জামাআত উস্তানী সানী (জামাআতে হিদায়াতুন্নাহ্‌ব) খোলা হবে ইনশাআল্লাহ। মা'হাদের চলমান বিভাগগুলোতে ভর্তি সংক্রান্ত কিছু নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে। ভর্তি নীতিমালা সংক্রান্ত সেসব তথ্যাবলী নিম্নে প্রদত্ত হলো-

দুই বছর মেয়াদী ফিকহ ও ফাতওয়া বিভাগ

ফরম সংক্রান্ত ধারাক্রম

(ক) টোকেন সংগ্রহ, (খ) রেজাল্ট সত্যায়ন, (গ) মৌখিক পরীক্ষা,
(ঘ) লিখিত পরীক্ষা, (ঙ) ভর্তি ফরম সংগ্রহের অনুমোদন

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

(১) হিদায়া আখেরাইন, (২) নূরুল আনওয়ার, (৩) বিষয়ভিত্তিক আরবী-বাংলা প্রবন্ধ, (৪) মৌখিক পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হতে পারে

ভর্তির যোগ্যতা

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে তাকমীল জামাআতে ন্যূনপক্ষে জায়্যিদ জিদ্দান (প্রথম বিভাগ)-এ উত্তীর্ণ হতে হবে।

ইবতিদায়ী আউয়াল (জামাআতে তাইসীর)

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

(১) উর্দূ কায়িদা শুদ্ধরূপে পাঠ

(২) কুরআনুল কারীম বিশুদ্ধ নাযেরা পাঠ

ইবতিদায়ী সানী (জামাআতে মীযান)

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

(১) তাইসীরুল মুবতাদী

(২) ফারসী কি পেহলী কিতাব

উস্তানী আউয়াল (জামাআতে নাহ্‌বেমীর)

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

ক. মীযান মুনশাঈব/ইলমুস সরফ

খ. এসো আরবী শিখি

আগামী শিক্ষাবর্ষের নতুন সংযোজন : উস্তানী সানী (জামাআতে হিদায়াতুন্নাহ্‌ব)

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

ক. নাহ্‌বেমীর

খ. ইলমুস সরফ ৩য় ও ৪র্থ/পাঞ্জেগাঞ্জ

তাহফীযুল কুরআন বিভাগ

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর যোগ্যতা

ক. তাজবীদ-সিফাত অনুকরণে বিশুদ্ধ কুরআন পাঠে সক্ষম হতে হবে

খ. ভর্তিচ্ছু তালিবে ইলমের বয়স অনূর্ধ্ব ১২ বছরে সীমিত হতে হবে

নাযেরা (দেখে কুরআন পাঠ) বিভাগ

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর যোগ্যতা

ক. তাজবীদ-সিফাত অনুকরণে বিশুদ্ধ আমপারা পাঠে সক্ষম হতে হবে

খ. ভর্তিচ্ছু তালিবে ইলমের বয়স অনূর্ধ্ব ১২ বছরে সীমিত হতে হবে

নূরানী মকতব (প্রাথমিক শিশু শ্রেণী) বিভাগ

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর যোগ্যতা

পাঠ গ্রহণকারী ছাত্রের বয়স ৫ বছর হতে অনূর্ধ্ব ১২ বছরে সীমিত হতে হবে

জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত ও বয়স্কদের জন্য 'ফরযে আইন কোর্স'

দীনী জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্যই আবশ্যক। যারা জাগতিক, পারিবারিক, চাকুরী ব্যবসাসহ নানা ব্যস্ততার কারণে ফরয পরিমাণ দীন শিখতে পারছেন না তাদের জন্য এই কোর্সটি চালু করা হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যার দু'টি শিফটে ছাত্র ভর্তি নেওয়া হবে।

বি.দ্র. মা'হাদের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় হিজরী বর্ষের শাওয়াল মাস থেকে। সুতরাং হিজরী বর্ষের শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ থেকে মা'হাদের নতুন ছাত্র ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়।

ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় যোগাযোগ

শিক্ষা দফতর

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া

বাড়ি-১৩, রোড-০২, ব্লক-ডি, বসিলা গার্ডেন সিটি
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৭৬২৮৫২৪৮৩, ০১৯৪০৩৭৬৭৪০

মা’হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার
মজলিসে শূরার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

হযরত মুফতী ইবরাহীম হাসান দা.বা.

খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার (করাচীর হযরত) রহ.
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

হযরত মুফতী ইবরাহীম হেলাল দা.বা.

খলীফা, মুহিউস সুন্নাহ হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.
নায়েবে মুহতামিম ও মুহাদ্দিস, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

হযরত মুফতী সাঈদ আহমাদ দা.বা.

খলীফা, মুহিউস সুন্নাহ হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.
নায়েবে মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

হযরত মুফতী আহমাদুল্লাহ দা.বা.

খলীফা, হযরতুল আল্লাম মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী রহ.
মুহাদ্দিস, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মা’হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার
সম্মানিত পরিচালনা পরিষদ

১.	মুফতী মাহমূদুল আমীন	*সভাপতি*
২.	মাওলানা মাহবূবুর রহমান	*সহ-সভাপতি*
৩.	মাওলানা মাসউদুর রহমান	*সেক্রেটারি*
৪.	মাওলানা কামরুল হাসান	*সহকারী সেক্রেটারি*
৫.	মাওলানা আরিফ হুসাইন	*অর্থ সম্পাদক*
৬.	মাওলানা গাজী নুসরাতুল্লাহ	*প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক*
৭.	মাওলানা আবূ হুরাইরা	*দপ্তর সম্পাদক*
৮.	মাওলানা রাকিব হাসান	*শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক*
৯.	মাওলানা শাহ আশরাফুল ইসলাম	*আবাসন সম্পাদক*
১০.	মাওলানা এম. এরশাদ উল্লাহ আকমাল	*নির্বাহী সদস্য*
১১.	মাওলানা শামসুল ইসলাম	*নির্বাহী সদস্য*
১২.	মাওলানা মাসূম বিল্লাহ	*নির্বাহী সদস্য*

মা’হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়ার
সম্মানিত আসাতিযায়ে কেরাম

১.	মাওলানা মুফতী ইবরাহীম হাসান	*প্রধান মুফতী*
২.	মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমাদ	*উসতাযুল ইকতিসাদিল ইসলামী (ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক উস্তাদ)*
৩.	মাওলানা মুফতী মাহমূদুল আমীন	*মুদীর (পরিচালক)*
৪.	মাওলানা মুফতী হাফিজুর রহমান	*আমীনুত তা’লীম (শিক্ষাসচিব)*
৫.	মাওলানা মাহমূদুল হাসান	*নাযিমে দারুল ইকামা*
৬.	মাওলানা মুফতী মাহমূদ বিন ইলিয়াস	*মুদাররিস (শিক্ষক)*
৭.	মাওলানা সুহাইল আহমাদ	*মুদাররিস (শিক্ষক)*
৮.	মাওলানা আমীরুল ইসলাম	*মুদাররিস (শিক্ষক)*
৯.	মাওলানা হুসাইন আহমাদ	*মুদাররিস (শিক্ষক)*
১০.	মাওলানা ইরফান জিয়া	*মুদাররিস (শিক্ষক)*
১১.	মাওলানা সাঈদুর রহমান	*মুদাররিস (শিক্ষক)*
১২.	হাফেয মাওলানা উমর ফারূক	*মুদাররিস (শিক্ষক); তাহফীযুল কুরআন বিভাগ*
১৩.	হাফেয শফীকুল ইসলাম	*মুদাররিস (শিক্ষক); তাহফীযুল কুরআন বিভাগ*
১৪.	হাফেয আবূ দাউদ	*মুদাররিস (শিক্ষক); তাজবীদুল কুরআন বিভাগ*
১৫.	হাফেয আতাউর রহমান	*মুদাররিস (শিক্ষক); নূরানী মকতব বিভাগ*
১৬.	জনাব আনিসুর রহমান	*কম্পিউটার বিভাগ প্রধান ও উন্নয়ন পরিকল্পক*
১৭.	ড. মুহাম্মাদ আবদুল হাননান	*ভাষা সাহিত্য শিক্ষক*
১৮.	মাওলানা আবূ সাঈদ	*যিম্মাদার; কলমারচর শাখা*
১৯.	হাফেয আব্দুর রায্‌যাক	*মুদাররিস (শিক্ষক); কলমারচর শাখা*
২০.	হাফেয রফীকুল ইসলাম	*মুদাররিস (শিক্ষক); কলমারচর শাখা*
২১.	মুহাম্মাদ মি’রাজুল ইসলাম	*মুদাররিস (শিক্ষক); কলমারচর শাখা*
২২.	মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান	*মুদাররিস (শিক্ষক); কলমারচর শাখা*

মা’হাদের লিল্লাহ বোর্ডিং ও সাধারণ ফান্ডে দান করার ঠিকানা

MAHADUL BUHUSIL ISLAMIA
A/C No: 0831020002658 (General Fund)
0831220000197 (Lillah Fund)
Al-Arafah Islami Bank
Branch: Atibazar, Keraniganj

<u>অডিটর</u>

জনাব কামরুল হাসান, এফ.সি.এ
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, মা’হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া
মোবা : ০১৭১১৮৯২১০৫

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া'র

সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দের নাম

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
০১	মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব	বাইতুল মুয়াযযম মসজিদ কোয়ার্টার, নুরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
০২	মুফতী মাহমুদুল আমীন	মির্জারচর, মির্জারচর সিনিয়র মাদরাসা, শিবচর, মাদারীপুর
০৩	মাওলানা মাহবুবুর রহমান	৩২৮ লিচুবাগান, পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
০৪	মাওলানা আবু হুরায়রা	এন/১৪, নুরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
০৫	মাওলানা মাসউদুর রহমান	৪০/কে দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, ঢাকা
০৬	মাওলানা রাকীব হাসান	বাড্ডা নগর লেন, হাজারীবাগ, ঢাকা
০৭	মাওলানা আরিফ হোসাইন	২২ তল্লাবাগ, শেরে বাংলা রোড, জিগাতলা, ঢাকা-১২০৯
০৮	মাওলানা গাজী নুসরাতুল্লাহ	৩/এ অভয়দাস লেন, টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩
০৯	মাওলানা কামরুল হাসান	৭৬/২/এম/৬ উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা, ২নং গেট, ঢাকা
১০	মাওলানা মো. মাসুম বিল্লাহ	৩৩৫ নয়াটোলা, মগবাজার, মধুবাগ, ঢাকা-১২১৭
১১	মুফতী রহমত উল্লাহ	৪০/কে দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, ঢাকা
১২	মাওলানা শামসুল ইসলাম	রোড-৩, বাড়ি-২৫, হিরাঝিল আ/এ, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
১৩	মাওলানা শাহ আশরাফুল ইসলাম	৬২/এ, ব্লক-ই, জাকির হোসেন রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৪	মাওলানা এম. এরশাদ উল্লাহ আকমাল	রোড-১৪/সি, বাড়ি-৭, সেকশন-৪, উত্তরা, ঢাকা
১৫	আলহাজ মোমিন মিয়া	এন/১৪, নুরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১৬	জনাব ফেরদাউস মাজীদ	'রেডউড' বাড়ি- ৮৭, রোড- ২৫/এ, ব্লক- এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
১৭	জনাব সৈয়দ এনায়েতুল্লাহ	২০০, বনবীথি আবাসিক এলাকা, (সৈয়দ আব্দুল মোনেম আই হসপিটাল), মৌলভীবাজার
১৮	জনাব মো. আব্দুস সালিম	মুক্তার বাড়ি, উত্তর চাড়ীপুর, ফেনী
১৯	জনাব আলহাজ আতাউর রহমান	৪০/কে দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, ঢাকা
২০	জনাব আলহাজ মনোয়ারা রহমান	৪০/কে দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, ঢাকা
২১	জনাব হাজী আব্দুস সাত্তার	৭৬/২/এম/৬ উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা, ২নং গেট, ঢাকা
২২	জনাব কাজী ওয়াছিউদ্দিন	৩০, আব্দুল আজিজ লেন, লালবাগ, ঢাকা
২৩	মুহাম্মাদ শরফুদ্দীন	পি.ডব্লিউ.পি, অফিসার্স কোয়ার্টার, আজিমপুর, ঢাকা।
২৪	জনাব সাদাকাত হোসেন চৌধুরী	বাসা-৫০, রোড-৩, রূপালী হাউজিং, সেকশন-৩, মিরপুর, ঢাকা
২৫	জনাব ওয়ালিউল্লাহ রাব্বিল	২১ নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
২৬	জনাব আসফাক আহমেদ	৩৭০ উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭
২৭	জনাব এস.এম আব্দুল্লাহিল কাফী	১৩/বি দক্ষিণ খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
২৮	জনাব রোকেয়া হোসেন	২২ তল্লাবাগ, শেরে বাংলা রোড, জিগাতলা, ঢাকা
২৯	জনাব এ. কে. এম. শহীদুল্লাহ	৮৮/আই, আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা
৩০	জনাব মোজাম্মেল হোসেন	এন/১৪, নুরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৩১	মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম সোহেল	৬৭/এ, রোড- ০৩, ঢাকা রিয়েল এস্টেট, কাটাসুর, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৩২	এ.এস.এম হুমায়ূন কবীর	৬৯/সি, আজিমপুর সরকারি কলোনি, আজিমপুর, ঢাকা
৩৩	জনাব মো. আনিসুর রহমান	৩০/১৮ তাজমহল রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৩৪	জনাব মাহমুদুর রহমান (রাজীব)	গাইবান্ধা

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
৩৫	জনাব মো. আবুল হাসান	৩৮/বি, মায়াকানন, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
৩৬	জনাব নূর মুহাম্মাদ	৬১৯/বি, বাইতুল আমান হাউজিং, রোড নং ৪, আদাবর, ঢাকা
৩৭	জনাব ডা. মো. ওমর ফারুক	৮১-এ আজিমপুর এস্টেট, ঢাকা
৩৮	জনাব উম্মে সালমা আক্তার	রোড-৩৪, বাড়ি-৩, উত্তরা, ঢাকা
৩৯	জনাব ফিরোজ মাহমুদ	সানারপাড়, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
৪০	জনাব মাওলানা সালেহ আহমেদ	৪০/এ/১ দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, ঢাকা
৪১	মুহিউদ্দীন আহমাদ	ব্লক- ই, রোড- ০২, হাউজ- ০১, মিরপুর-১, ঢাকা।
৪২	জনাব মো. মহসিন সরকার	রাজারবাগ, ঢাকা
৪৩	জনাব মো. মেহেদি হাসান সরকার	৩২৮ লিচুবাগান, পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
৪৪	জনাব আব্দুল গফুর	ফ্ল্যাট-৫/এ, এস.ই.এল, আলতাফ গ্লোরি, ২৫৯ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
৪৫	জনাব হাজী মো. রাজা মিয়া	২১ নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৪৬	জনাব এলাহী খলিফা	মিরপুর, ঢাকা
৪৭	জনাব আনোয়ার হোসেন	রাজিয়া সুলতানা রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৪৮	জনাব আলহাজ হাসিনা বেগম	৭৬/২/এম/৬ উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা, ২নং গেট, ঢাকা
৪৯	জনাব মো. আনোয়ার হোসেন	২২ তল্লাবাগ, শেরে বাংলা রোড, জিগাতলা, ঢাকা
৫০	জনাব মাওলানা একরামুল হক	১৩১ আজিমপুর রোড, রংপুর হাউজ
৫১	জনাব আলহাজ মনোয়ারা বেগম	এন/১৪, নূরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৫২	জনাব ইকবাল আহমেদ	ব্রিংহাম, ইংল্যান্ড
৫৩	জনাব আলহাজ আবু নাসের ভূঁইয়া	৩৩৫ নয়াটোলা, মগবাজার, মধুবাগ, ঢাকা-১২১৭
৫৪	জনাব আলহাজ ফাতেমা বেগম	৩৩৫ নয়াটোলা, মগবাজার, মধুবাগ, ঢাকা-১২১৭
৫৫	জনাব মাওলানা মিসবাহুল ইসলাম	৩৬/১-ডি, কালুনগর রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা
৫৬	জনাব শোয়াইব আহমদ	নুরুন্নাহার ভিলা, ১২৯ দক্ষিণ কমলাপুর, ঢাকা
৫৭	জনাব শাহনূর ইসলাম	প্রযত্নে: মাওলানা শাহ আশরাফুল ইসলাম
৫৮	জনাব নূর আহমদ	৬৬/এ আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা
৫৯	জনাব হাসিনা খাতুন	বাড়ি-৩৬, রোড-১৩, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯
৬০	জনাব ওবায়দুর রহমান (ওসামা)	৪০/কে দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, ঢাকা
৬১	জনাব ফকীর কামাল উদ্দীন	৭৬/ডি আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা
৬২	মুহাম্মাদ সিদ্দিকুর রহমান	ডি/৬০ তালবাগ, সাভার, ঢাকা-১৩৪০
৬৩	ড. আরজুমন্দ আরা বানু	প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৬৪	ড. মুহাম্মাদ আবদুল হাননান	৬৮/১ডি আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা-১২০৫
৬৫	জনাব হোসাইন আহমদ	২০বি/৪ টুইন টাওয়ার, শান্তিনগর, ঢাকা
৬৬	মরহুম হাজী আলতাফ হোসেন	১১৭ গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা
৬৭	মুহাম্মাদ জসিমুদ্দীন	বাড়ি- ৪৮, রোড- ০৭, রফিক হাউজিং, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা
৬৮	মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম	৬৮/জি আজিমপুর গভ.অফিসার্স কলোনি, ঢাকা
৬৯	রিজওয়ানা রুকাইয়্যা	২১নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।
৭০	তানভীর আসিফ	৭৬/২/ই/২৬সি উত্তর যাত্রাবাড়ি, বিবিরবাগিচা, ঢাকা-১২০৪
৭১	মুহাম্মাদ কামরুল হাসান	এপার্টমেন্ট ৩/এ, বাড়ি-৮৪, রোড-১২, সেক্টর-১০, উত্তরা
৭২	দিলরুবা ইয়াসমিন	এপার্টমেন্ট ৩/এ, বাড়ি-৮৪, রোড-১২, সেক্টর-১০, উত্তরা

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
৭৩	মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার	৪১/১৯ সি, চান মিয়াঁ হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৭৪	মুফতী সাঈদ আহমাদ দা.বা.	জাপান গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৭৫	মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান	বাসা-১৩, রোড-১০, ব্লক-এ, চন্দ্রিমা মডেল টাউন, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৭৬	জনাব আনিসুর রহমান	ফ্ল্যাট-৭/বি, ২/২বি, আলী নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর
৭৭	জনাব জহিরুল হক ভুঁইয়া	১৪/সি/৬, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, আজিমপুর, ঢাকা
৭৮	সৈয়দ ওয়ালিউল হক	২৭১/২৯, নিরিবিলি হাউজিং, শংকর, ঢাকা-১২০৭
৭৯	জনাব আরিফ আহমেদ	৫৪ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা
৮০	জনাব মুহাম্মাদ বাবুল মিয়া	দড়ি ভেলানগর, বি-বাড়িয়া
৮১	মরহুমা তাসলিমা বেগম	৩৭নং গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫
৮২	এ্যাড. মুহাম্মাদ মতিউর রহমান	ফ্ল্যাট-৭/বি, ২/২বি, আলী নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর
৮৩	আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈল	ফ্ল্যাট-৭/বি, ২/২বি, আলী নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মাদপুর
৮৪	জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল হাই	গ্রাম- ইমামনগর, পোস্ট- জয়মন্টপ, থানা- সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ
৮৫	সানজিদা বেগম	গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫
৮৬	মুহাম্মাদ এরশাদ হোসেন	গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫
৮৭	জামিলা খাতুন	গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫
৮৮	আনোয়ার হোসেন	৪/১ শিকারীটোলা, গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫
৮৯	সুষমা আরজুমন্দ প্রাপ্তি	সোনারং, টঙ্গীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ
৯০	রায়হান মাহমুদ হাননান	সোনারং, টঙ্গীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ
৯১	জনাব মুহাম্মাদ রূহুল আমীন	আহম্মদিয়া স্কুল রোড, শিপইয়ার্ড, খুলনা সিটি, খুলনা
৯২	মাওলানা আরিফ বিল্লাহ	ভবানীপুর, জিয়ানগর, পিরোজপুর
৯৩	মুহাম্মাদ ওয়াহিদুজ্জামান	৫২/২ বাড্ডা নগর লেন, নিউ মার্কেট, হাজারীবাগ, ঢাকা
৯৪	মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম	গ্রাম- বীরকোট, পোস্ট- কানকির হাট, থানা- সেনবাগ, নোয়াখালী
৯৫	মুহাম্মাদ নাসীর মুনইম হুসাইন	হাউজ- ২৭, রোড- ১১৪, ব্লক- সি.ই.এন, গুলশান-২, ঢাকা
৯৬	মরহুম আব্দুর রশীদ	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
৯৭	মাফিয়া খাতুন	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
৯৮	জনাব গোলাম মোস্তফা	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
৯৯	সাবেকুন নাহার	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১০০	নূরুদ্দীন মাহমুদ রাইয়ান	২১ নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১০১	মুহাম্মাদ ফায়েজুর রহমান বিশ্বাস	৯২/এফ আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা
১০২	মিসেস দিল মাহমুদা কেয়া	২১নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭।
১০৩	মুহাম্মাদ বদরুল মুনির জাহাঙ্গীর	বাসা- ৮২, রোড- ০২, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১০৪	জনাব নিয়াজ মোরশেদ	৭৫/সি/৪, শেহোর, ডি.বি রোড, মোমেনশাহী
১০৫	এম. এস. আহমাদ আলী	২নং নর্থ সাউথ রোড, বছিলা গার্ডেন সিটি লি. মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১০৬	মরহুম আব্দুল আজীজ	c/o এমরান আজিজ, ১/১০ ব্লক-জি, লালমাটিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১০৭	জনাব আজহার হোসেন	c/o মুহাম্মাদ মাহমূদ হোসেন, ১২/১, পি.সি ব্যানার্জী লেন, সিংটোলা, ঢাকা-১১০০
১০৮	আনিকা ফেরদৌস	ফ্লাট-১৫ জে, কনকর্ড এম্পোরিয়াম, ২৫৩-২৫৪ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
১০৯	জনাব মকবুল হোসেন	মুহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১১০	মরহুমা রাবেয়া বেগম	৭৮/ই, আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
১১১	এ কে এম বজলুর রহমান	৭৮/ই, আজিমপুর অফিসার্স কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১১২	সাফিনা হক	২২ তল্লাবাগ, শেরে বাংলা রোড, জিগাতলা, ঢাকা-১২০৯
১১৩	জনাব মচির আহাম্মদ মজুমদার	৮৫/জি, আজিমপুর সরকারি কলোনি, আজিমপুর, ঢাকা
১১৪	মুহাম্মাদ দবিরুল ইসলাম	এভিনিউ-৬, রোড-৮, ৬১৪ ডি.ও.এইচ.এস, মিরপুর, ঢাকা
১১৫	মুহাম্মাদ আমিনুর রহমান খান	৯০/জি, আজিমপুর সরকারি কোয়ার্টার, লালবাগ, ঢাকা-১২০৫
১১৬	মরহুম আইয়ুব হোসেন	৯০/জি, আজিমপুর সরকারি কলোনী, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১১৭	আলহাজ মুফাজ্জল হুসাইন ভূইয়া	৮/নর্থ সাউথ রোড, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১১৮	হাজিয়াহ হায়াতুন নেসা	৮/নর্থ সাউথ রোড, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর,ঢাকা-১২০৭
১১৯	মুহাম্মাদ হামিদ জমাদ্দার	৫৪/সি, আজিমপুর সরকারি কোয়াটার্স, লালবাগ, ঢাকা-১২০৫
১২০	আলহাজ মুহাম্মাদ জিয়াউর রহমান	২৮/৩, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১২১	মুহাম্মাদ তাফহীমুল ইসলাম	২৮/৩, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১২২	মুহাম্মাদ মনিরুজ্জামান	৬৭/সি, আজিমপুর সরকারি কলোনী (যয়তলা)
১২৩	মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান	বাড়ি-১, ফ্ল্যাট-ই/৫, মিরপুর-১৫, ঢাকা-১২১৬
১২৪	মুহাম্মাদ আবরার	৩২৮ লিচুবাগান, পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা
১২৫	আলহাজ মাহমূদুল হক	মনু বেপারীর ঢাল, কেরাণীগঞ্জ
১২৬	মরহুম ঈমান উদ্দিন বিশ্বাস	৯২/এফ আজিমপুর সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার, আজিমপুর, ঢাকা
১২৭	মরহুমা রোকেয়া বেগম	৯২/এফ আজিমপুর সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার, আজিমপুর, ঢাকা
১২৮	মারজান মোস্তফা	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১২৯	মারজিয়া মোস্তফা	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩০	হুমাইরা মোস্তফা	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩১	জনাব মুহাম্মাদ মজিবর রহমান	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩২	শামীমা আক্তার	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩৩	রাবেয়া খাতুন	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩৪	জনাব সুলতান মিয়া	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩৫	মরহুম নবী হোসেন	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
১৩৬	জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম	(c/o ফউজুল আজিম) মুক্তার বাড়ি, উত্তর চাড়ীপুর, ফেনী
১৩৭	জনাব তানিয়া ইসলাম	৯২/এফ আজিমপুর সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার, আজিমপুর, ঢাকা
১৩৮	মুহাম্মাদ নাবীল ইসলাম	বাসা- ১০৫, রোড- ৪, স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৩৯	মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন আহমাদ	২৬ মিতালী রোড, ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা
১৪০	মুহাম্মাদ মা'সুম পারভেজ জিতু	৮২/৪/ডি, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
১৪১	জনাব তোবারক হোসেন	এন/১৪, নুরজাহান রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
১৪২	ফয়সাল বিন মুজিব	ফ্লাট- বি/৩, বাড়ি- ১৫, রোড- ৮, ব্লক- সি, আবাহন রিস্তা, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৪৩	এ্যাড. মাহিনুর রহমান	ফ্লাট- ১০০৪, ইস্টার্ন প্যানোরামা, ৩/২ রোপখানা রোড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
১৪৪	জনাব সাহীদ পারভেজ	বাড়ি- ২, রোড- ৬, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৪৫	মরহুমা মাহমুদা খাতুন	মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৪৬	মরহুম সাফওয়ান আহমাদ	৫৪ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা
১৪৭	ড. মুহাম্মাদ জাহেদুল ইসলাম	২১ কামিনী ভবন, আজিমপুর সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার, ঢাকা
১৪৮	মনোয়ার এন্টারপ্রাইজ	(c/o মাওলানা মাসুদুর রহমান) ৪০/কে দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, ঢাকা
১৪৯	ডেকর ডিজাইন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট লি.	(c/o মাওলানা মাসুদুর রহমান) ৪০/কে দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, মগবাজার, ঢাকা
১৫০	আহসান হাবীব	৬৮/১-জে, আজিমপুর সরকারি কলোনি, লালবাগ, ঢাকা

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া'র

সম্মানিত বরকত পরশিত ৩১৩ আজীবন সদস্যবৃন্দের নাম

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
০১	জনাব রাজিউল ওয়াদুদ	আলহাজ সাবু কোম্পানি প্যালেস, চরওয়াশপুর, হাজারীবাগ, ঢাকা
০২	মুহাম্মাদ সালামতুল্লাহ	ঝিল মসজিদ, শাহজাহানপুর, ঢাকা
০৩	মুহাম্মাদ মূসা কালিমুল্লাহ	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
০৪	জনাব মিসওয়ার ইসলাম (হামিম)	ব্রাহ্মণকিত্তা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
০৫	সুমাইয়া হোসেন	৫৪ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
০৬	জনাব তাফাজ্জল হুসাইন (হুযাইফা)	৮/নর্থ সাউথ রোড, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
০৭	হাজিয়ান শামীম আরা বেগম	মনু বেপারীর ঢাল, কেরাণীগঞ্জ
০৮	নূর নাহার রুমা	আউচপাড়া, মোক্তার বাড়ী রোড, সেবা-১২৬, টঙ্গী, গাজীপুর
০৯	মুহাম্মাদ আবূ জাফর	মুন্সিপাড়া, সাইলো রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
১০	মুহতারামা নাজমা বেগম	১৭/৫ বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক, ঢাকা
১১	মরহুম হাজী আনিসুর রহমান	১৭/৫ বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক, ঢাকা
১২	এ.এইচ.এম. আমিনুল ইসলাম	৩১ তোপখানা রোড, ঢাকা
১৩	মুহাম্মাদ মাহমুদুল হক	রোড- ২, প্লট- ৫, আরাম মডেল টাউন, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৪	মুহাম্মাদ মুয়াজ ইবনে আমীন	৫ আহম্মদিয়া স্কুল রোড, শিপইয়ার্ড, খুলনা সিটি, খুলনা
১৫	এ.কে.এম. মানজুরুল হক	রূপায়ন এলিট, বাড়ি-৭৩, ব্লক-বি, রোড-৪, নিকেতন হাউজিং সোসাইটি, গুলশান-১, ঢাকা
১৬	মরহুম আব্দুস সাত্তার গাজী	৮৪/এইচ, বুদ্ধিজীবি রোড, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৭	জনাব হুজ্জাতুল ইসলাম	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
১৮	মরহুম হাজী সিরাজুল ইসলাম	বাড়ি-১৯, রোড- ৪, ধানমণ্ডি, ঢাকা
১৯	হাজিয়ান মানজুমা খাতুন	বাড়ি-১৯, রোড- ৪, ধানমণ্ডি, ঢাকা
২০	শেখ মুহাম্মাদ আলমগীর	৮৯/বি, আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা
২১	শাহ মুহাম্মাদ ফিরোজ আল-ফেরদৌস	৬৩/ডি, আজিমপুর সরকারি অফিসার্স কোয়ার্টার, ঢাকা
২২	জনাব মুজিবুর রহমান	নাহার মঞ্জিল, ২/২ নর্থ-সাউথ রোড, আরাম মডেল টাউন, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২৩	জনাব শফিকুল ইসলাম	রোড- ১, ওয়াশপুর, হাজারীবাগ, ঢাকা
২৪	মাওলানা রফীকুল্লাহ আল-মাদানী	স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২৫	জনাব জুয়েল	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২৬	ফাতেমা নাঈম	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২৭	জনাব আইয়ুব আলী	বাড়ি- ১, রোড- ৪, সূচনা মডেল টাউন, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
২৮	মুহাম্মাদ আহমাদ আরহাম হুসাইন	২২ তল্লাবাগ, শেরে বাংলা রোড, জিগাতলা, ঢাকা-১২০৯
২৯	মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম	বসিলা, ওয়েস্ট ধানমণ্ডি, হাজারীবাগ, ঢাকা
৩০	জনাব আবূ আইয়ূব আনসারী	বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৩১	জনাব নেহাল শিকদার	গুলশান, ঢাকা
৩২	মিসেস শিরিন সিদ্দিকী	বাসা- ২, রোড- ৫/বি, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৩৩	মুহাম্মাদ রোমান হাসান	বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৩৪	মুহাম্মাদ শাফাআত হুসাইন	উত্তরকুল, বানারীপাড়া, বরিশাল

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
৩৫	মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ সিদ্দীকী	আগদেউলী, এলাশীন, টাঙ্গাইল
৩৬	মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন	২৩/১ বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৩৭	মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান	বাঘরা, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
৩৮	মুহাম্মাদ সেলিম খান	দক্ষিণ সুন্দরখাতা, ডিমলা, নীলফামারী
৩৯	মাওলানা শাব্বীর আহমাদ	৫০/৪ বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৪০	মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	৪/৪ বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৪১	মুহাম্মাদ আবূ বকর সিদ্দীক	জিঞ্জিরা নামাবাড়ী, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
৪২	মুহতারামা সিরাজুম মুনীরা	দক্ষিণ সুন্দরখাতা, ডিমলা, নীলফামারী
৪৩	মরহুম ওয়াজেদ আলী খান	দক্ষিণ সুন্দরখাতা, ডিমলা, নীলফামারী
৪৪	মুসাম্মাৎ হাসীনা বানু	দক্ষিণ সুন্দরখাতা, ডিমলা, নীলফামারী
৪৫	মুহাম্মাদ খবীরুদ্দীন জোয়ার্দার	ফ্ল্যাট-৪০১, বাড়ি- (অরবিট) ১২-১৩, পিসি কালচার হাউজিং, ব্লক- ক, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
৪৬	মুহাম্মাদ রিয়াজুদ্দীন মোল্লা	মীর হাজীবাগ, নবীনগর গেট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
৪৭	এ.এস.এম. আবূ জাফর বিশ্বাস	৮৬/জি, আজিমপুর কলোনি, লালবাগ, ঢাকা
৪৮	মরহুম আয়নাল হক	১/২, ব্লক- বি, মুহাম্মাদপুর ফিউচার টাউন লি., মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৪৯	মরহুম শামসুল হক মিয়া	৭৮/ই, আজিমপুর কলোনি, লালবাগ, ঢাকা
৫০	মরহুম মিয়া হোসেন	৭০/ডি, আজিমপুর কলোনি, লালবাগ, ঢাকা-১২০৫
৫১	মুহাম্মাদ আবূ বকর সিদ্দীক	বাসা- ০৭, রোড- ০৯, বসিলা ওয়েস্ট ধানমন্ডি, হাজারীবাগ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা
৫২	মুহাম্মাদ আমীনুল হক	১২৪/১২/৬, রোড- ০৪, ব্লক- এ, বসিলা ওয়েস্ট ধানমন্ডি, হাজারীবাগ, ঢাকা
৫৩	হাজী মুহাম্মাদ মোমিন মিয়া	২১নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৫৪	মিসেস হাবীবা বেগম	২১নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৫৫	আয়েশা খাতুন	৬৮/১, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৫৬	হাবীবুর রহমান	প্লট-৪, রোড-২, আরাম মডেল টাউন, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৫৭	নাজির হোসেন	৯৫/১, গজমহল, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৯
৫৮	ফরীদা বেগম	১৪/সি/৬, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, আজিমপুর, ঢাকা
৫৯	ফিরোজ মাহমূদ সিদ্দীকী	ফ্ল্যাট-৯/ই, ১৩/১, রোড-২, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৬০	জান্নাতুর ফিরদাউস মিতা	বাড়ি-১, রোড-১, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৬১	আব্দুল মান্নান	৭/৩, দয়াল হাউজিং, রোড-১, বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৬২	রশীদ আহমাদ	ফরিদপুর, শশইয়া, বরুড়া, কুমিল্লা
৬৩	আলহাজ মুমিনুল্লাহ	১/এ/১, উত্তর আদাবর, ঢাকা-১২০৭
৬৪	আয়েশা আক্তার	১/এ/১, উত্তর আদাবর, ঢাকা-১২০৭
৬৫	হাজী মামূনুর রহমান	১/এ/১, উত্তর আদাবর, ঢাকা-১২০৭
৬৬	ফারহান আহমাদ অ্যানি	১/এ/১, উত্তর আদাবর, ঢাকা-১২০৭
৬৭	মুশফিয়া রহমান আরিবা	১/এ/১, উত্তর আদাবর, ঢাকা-১২০৭
৬৮	উবাইদুল হক মুকুল	সলমাসির বাহেরচর, শ্যামলাপুর, সাভার, ঢাকা
৬৯	মিজানুর রহমান	উত্তর কামারপাড়, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
৭০	ডা. মোস্তফা কামাল	৮/৯, ব্লক-ডি, রোড-২, বসিলা গার্ডেন সিটি, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৭১	পরী বানু	২১নং বসিলা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
৭২	আসিরন বানু	মিরপুর, ঢাকা

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া'র

সম্মানিত স্থায়ী সদস্যবৃন্দের নাম

(যারা এককালীন বা কিস্তিতে একলক্ষ টাকা প্রদান করে সদস্য হয়েছেন)

স.নং	সদস্যের নাম	ঠিকানা
০১	জনাব সিফাতুল্লাহ	কলমারচর, বেউতা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
০২	মাওলানা শামসুল ইসলাম	রোড-৩, বাড়ি-২৫, হিরাঝিল আ/এ, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ
০৩	জনাব নূরজাহান বেগম	'কৃষ্ণচূড়া' ৬/৪/এ, শেখ সাহেব বাজার, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫
০৪	মুহাম্মাদ ফায়েজুর রহমান বিশ্বাস	৯২/এফ, আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা
০৫	জনাব নূর আহমদ	৬৬/এ, আজিমপুর সরকারি কলোনি, ঢাকা
০৬	জনাব ফায়েজুর রহমান	১০/২, কাজীমুদ্দীন, বাবু বাজার, ঢাকা
০৭	জনাব হাসিনা খাতুন	বাড়ি-৩৬, রোড-১৩, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯
০৮	মুহাম্মদ কামরুল হাসান	এপার্টমেন্ট ৩/এ, বাড়ি-৮৪, রোড-১২, সেক্টর-১০, উত্তরা
০৯	এ.এস.এম হুমায়ূন কবীর	৬৯/সি, আজিমপুর সরকারি কলোনি, আজিমপুর, ঢাকা
১০	রূপালী লেইছ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি.	৭৫নং মনিটোলা, বংশাল, ঢাকা
১১	আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আব্দুর রব	১৫নং বাড়ী, জাপান গার্ডেন সিটি, আদাবর, ঢাকা
১২	জনাব গোলাম মোস্তফা	৩নং নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫

এছাড়া আরো কিছু সদস্য আংশিক টাকা প্রদান করেছেন, পরবর্তীতে আমরা তাদের নাম প্রকাশ করবো ইনশাআল্লাহ। আরও যারা এককালীন কিংবা কিস্তিতে সর্বনিম্ন একলক্ষ টাকা প্রদান করে মা'হাদের স্থায়ী সদস্য হতে ইচ্ছুক তারা ফরম সংগ্রহ করে আবেদন করতে পারেন।

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া

থেকে ১৪৪০-৪১ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা ইফতা কোর্স সম্পন্ন করলেন

[নামের ধারাবাহিকতা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

১	২
মাওলানা আলী আহমাদ পিতা : ক্বারী বেলাল হুসাইন গ্রাম : কান্দাপাড়া, পোস্ট : ধীতপুর থানা : বোয়ালমারী, জেলা : মোমেনশাহী ০১৭৮৩৬৯২২৬০	মাওলানা মোশাররফ হুসাইন পিতা : মুহাম্মাদ আলী গ্রাম+পোস্ট : সনমান্দী থানা : সোনারগাঁ, জেলা : নারায়নগঞ্জ ০১৯৩৭৩০৪৭৪১
৩	**৪**
মাওলানা আমীর হুসাইন পিতা : নূর মুহাম্মাদ গ্রাম : রাধানগর, পোস্ট : হোমনা থান : বাঞ্ছারামপুর, জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া ০১৩১৯০৯৯৭০৭	মাওলানা জুবাইর আহমাদ পিতা : আলমগীর হুসাইন গ্রাম+পোস্ট : ঢাকি থানা : মিঠামইন, জেলা : কিশোরগঞ্জ ০১৯৬৫৩৩৫৯৭৯
৫	**৬**
মাওলানা ইবরাহীম আদহাম পিতা : জনাব ইমরান মিয়া গ্রাম+পোস্ট : মধ্য ভাটেরচর থানা : গজারিয়া, জেলা : মুন্সিগঞ্জ ০১৭৬৩২৭৩৯৩৩	মাওলানা হুসাইন আহমাদ পিতা : ইকামত মোল্লা গ্রাম : কাজলী, পোস্ট : কাজলী বাজার থানা : শ্রীপুর, জেলা : মাগুরা ০১৯৬৯২৯৯৫১৪
৭	**৮**
মাওলানা আব্দুল হালীম পিতা : হাফেয মাওলানা হাবীবুর রহমান গ্রাম : পশ্চিম নওপাড়া, পোস্ট : নওপাড়া হাট থানা : গুরুদাসপুর, জেলা : নাটোর ০১৭৭১৭৮৪৭৯১	মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ পিতা : শাহ জাহান শিকাদর গ্রাম : চরহোগলা, পোস্ট : হোগলাবুনিয়া থানা : মোড়েলগঞ্জ, জেলা : বাগেরহাট ০১৭১৯৯৫৭৪১৭, ০১৭১৯৯৫৭৪১৭
৯	**১০**
মাওলানা উমর ফারূক সিরাজী পিতা : শফীকুল ইসলাম গ্রাম : করিলা বাড়ী, পোস্ট : ধানগড়া থানা : রায়গঞ্জ, জেলা : সিরাজগঞ্জ ০১৮১৮৭৮১৬৫৪	মাওলানা মুফাসসাল হুসাইন পিতা : তাফাজ্জুল হুসাইন গ্রাম+পোস্ট : রায়মনি থানা : ত্রিশাল, জেলা : মোমেনশাহী ০১৭৬৭৩২৪৩০৭

১১	১২
মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ পিতা : মুফতী আব্দুল হাই দা.বা গ্রাম : মুহাম্মাদনগর, পোস্ট : জলমা থানা : লবণচরা, জেলা : খুলনা ০১৯৩৮৭৩৭৮৯২, ০১৮৬৩২০৮২৯২	মাওলানা নিয়ামাতুল্লাহ পিতা : তাজাম্মুল হুসাইন গ্রাম+পোস্ট : নামাযপুর থানা+জেলা : পিরোজপুর ০১৭৬০৮২০৫৩৮, ০১৯১৪৭২০৩৯১

১৪৪১-৪২ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা ইফতা কোর্স সম্পন্ন করলেন

[নামের ধারাবাহিকতা ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত]

১	২
মাওলানা মুশাররফ হুসাইন পিতা : আব্দুর রশীদ শেখ গ্রাম : চতুল, পোস্ট : বোয়ালমারী থানা : বোয়ালমারী, জেলা : ফরিদপুর ০১৭৬৭৯৩০০১৫	মাওলানা আব্দুস সালাম পিতা : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার ২/১০ ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৭৬১৯২৯৪০০
৩	**৪**
মাওলানা আবু ইউসুফ মিয়া পিতা : মুহাম্মাদ আমান উল্লাহ গ্রাম : কালিকৃষ্ণ নগর, পোস্ট : চকলক্ষ্মীপুর থানা : চৌদ্দগ্রাম, জেলা : কুমিল্লা ০১৭৯৩৪৫২২২৪	মাওলানা সাইফুদ্দীন পিতা : জনাব আব্দুল মান্নান গ্রাম : বাম মজুমদার পাড়া, পোস্ট : দৌলখাঁড় থানা : নাঙ্গলকোট, জেলা : কুমিল্লা ০১৮৫৯৮৪৬৩৩১
৫	**৬**
মাওলানা আনাস বিন সাঈদ পিতা : মাওলানা সাঈদুজ্জামান গ্রাম : তেলকুপী, পোস্ট : চরবেড়ী থানা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ ০১৩১৫৯০৮১৬৬	মাওলানা আল আমীন পিতা : মুহাম্মাদ আকতার হোসেন গ্রাম : চৌধুরীরটেক, পোস্ট : গোসাত্রা থানা : কালিয়াকৈর, জেলা : গাজীপুর ০১৯৯৪৫৭৪০৮৩
৭	**৮**
মাওলানা হাসান আহমাদ পিতা : আব্দুল মাজিদ বাসা ২৮/১, নাসিরাবাদ কলেজ রোড মিলনবাগ আকুয়া, মোমেনশাহী ০১৭৮২৭৮২৮৬৩	মাওলানা সুহাইল আহমাদ পিতা : মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান গ্রাম : গোপালপুর, পোস্ট : উত্তর বাখরনগর থানা : রায়পুরা, জেলা : নরসিংদী ০১৯২২৪০১৯৫৮

৯	১০
মাওলানা মাসীহুর রহমান পিতা : মুহাম্মাদ মোস্তফা গ্রাম+পোস্ট : ভরসাকাঠী থানা : উজিরপুর, জেলা : বরিশাল ০১৮৪৫৬১৭৭৮৪	মাওলানা মাহমূদুল হাসান পিতা : মাওলানা যাইনুল আবেদীন দা.বা. অর্কিট আবরার টাওয়ার, বাড়ী-১২২, রোড-৪/এ স্বপ্নধারা হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৭১৯১৬১৫৪৭, ০১৬১৯১৬১৫৪৭

উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া

১৪৪০-৪১ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করলেন

১	২
মুহাম্মাদ নাদীম হাসান পিতা : জনাব নূরুল আমীন মুন্সি গ্রাম : বাজিতপুর, পোস্ট : ছলেনামা বাজিতপুর থানা : শিবচর, জেলা : মাদারীপুর ০১৮৬৩৩১৩৯০৪	মুহাম্মাদ নূরে আলম পিতা : জনাব ইউসুফ মিয়াজী গ্রাম : কোদালিয়া, পোস্ট : পিপুলিয়া থানা : সদর দক্ষিণ, জেলা : কুমিল্লা . . .

১৪৪১-৪২ হিজরী শিক্ষাবর্ষে যারা হিফযুল কুরআন সম্পন্ন করলেন

১	২
মুহাম্মাদ আশরাফ আলী পিতা : জনাব আব্দুল গফুর শেখ গ্রাম : চরচান্দ্রা কাঁঠালবাড়ি, পোস্ট : চরচান্দ্রা হাট থানা : শিবচর, জেলা : মাদারীপুর ০১৭৪০০৬০৬৭৩	মুহাম্মাদ আলী পিতা : জনাব ইদরীস মিয়া গ্রাম : কালাকান্দি, পোস্ট : জাহাপুর থানা : তিতাস, জেলা : কুমিল্লা ০১৬১৪৬৪০৭৪০
৩	**৪**
মুহাম্মাদ ইউসুফ হুসাইন পিতা : জনাব শামীম আহমাদ এন/২৬ নূরজাহান রোড মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৮১৬৪০২০৭৬	মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান পিতা : জনাব সিরাজুল ইসলাম গ্রাম : দশানী টবগা, পোস্ট : আমীনবাগ থানা : চাটখিল, জেলা : নোয়াখালী ০১৭০৬৯১১৬২৮
৫	**৬**
মুহাম্মাদ ত্বহা ইসলাম পিতা : আলহাজ মোমিন মিয়া বসিলা উত্তর পাড়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৮১৯৪৮৭৮৪৯	মুহাম্মাদ তামীম আহমাদ পিতা : জনাব জামাল আহমাদ গ্রাম : কাটিহারা, পোস্ট : বামৈ থানা : লাখাই, জেলা : হবিগঞ্জ ০১৭১২০৫৮২২৯